আল-কুরআনে নারী প্রসঙ্গঃ
পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Women relevant context in Al Quran: PerspectiveBangladesh

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

গবেষক

তন্নি ইয়াসমিন

এম. ফিল গবেষক

রেজিঃ নং ৪৯/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী এর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম ফিল গবেষক তন্নি ইয়াসমিন (রেজিঃ নং ৪৯/২০১৩-২০১৪) -এর দাখিলকৃত "আল-কুরআনে নারী প্রসঙ্গ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।
আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আগাগোড়া গভীরভাবে পাঠ করেছি এবং মৌলিকত্ব ও মান বিচার করে এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
সিনিয়র অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আল-কুরআনে নারী প্রসঙ্গ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ -এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমার জানা মতে, এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উক্ত শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

তন্নি ইয়াসমিন
এম. ফিল গবেষক
রেজি নং ৪৯/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহান আল্লাহর প্রতি যিনি আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সূচারু রুপে সম্পন্ন করার জন্য তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি। যার মাধ্যমে আমরা সত্য দ্বীন পেয়েছি।

সর্ব প্রথম আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মরহুম পিতার প্রতি ও আমার মাতার প্রতি। আমার মায়ের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অশেষ ত্যাগের বিনিময়ে আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি ও এখনও কাজ করে যাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম অধ্যাপক ড. এ,এইচ, এম মুজতবা হোসাইন কে, যার হাতে আমার গবেষণা কর্মের সূচনা হয়েছিল। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমার গবেষণা কর্মটি শুরু করেছিলাম। তিনি ইন্তেকাল করায় আমি হতাশ হয়ে পড়ি। তখন অমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিভাগীয় তৎকালীন চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। তাঁর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এর প্রতি যার নিরন্তর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতার ফলে এ গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে তাঁর মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। তিনি এ অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় পরিশোধন ও পরিমার্জনে আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে বহু অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত বিষয়কে আমার নিকট সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। অভিসন্দর্ভটির অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ বিন্যাস, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রভৃতি বিষয়ে তার মূল্যবান পরামর্শ এ অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্পন্ন ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলেছে।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় সকল স্যারের প্রতি যাদের নিরন্তর উৎসাহ,সঠিক পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাই তুল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ছাত্র মোঃ মওদুদ এলাহী, মাঈন ভাই ও আমার পরিচিত মোঃ আব্বাস আলী খান ভাই, ফকরুদ্দীন মানিক ভাই, কামরুল ইসলাম ভাই সহ হাফেয মুফতী মহীউদ্দীন আযমী এর প্রতি যারা আমাকে থিসিস এর ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। এছাড়াও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ

আহসানুল্লাহ স্যার, ড. ফজলুর রহমান স্যার, আমার কর্মস্থলের শ্রদ্ধেয় স্যার মেজর অবঃ নূর আহমেদ শিবলী সহ আরো অনেকে যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এ ছাড়া আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার সহপাঠী আবু সালেহ ও হালিমাকে যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছে। আরো সহযোগিতা করেছেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর ডিউটিরত শ্রদ্ধেয় কর্মচারীবৃন্দ, যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে p করেছেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার চাচা, চাচাত ভাই, ভাবী, বোনসহ অন্যদের প্রতি, যারা আমাকে মানসিকভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় সম্পাদিত এ অভিসন্দর্ভটি কবুল করেন। আমীন।

তন্নি ইয়াসমিন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবর্ণায়ণ

(আরবী বর্ণ সমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	=	অ		غ		গ		اُ		উ
ب	=	ব		ف		ফ		أؤ		ঊ
ت	=	ত		ق		ক		وَ		ওয়া
ث	=	ছ		ك		ক		ـيِ		য়ী
ج	=	জ		ل		ল		وُ		উ
ح	=	হ		م		ম		وُو		ঊ
خ	=	খ		ن		ন		ي		ইয়া
د	=	দ		و		ওয়া		ا		আ
ذ	=	জ		ه		হ		عو		‘ঊ
ر	=	র		ء		‘		و		ৎ
ز	=	ঝ		ي		য়		وي		বী / ভী
س	=	স		ع		‘উ		يو		ইয়ু
ش	=	শ		ع		‘আ		ُ		Z
ص	=	স		ء		‘ই		ِ		W
ض	=	দ/য		يـــا		ইয়া		َ		V
ط	=	ত		يح		য়ি				
ظ	=	য		يـــإ		ী				
ع	=	‘		أي		ঈ				

বিঃ দ্রঃ

উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ণ পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

যেসব ‘আরবী’ শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

আল-কুরআন ১০:২০	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	‘আলাইহিস্ সালাম’
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীণ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উছমান
রাযী	আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তামিযী ফখরুদ্দীন আর-রাযী।
আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ আছ আস-সিজিস্তানী
ই. ফা. বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইব্ন কাছীর	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
কুরতুবী	আবূ আাব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ফাররাহ আল-কুরতুবী
খ্রি.পূ	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা. বি	তারিখ বিহীন
ত্বাহাবী	আবূ জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
তিরমিযী	আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা
বুখারী	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী
মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী
যামাখশারী	আবুল কাসিম মাহমূদ ইব্ন আহমাদ আয-যামাখশারী
রহ.	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
র.	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহুম/আনহা/আনহুমা/আনহুন্না
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
স.বি	সন বিহীন
(স.)	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
তাবারানী	আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী
ইবনু মাজাহ	মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী
নাসাঈ	আহমদ ইবনু শুআইব আন-নাসাঈ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ	মূল শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	০১-০৩
প্রথম অধ্যায়	**আল-কুরআন পরিচিতি ও বিষয়বস্তু**	০৪-২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	আল-কুরআন এর সংজ্ঞা ও পরিচয়	০৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আল-কুরআন অবতরণ	০৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ওহীর পরিচয় ও ওহী নাযিলের বিভিন্ন পদ্ধতি	১১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	আল-কুরআন সংরক্ষণ	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**আল-কুরআন ও নারী**	২৪-৬৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	আল-কুরআনে নারী প্রসঙ্গ	২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	নারীদের করণীয় দিক বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা	২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	নারীদের বর্জণীয় দিক বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা	৩১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	নারীদের সম্মান বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা	৩৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	আল-কুরআনে আলোচিত নারীগণ	৪৪
তৃতীয় অধ্যায়	**বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী প্রসঙ্গ**	৬৯-৯৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	গ্রীক সভ্যতায় নারী	৭০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	রোমান সভ্যতায় নারী	৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	খৃষ্টধর্মে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান	৭৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান	৭৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান	৮১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ইহুদী ধর্ম ও সমাজে নারী	৮৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান	৮৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ইসলামে নারী	৯০
চতুর্থ অধ্যায়	**বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর মর্যাদা ও অধিকার**	৯৮-১১৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান	৯৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বিভিন্ন দেশে নারীর অবস্থান	১০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর সমস্যা ও আইনী অধিকার	১০৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বিশ্বের বরেণ্য কয়েকজন নারী	১১১
পঞ্চম অধ্যায়	**বাংলাদেশে নারীর অবস্থা, মর্যাদা ও অধিকার**	১১৭-১৬০
প্রথম পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস	১১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	অবিভক্ত বাংলায় সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নারী সমাজের অবদান	১২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	অবিভক্ত বাংলায় ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা	১২৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পর্যায় ক্রমে নারী নেতৃত্বের অবস্থান	১২৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ	সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা	১৩২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	উন্নয়ন মূলক কাজে নারীগণ	১৩৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের সংবিধানে ও সংগঠনে নারীর জন্য বিশেষ অধিকার ও উদ্যোগ	১৩৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের কিছু বরেণ্য নারী ও তাদের কর্ম	১৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	**নারী নিয়ে কুসংস্কার; ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি**	১৬১-১৮৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	কুসংস্কার পরিচিতি	১৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	অতীতে নারী নিয়ে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার	১৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের সমাজে ও পরিবারে নারী নিয়ে কুসংস্কার ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	১৬৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামের আলোকে সমাধান	১৭৩
সপ্তম অধ্যায়	**নারী সহিংসতা প্রতিরোধ ও অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ**	১৮৮-২৩১
প্রথম পরিচ্ছেদ	নারী নির্যাতনের ধরণ	১৮৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	নারীদের পক্ষে আইন	১৯৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	নারী সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ	২১১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষ সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন	২১৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ	২২১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	নারী অধিকার রক্ষায় সরকারী উদ্যোগ	২২৪
অষ্টম অধ্যায়	**আদর্শ নারীর সন্ধানে; কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি**	২৩২-২৪৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	সন্তান প্রতিপালন ও পরবর্তী করণীয়	২৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সন্তানের শিক্ষা	২৩৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বিয়ের ক্ষেত্রে করণীয়	২৩৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	সাংসারিক জীবনে অধিকার ও কর্তব্য	২৩৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	মা হিসেবে কর্তব্য পালন ও প্রাপ্য অধিকার প্রসঙ্গে	২৪৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	অন্যান্য সম্পর্কগত দিক দিয়ে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য	২৪৭
	উপসংহার	২৫০-২৫২
	গ্রন্থপঞ্জী	২৫৩-২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

নারী মানবতার অর্ধেক। পুরুষ মানবতার একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করলে আরেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য যে কর্মসূচীই তৈরী হবে তা হবে অসম্পূর্ণ।

কিন্তু গ্রীস, রোম, ইউরোপ, আরব প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাস এবং ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, পারসিক ধর্মসহ আরো অনেক ধর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা নারীকে নিচু, অপবিত্রতা ও পাপের কারণ বলে মনে করত এবং কোন রকম মর্যাদা তাকে দেওয়া হত না। বিভিন্ন দেশে নারীর প্রকৃত মর্যাদা অস্বীকৃত, উপেক্ষিত, অবহেলিত ছিল। তখন নারী নির্যাতন ও নিপীড়নে সারাটি জগৎ ছিল খড়গহস্ত। তখন ইসলাম নারী অধিকার পুনঃউদ্ধারের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব নিল। শুরু হল তার মানোন্নয়নের অগ্রযাত্রা। মহান আল্লাহ মানবতার মুক্তিকল্পে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে মুক্তির দূতরূপে রাসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। তিনি আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের শান্তির ছায়া তলে আসতে সকলকে আহ্বান জানালেন। নারী জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিভিন্নমূখী উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রমাণ করলেন নারী অবহেলিত নয়, লাঞ্ছনার পাত্রীও নয়, সে মহীয়সী, কল্যাণী। নারী শান্তির আধার, সান্ত্বনার উৎস, সে প্রিয়ার জাতি, ভালবাসার পাত্রী। পুরুষের পক্ষে নারীকে অবজ্ঞা করা আত্ম প্রবঞ্চনার শামিল। জীবন সংগ্রামে পুরুষের পক্ষে নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, জীবনের স্বার্থকতায় পুরুষ-নারী মুখাপেক্ষী।

নারীদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার, মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অনেক দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইসলাম মানব জাতির মুক্তি ও মনোন্নয়নের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা থেকে নারীরা বঞ্চিত। এ সব বঞ্চিত নারীদেরকে হাতিয়ার করে বহু রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিবর্গ ফায়দা লুটেছেন। স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে আধুনিক সমাজও নারীকে পরিণত করেছে পণ্য বাজারের অংশ। নারীর সৌন্দর্য, কোমলতা, সরলতাকে পণ্যে পরিণত কল্পে পারিবারিক জীবনকে করে তুলেছে নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ এবং অশান্তিময় কারাগারে। তাইতো আজ চারিদিকে এতো হতাশা, এতো ক্ষোভ। ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নারীদের অজ্ঞতাই তাদের অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মেয়েরা আজকাল দুনিয়াবী জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত, ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা যে প্রয়োজন, তা বুঝার চেষ্টাও তারা করেনা। তারা অবসর সময়ে বিভিন্ন নভেল, নাটকের বই নিয়ে পড়তে থাকে অথবা টিভির সামনে বসে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখায় ব্যস্ত থাকে; এটাকেই জীবনের উন্নতির সঠিক রাস্তা বলে তারা মনে করে। কারণ তাদের মা তাদেরকে জীবনের প্রারম্ভে সঠিক ইসলামি জ্ঞান শিক্ষা দেয়নি। কারণ তিনি নিজেই কারো কাছ থেকে সঠিক শিক্ষা পাননি তো অন্যকে সঠিক রাস্তা কিভাবে দেখাবেন? তাই তাদের এখন উচিৎ ইসলামি বই পড়ে জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা এবং নিজেদের সন্তান সন্ততিদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তাহলেই মানব সৃষ্টির সঠিক উদ্দেশ্য লাভ করা সম্ভব হবে। কারণ সৎ-চরিত্রবতী, ধার্মিক ও আদর্শ নারীর মাধ্যমেই আদর্শ ও চরিত্রবান সন্তান-সন্ততি প্রত্যাশা করা যায় এবং একটি আদর্শ সমাজের গোড়াপত্তন করা সম্ভব হয়।

নর ও নারী মিলে মানব জাতির সমন্বয়। আর নারী হল এ জাতির জন্ম উৎস। কাজেই নারীকে যদি কুরআন, হাদিস তথা ইসলামি জ্ঞান দান করে সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করা যায়, তবে গোটা জাতিই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। ফলে একজন নারী থেকে একটি পরিবার, একটি পরিবার থেকে একটি সুষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। দেশের সমাজ ব্যবস্থা ঠিক হলেই দেশে সার্বিক শান্তি বিরাজ করবে।

তাহলে তারা নিজেরাও শান্তি পাবে ও দেশ পাবে আদর্শ নাগরিক। তাই কেউ কাউকে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী না মনে করে পরস্পরের পরিপূরক ও সহযোগী হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাওয়া একজন নরীর অপরিহার্য্য কর্তব্য। সেটাই তার সঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। প্রতিযোগিতার মানে শান্তি নয়, সহযোগিতার ও সহমর্মীতার মাঝেই শান্তি বিরাজমান। শান্তি টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া

যায়না, শান্তি সম্পদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়না, শান্তি মনের মাঝে বিদ্যমান। তাই সঠিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন ও পরিচালনায় ধার্মিক ও আদর্শবতী রমণীর বিকল্প হতে পারেনা। আর যেটার সঠিক পরিবেশ তৈরী করে দিতে পারেন সমাজের পুরুষ কর্ণধারগণ।

আমি আমার অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত করেছি। এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের পরিচয় ও বিষয়বস্তু দিয়ে শুরু করেছি, যেন মানুষ আল-কুরআন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে এবং আল-কুরআন অবতরণ, সংরক্ষণ ও আল-কুরআনের আহ্বানকে বুঝতে সক্ষম হয়। এতে তারা বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের হুকুম-আহাকাম পালন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়কে আমি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। যেহেতু আমার অভিসন্দর্ভটি নারী বিষয়ে তাই নারী জাতি সম্বন্ধে প্রাথমিক বর্ণনা, নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও স্বার্থকতা এবং কুরআন, হাদিসের নারী বিষয়ক বিভিন্ন আয়াতকে তুলে ধরেছি। সেই সাথে আল-কুরআনে বর্ণিত সম্মনিত নারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আমি এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়কে আমি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। এ অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীজাতির শোচনীয় অবস্থা ও করুণ পরিণতি ও ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে অল্প কথায় সঠিক বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়কে আমি চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। এ অধ্যায়ে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। সেই সাথে সমস্যাগ্রস্ত নারীদের আইনগত অধিকারের বিষয়টিও আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত নারীদের কথাও তুলে ধরেছি যাতে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে নারীগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়কে আমি আটটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। এ অধ্যায়ে আমি বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা, বিশেষ করে অতীত ও বর্তমানে শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নারীদের অবদান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে বাংলাদেশের সংবিধানে ও নারী অধিকার রক্ষায় নিবেদিত বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কেও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছি। বর্তমানে বাংলাদেশের বরেণ্য কিছু নারীদের তথ্যও তুলে ধরেছি যাতে করে বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতির বিষয়টি সকলে অবহিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়কে আমি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। এ অধ্যায়ে আমি নারী সংক্রান্ত অতীত ও বর্তমানে প্রচলিত কিছু কুসংস্কারের উল্লেখ করেছি এবং আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, এগুলো ভ্রান্ত ও ধর্মীয় গোড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়। সেই সাথে কুসংস্কারকে এড়িয়ে সংস্কার এর মাধ্যমে ও কুরআন, হাদিসের সঠিক জ্ঞান এর মাধ্যমে সঠিক ভাবে চলার উৎসাহ প্রদান করারও চেষ্টা করেছি।

সপ্তম অধ্যায়কে আমি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। এ অধ্যায়ে আমি নারী নির্যাতনের ধরণ ও নারী সহিংসতা সম্পর্কে কিছু বিষয় তুলে ধরেছি, সেই সাথে সহিংসতা প্রতিরোধ কল্পে বাংলাদেশ সরকারের আইন ও আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী পুরুষ সমতা আনয়ন, নারী অধিকার রক্ষা ও নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী কিছু উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যাতে করে অধিকার বঞ্চিত নারীগণ আশার আলো দেখতে পারেন।

অষ্টম অধ্যায়কে আমি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একজন নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। এ অধ্যায়ে আমি সেই বিষয়ে কুরআন, হাদিস বর্ণিত বিভিন্ন দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার, মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয় সম্মন্ধে সঠিক ভাবে তুলে ধরেছি। যাতে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে মানুষ নারী জাতির সম্পর্কে কুরআন, হাদিস বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে ও সে ভাবে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজে যেসব ঘটনা অহরহ ঘটছে এবং যেসব ঘটনাকে মানুষ স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মনে করছে, আল-কুরআন ও আল-হাদিসে সে সম্পর্কে যে সকল দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে আমি তার কিছু তথ্য আমার অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যাতে করে মানুষ এসব আলোচনা থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়: আল-কুরআন পরিচিতি ও বিষয়বস্তু

আল-কুরআন পরিচিতি ও বিষয়বস্তু

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবি রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। এবং তারা যেন সঠিক ভাবে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে পারে, তার জন্য তিনি তাদের প্রতি ছোট-বড় অনেক কিতাবও নাযিল করেছিলেন। যা দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহর ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতেন। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসূল এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তার প্রতি অবতরণকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত মানব জাতিকে সত্য ও সঠিক পথের রাস্তা দেখাবে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ আল-কুরআন এর সংজ্ঞা ও পরিচয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী তিনটি বড় ধর্মগ্রন্থ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সমগ্র মানব জাতির হেদায়েত ও পরিচালনার জন্য একমাত্র আল-কুরআন-ই চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অবতরণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়েছেন। এবং যার শিক্ষক মহা মানব হযরত মুহাম্মদ (স.)। যা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত মানব জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দিশারী স্বরুপ কাজ করছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ۱ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ وَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ۲

"আলিফ লা-ম-রা। এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। তাঁর পথে, যিনি মহা পরাক্রমশালী, যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য।"[১]

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে,

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا اِلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۱۵۸

"বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌ররাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরাআল্লাহরপ্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবির প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।"[২]

পবিত্র কুরআন সমগ্র মানব সমাজের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর। মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে পবিত্র কুরআনে। একটি অনুন্নত, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ও দিশেহারা জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাপে ধাপে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় পবিত্র কুরআনে রয়েছে তার সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে কিভাবে সুখ ও শান্তিতে ভরে তোলা যায় তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। সাথে সাথে মানুষ কিভাবে চললে পরকালে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরশান্তি লাভ করবে তাও পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। এমনি ভাবে যারা পবিত্র কুরআনের জীবন ব্যবস্থা মেনে চলবে তাদেরকে মহান আল্লাহ ইহকলীন ও পরকালীন শান্তি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী। এতে কাল্পনিক কোন উক্তি নেই। কোন মানুষের উক্তি এতে অনুপ্রবেশ করেনি। এতে এমন কোন বাক্য নেই যা অনুমান ভিত্তিক বা অর্থহীন। মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাদের সৃষ্টিকর্তার এ বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। আধুনিক যুগের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। সৃষ্টি রহস্য, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যও এতে রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঐ সমস্ত বিষয়কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভেজাল সত্য বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে ততই পবিত্র কুরআন বুঝা সহজ হচ্ছে।[৩]

'আল-কুরআন' এর আভিধানিক অর্থ

'আল-কুরআন' শব্দের ক্রিয়ামূল কয়েক ভাবে হতে পারে। এর কারণে এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়ৎ।

'আল-কুরআন' শব্দটি যদি 'ক্বরউন' ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত হয় তবে এর অর্থ দাঁড়াবে পাঠ করা, উচ্চারণ করা ইত্যাদি। আর যদি মাফউলুন ওজনে 'মাক্বরুউন' হয়, তখন পঠিত (Recited) অর্থ প্রদান করবে।

আয্ যুযাযের মতে 'কুরআন' শব্দটি 'ফালানে' ওজনে গঠিত এবং 'ক্বরউন' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ সন্নিবেশ করা। পানি হাউজে জমা করা হলে বলা হয়: "পানি হাউজে জমা হয়েছে।" কুরআন মাজিদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়।[৪]

পারিভাষিক অর্থ

মুজিজাতুল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, "কুরআন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কালাম যা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।"[৫]

আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আল-কুরআন আল্লাহর ভান্ডার, সুতরাং তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহর ভান্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর শক্তিশালী রশি, সুস্পষ্ট আলো, উপকারী প্রতিষেধক, যে এটাকে আঁকড়ে ধরে সে মুক্তি পায়, যে অনুসরণ করে সে রক্ষা পায় এতে কোন বক্রতা নেই এবং এতে কোন ভ্রষ্টতাও নেই।"[৬]

বিশিষ্ট আল-কুরআন গবেষক ড. সুবহি সালিহ বলেন, "তা মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাযিলকৃত এমনই এক মুজিজাপূর্ণ বাণী যা মাসাইফে লিপিবদ্ধ, তাঁর থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।"[৭]

পবিত্র কুরআনে কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআনের পরিচয় আল-কুরআনেই আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো,

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾

"আলিফ লা-ম মীম। এটি সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এটি সাবধানীদের জন্য পথ নির্দেশক।"[৮]

وَ اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿۴۴﴾

"এবং এটা তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর (অচিরেই) তোমরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৯]

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ﴿۱۵۵﴾

"এ কিতাব, আমি অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময়। তাই এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও হয়তো তোমরা অনুগ্রহ পাবে।"[১০]

অতএব, এই আয়াতগুলো থেকেই আমরা আল-কুরআন এর পরিচয় সম্বন্ধে যথার্থ অনুধাবন করতে পারি।

আল হাদিসে কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআনের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন,

كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: 2] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

"এটা আল্লাহর কিতাব যাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের সব সংবাদ এবং তোমাদের যাবতীয় বিষয়ের বিধান। এ কুরআন সুস্পষ্ট সত্য; ঠাট্টা-বিদ্রুপ নয়। যে তা অহংকার বশত ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। যে ব্যক্তি তা ব্যতীত অন্য কোথাও হিদায়াত অনুসন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দেন। আর এটা আল্লাহর মজবুত রজ্জু এবং বিজ্ঞানময় উপদেশ গ্রন্থ। আর তা সরল সঠিক পথ, যা দ্বারা প্রবৃত্তি বক্র পথে চলতে পারে না এবং জ্ঞানীগণ এর থেকে (জ্ঞান অর্জন করে) তৃপ্ত হয়ে যায় না। অধিক পুনরাবৃত্তি একে পুরাতন করে দেয় না। তার বিস্ময়কর বিষয়াবলী শেষ হবে না। তা এমন গ্রন্থ, জিন জাতি যখন তা প্রথম শুনল আশ্চর্য না হয়ে পারলো না, এমনকি তারা একযোগে বলে উঠল, "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস করেছি।" এ কুরআন দিয়ে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে, যে এর প্রতি আমল করে তাকে প্রতিদান দেয়া হয়। যে এর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে সে ন্যায় বিচার করে, যে এর দিকে মানুষকে ডাকে সে সঠিক পথের দিকেই ডাকে। হে এক চোখা, সময় থাকতে উক্ত হিদায়াতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর।"[১১]

আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াতের পরিসংখ্যানঃ

আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত মালার একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল:

জান্নাতের ওয়াদা ১০০০, জাহান্নামের ভয় ১০০০, আদেশ ১০০০, নিষেধ ১০০০, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ১০০০, হালাল ২৫০, হারাম ২৫০, আল্লাহর পবিত্রতা ১০০ ও বিবিধ বিষয়ে ৬৬ খানা আয়াত রয়েছে। [১২]

আল-কুরআনের নামসমূহ

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আল-কুরআনের নাম সিফাতের দিক থেকে কত এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ইমাম যারাকসি (র.) বলেন, "আল-কুরআনের গুণবাচক নামের সংখ্যা প্রায় ৯৯টি।"[১৩]

আল্লামা জালালুদ্দীন আস সুয়ূতি (র.) আল-কুরআনের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেছেন।[১৪]

কোন কোন আলিম আল-কুরআনুল কারীমের নাম ৯০-এর অধিক বলে বর্ণনা করেন। তবে এ সকল আলিম কুরআনের সিফাত (গুণবাচক নাম) কেও তার নাম হিসেবে গণনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন মাজীদের নাম পাঁচটি।[১৫]

১। আল-কুরআন

২। আল-কিতাব

৩। আল-ফুরকান

৪। আয্-যিকর

Dhaka University Institutional Repository

৫। আত-তানযীল

আল-কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআনুল কারীম এর শুভ অবতরণ ও সৃষ্টি শৈলীই তাঁর ভাষা ও সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তারের দাবী রাখে। আল-কুরআন 'ক্বরউন' ধাতু থেকে উৎপত্তি, যার আভিধানিক অর্থ হল, অধিক পঠিতব্য, অধিক প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ অর্থাৎ যা সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত সকল মানুষের কাছে একমাত্র অধিক পঠিতব্য বিষয় এবং যা তাঁর ভাষা ও সভ্যতায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ। ইসলামের শাশ্বত মু'জিজা।[১৬]

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা পবিত্র বাণী। তাই এর রচনা শৈলী ও বিষয় বিন্যাস স্বতন্ত্র। এর প্রকাশরীতি, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি ও আবেদন অনুপম। এর ভাষা অনুকরণীয় ও অনুসরণযোগ্য।[১৭]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জাতির জীবন পরিচালনার সর্বশেষ ঐশী কিতাব। মানব সৃষ্টির সূচনা হতে কিয়ামত অবধি সকল বিষয়ের মৌলিক আলোচনা এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

এটি নিছক কোন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের গ্রন্থ হয়। তবে এটি সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎস। এক কথায় সংক্ষিপ্ত এক বিশ্বকোষ।[১৮]

আল-কুরআন মানবজাতির মুক্তির সনদ। এতে মানবজীবনের সকল বাস্তবতা (Total reality) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এটি জাতির পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। আল-কুরআন পূর্বে নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাবের সার-নির্যাস ও মৌলিক শিক্ষাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। একইভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে অতীতের প্রধান প্রধান নবি রাসূলদের কার্যাবলী ও বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের বিচিত্র ঘটনা বিধৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআন মানব রচিত গতানুগতিক ইতিহাসের রচনা বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেনি; বরং মানব জাতির জন্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে দিকটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবজাতির ইহকালীন সাফল্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের পরকালীন মুক্তি সুনিশ্চিত করা। তাই আল-কুরআন ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানব জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধসমূহ বাস্তবে রূপদানের পথ-নির্দেশ করেছে। এ কারণে আল-কুরআনে অতীত জাতিসমূহের মনস্তাত্ত্বিক এবং তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ পেশ করা হয়েছে। যাতে মানবজাতি তাদের চলার পথের দিশা পেতে পারে এবং অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে পারে। তাই কুরআনে এত বিপুল পরিমাণ বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা বিচিত্র ভঙ্গিতে ওহীর আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে।[১৯]

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমির আলীর একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য "কোন ধর্ম বা জীবন বিধানের কেবল নীতিগত দিকটি মানুষের আবেগ অনুভূতিতে আবেদন সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং দুর্বোধ্য নীতিকথার চেয়ে প্রামাণ্য এবং অতীতের উদাহরণ দিয়েই সাধারণ মানুষ বেশি উপকৃত হয়। এটি কেবল মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যই নয়, বরং মহান স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যেও অত্যাবশ্যক।"[২০]

আল-কুরআন মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি চিরন্তন মু'জিজা। আল-কুরআন তার অনুপম বর্ণনা ভঙ্গি ও অলংকারিকতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিজা হিসেবে অক্ষুন্ন থাকবে।[২১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আল-কুরআন অবতরণ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ۝۳

"নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।"[২২]

পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। অতঃপর লাওহে মাহফুজ থেকে মোট দুপর্যায়ে কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন এক সাথে ক্বদরের পূণ্যময়ী রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল ইয্যাতে' নাযিল হয়।[২৩]

وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِیْلًا۝۱۰۶

"আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।"[২৪]

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً١ۚ كَذٰلِكَ١ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِیْلًا۝۳۲

"আর কাফিররা বলে, 'তার উপর পুরো কুরআন একসাথে কেন নাযিল করা হল না? এটা এজন্য যে, আমি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে ধীরে।"[২৫]

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِیْلًا۝۲۳

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি পর্যায়ক্রমে আল-কুরআন নাযিল করেছি।"[২৬]

দ্বিতীয় পর্যায়ে পবিত্র কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী নবি (স.)-এর প্রতি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছিল।[২৭]

আল-কুরআন অবতরণের সূচনাকাল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট মোতাবেক ২১ই রমজান সোমবার হেরা পর্বতে।[২৮]

এটি ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। এ সময় মহানবি (স.)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর ছয় মাস বার দিন।[২৯]

ওহীর সূচনা সম্পর্কে বুখারীতে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ،

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবি (স.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।[৩০]

স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই দিবালোকের ন্যায় সত্য হিসেবে প্রতিভাত হতো। অতঃপর তিনি নির্জন বাসে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং হেরা গুহায় নির্জনবাস আরম্ভ করলেন। সেখানে তিনি একত্রে একাধিক রাত্রি কাটিয়ে দিতেন এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য সাথে নিয়ে যেতেন। তা ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে এসে হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট হতে খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে হেরা গুহায় ফিরে যেতেন। কখনো কখনো হযরত খাদিজা (রা.) নিজেই খাদ্য-সামগ্রী হেরা পর্বতে পৌঁছে দিতেন। এভাবে হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে নবি (স.)-এর সামনে উপস্থিত হন। জিবরাইল (আ.) মহানবির (স.) নিকট এসে বললেন, 'পড়ুন'।[৩১]

মহানবি (স.) বললেন, 'আমি পড়তে জানিনা না। মহানবি (স.) বলেন, অতঃপর ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে আমি খুব কষ্ট বোধ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার বললেন, আপনি পড়ুন। আমি প্রথমবারের মতই বললাম, আমি পড়তে জানিনা। ফিরিশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি আবারও উত্তর দিলাম আমি পড়তে জানিনা। তিনি তৃতীয়বার আমাকে শক্তভাবে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَۚ ۱ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ۲ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ ۳ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ ۴ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْؕ ۵

"পড়ুন। আপনার প্রভুর নামে, যিনি জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন। আপনার সে মহিমান্বিত প্রভুর নামে, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।"[৩২]

অতঃপর মহানবি (স.) উক্ত আয়াতসমূহ মুখস্থ করে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে প্রবেশ করে পত্নী খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও'। খাদিজা (রা.) মহানবি (স.)-কে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন।

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবি (স.)-এর ভয় ও অস্থিরতা অনেকটা কেটে গেল। অতঃপর তিনি খাদিজা (রা.)-কে হেরা গুহায় সংঘঠিত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আরো বললেন, আমি আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছি। খাদিজা (রা.) তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম। তিনি কখনো আপনাকে অপদস্ত করবেন না। কারণ, আপনি প্রেম-প্রীতির জোরে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। আপনি কথা ও কাজে সদা সত্যনিষ্ঠ আপনি পূর্ণমাত্রায় আমানতদার। আপনি অপরের দুঃখ-দুর্দশার ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেন, অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করেন। অতিথি সেবা আপনার ধর্ম, বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা আপনার স্বভাব, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনার সত্যের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। সুতরাং আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। এরপর হযরত খাদিজা (রা.) প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে এ থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি মহানবিকে সঙ্গে নিয়ে তাওরাত কিতাবের পন্ডিত তাঁর চাচাতো ভাই 'ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল' এর কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনার ভাই কি বলে, একটু শুনুন !

মহানবি (স.) 'ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল'এর নিকট হেরা পর্বতের ঘটনা সবিস্তারে বললেন। পুরো ঘটনা শ্রবণ করে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, এ তো দেখি সেই ফিরিশতা যাকে মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আপনার বংশের লোকেরা যে সময় আপনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে, হায়! যদি আমি সে সময় বেঁচে থাকতাম। মহানবি (স.) অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তারা আমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আপনি যে জ্যোতি নিয়ে এসেছেন ইতোপূবেযারাই এ জ্যোতি নিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রত্যেককেই আপন দেশ হতে বিতাড়িত হতে হয়েছিলো। যদি আমি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করব।[৩৩]

কিন্তু ওয়ারাকার এ আশা পূরণ হয়নি। কারণ এর কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওয়ারাকার বক্তব্য শুনে মহানবি (স.) মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন এবং তাঁর ইমান আরো সূদৃঢ় হয়েছে। হেরা পর্বতে ওহী আসার পর কিছু দিনের জন্যে ওহী আসা বন্ধ ছিলো।[৩৪]

ওহীর এ বিরতিকালকে 'ফাতরাতে ওহী' বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ওহীর পরিচয় ও ওহী নাযিলের বিভিন্ন পদ্ধতি

ওহী শব্দটির আভিধানিক অর্থ ইশারা করা, ইঙ্গিত করা, প্রেরণ করা, প্রত্যাদেশ, লিখে পাঠানো, কোন কথা সহ লোক পাঠানো, কারো অন্তরে কোন কথা ঢেলে দেয়া বা ভাব সৃষ্টি করা, গোপন কথা প্রকাশ করা ইত্যাদি।[৩৫]

এর বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রত্যাদেশ' বা 'ঐশীবাণী' এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ `Revelation'.

ওহী শব্দের মৌলিক দু'টি অর্থ হচ্ছে:

১। 'আল-খফাউন' গোপনীয়তা

২। 'আস্‌সরা আহ' দ্রুততা।

তবে প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবু ইসহাক (র.) বলেন, ওহীর প্রকৃত অর্থ গোপনে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া।[৩৬]

শরীয়াতের পরিভাষায় ওহী হল, "আল্লাহর বাণী যা তাঁর নবিগণের মধ্য থেকে কোন নবির উপর নাযিল করা হয়েছে।"[৩৭]

মূলত 'ওহী' এমন এক পবিত্র সূত্র যার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক নিজের পবিত্র বাণী কোন মনোনীত রাসূলের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি তা পৃথিবীর মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।[৩৮]

অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বা নবি-রাসূলগণের নিকট আল্লাহর যে বাণী এসেছে পরিভাষায় তাই ওহী হিসেবে পরিচিত।[৩৯]

এমন মহামানবের নিকট ওহী নাযিল করা হয়, যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর উপরে কোন কিছুর স্থান হতে পারে না।

ওহীর প্রকারভেদ

পবিত্র কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছার উপায় তিনটি।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ
مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٥١

"আর এটি মানুষের জন্যে স্বাভাবিক নয় যে, আল্লাহ মানুষের সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতীত, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।"[৪০]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওহী প্রধাণত তিন প্রকার। যথা:

১। ওহী ক্বালবী, ২। ওহী কালামে এলাহী এবং ৩। ওহী মালাকী।

১। ওহী ক্বালবী: এ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ কোন কথা বা বিষয় নবির মানস-পটে উদয় করেন বা জানিয়ে দেন একই সাথে মনের মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেন যে, এটি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।[৪১]

এ পদ্ধতিতে কোন প্রকার শব্দ হয় না এবং কোন প্রকার মাধ্যমও ব্যবহৃত হয় না। এটি ঘুমন্ত বা জাগ্রত উভয় অবস্থায় হতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পদ্ধতিতেই স্বপ্নের মাধ্যমে পুত্র কুরবানীর জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।[৪২]

২। ওহী কালামে এলাহী: এ পদ্ধতিতে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই মহান আল্লাহ তাঁর নবির সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। যেমন, মিরাজের রজনীতে তাঁর প্রিয় হাবীবের সাথে এবং মূসা (আ.)-এর সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেছেন। এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমণে নবিরা এমন এক বিস্ময়কর আওয়াজ শুনতে পান, যা দুনিয়ার সকল আওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মানবিয় জ্ঞান-বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা এর প্রকৃতি ও রহস্য অনুধাবন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।[৪৩]

৩। ওহী মালাকী: এ পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক কোন ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁর বাণী নবির নিকট প্রেরণ করেন। এতে ফিরিশতা কখনো স্বরূপে আবার কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন। এ পদ্ধতিতেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল।

ওহীকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১। জিবিল্লী বা তাবঈ (প্রাকৃতিক ওহী), ২। জুযই (আংশিক) ওহী এবং ৩। নবিদের উপর অবতীর্ণ ওহী।

জিবিল্লী বা তাবঈ ওহী

এটি স্বভাবজাত প্রাকৃতিক বা Natural ওহী। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার দায়িত্ব ও কাজ শিখিয়ে এবং জানিয়ে দেন। এ ওহী মানুষ, পশু-পাখি এমনকি উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের উপরও অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُوْنَ﴿۶۸﴾

"আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, তারা যেন পাহাড় গুলোর মধ্যে নিজেদের ঘর তৈরি করে।"[৪৪]

জুযই (আংশিক) ওহী

এ ওহী প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন মানুষকে জীবন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান দান করেন বা কৌশল জানিয়ে দেন। দুনিয়ার সব বড় বড় আবিষ্কার এ ওহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। বড় বড় তত্ত্ব উদ্ভাবন এ ওহীর মাধ্যমেই হয়। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পিছনে এ ওহীর কার্যকারীতা রয়েছে। যেমন -এ ধরণের ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত মুসা (আ.)-এর মায়ের উপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِیْهِ١ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَاَلْقِیْهِ فِی الْیَمِّ وَ لَا تَخَافِیْ وَ لَا تَحْزَنِیْ١ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَیْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ﴿۷﴾

"মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে।"[৪৫]

নবিদের উপর অবতীর্ণ ওহী

এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তার বান্দাকে (নবি-রাসূল) অদৃশ্য জগতের (গায়েবের) নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। এবং জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হিদায়াত মানুষের নিকট পৌঁছাবেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাবেন।

ওহীকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

১। ওহী মাতলু বা পঠিত ওহী। যেমন, আল-কুরআন।

২। ওহী গইরে মাতলু বা অপঠিত ওহী। যেমন, আল-হাদিস।

ওহী অবতীর্ণের বিভিন্ন পদ্ধতি

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করে তার বিখ্যাত যাদুল মাআদ' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে এর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন।

১। সত্য স্বপ্ন

এটি ছিল মহানবির (স.) প্রতি ওহী অবতরণের প্রাথমিক পর্যায়। হযরত 'আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এখানে প্রণিধান যোগ্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, "নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে রাসূলের নিকট ওহী আসতো সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।"[৪৬]

তিনি যেসব স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বাস্তবে প্রতিফলিত হতো। তবে স্বপ্নযোগে পাওয়া ওহী পবিত্র কুরআনে অর্ন্তভুক্ত হয়নি। কারণ এটি পরোক্ষ ওহী আর কুরআন প্রত্যক্ষ ওহী। তাই এগুলো হাদিসে কুদসীর অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ও স্বপ্নযোগে ওহীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ[১]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন।"[৪৭]

২। ঘণ্টা ধ্বনি

মহানবি (স.)-এর নিকট কখনো কখনো ওহী আসতো স্বশব্দে। হাদিসের পরিভাষায় এটিকে বলা হয় 'সাল সালাতুল জারাস'। এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স.) বলেছেন, "কখনো কখনো আমার নিকট ওহী আসে ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আওয়াজ করে। আর এ পদ্ধিতিতে ওহীর আগমণ আমার নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল।"[৪৮]

হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমণের প্রভাবে প্রচণ্ড শীতের দিনেও মহানবি (স.)-এর শরীর থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়তো। 'সাল সালাতুল জারাস' কিসের আওয়াজ এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর মতে, এটি কালামে ইলাহীর নিজস্ব আওয়াজ। এ ধ্বনির সূচনা হয় আরশে আযীমে আর সমাপ্তি ঘটে প্রিয় নবির হৃদয়ে পৌঁছা পর্যন্ত।[৪৯]

আবার কেউ কেউ বলেছেন এটি ফিরিশতা জিবরাঈল আমিনের পাখার আওয়াজ।[৫০]

মূলত এ আওয়াজের প্রকৃত রহস্য আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালভাবে অবগত।

৩। ফিরিশতার মানব আকৃতিতে আগমন

হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে নবি (স.)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।[৫১]

তিনি সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবি হযরত দিহইয়া কালবী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করে রাসূল (স.)-এর সামনে আগমন করতেন। এর কারণ হচ্ছে, হযরত দিহইয়া কালবী (রা.) সাহাবিগণের মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন। সর্বদা রুমাল দ্বারা চেহারা ঢেকে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিলেন।[৫২] অবশ্য কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) অপরিচিত লোকের আকৃতি ধারণ করে আগমন করতেন এবং আমার সাথে কথা বলতেন।[৫৩]

তবে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, নবি (স.)-এর নিকট যে ফিরিশতা সাধারণত ওহী নিয়ে আসতেন তিনি হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ[৫৪]

"আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রুতা করে তা শুধুমাত্র এ জন্য যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে এ কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।"[৫৪]

এ পদ্ধতিতে ওহীর অবতরণ রাসূলের নিকট ছিল সহজতর। যেমন তিনি বলেছেন "ওহীর এ পদ্ধতি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হয়।"[৫৫]

৪। ফিরিশতার নিজস্ব আকৃতিতে আগমন

হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজস্ব আকৃতিতে রাসূলের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। নিজস্ব আকৃতিতে জিবরাঈল(আ.) ওহী নিয়ে এসেছেন মাত্র তিনবার। একবার রাসূল (স.) জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার আশঙ্কা ব্যক্ত করলে তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় বার মিরাজের রাতে এবং তৃতীয় বার নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কার আজইয়াদ নামক স্থানে।[৫৬]

৫। আল্লাহ পাক থেকে সরাসরি ওহী লাভ

কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ পাক মহানবি (স.)-এর উপর ওহী নাযিল করেছেন। এ বিশেষ মর্যাদা রাসূল (স.) জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মিরাজের রাতে লাভ করেছিলেন। আর আবার তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহর সাথে কথা বলার সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।[৫৭]

৬। মানসপটে ওহী ফুঁকে দেয়া

হযরত জিবরাঈল (আ.) হুজুরের সাথে দেখা না দিয়ে তার অন্তকরণে কোন কথা ফুকে দিতেন। যেমন- নবি (স.) বলেছেন। "জিবরাঈল (আ.) আমার মানসপটে একথা ফুকে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না।"[৫৮]

এতদ্ব্যতীত কোন কোন বর্ণনায় নবি (স.)-এর নিকট ইসরাফিল (আ.)-এর ওহী নিয়ে আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৯]

কোন কোন সময় আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের কোন বিষয়ে অবগত করিয়ে দেন। এটির নাম কাশফ বা ইল্হাম। কাশফ ও ইল্হামের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা মুজাদ্দিদ আল্ফে সানী (রা.) বলেন, কাশফের সম্পর্ক মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, এর মাধ্যমে কেবল দৃষ্টি শক্তির আয়ত্তাধীন বিষয়বস্তু বা ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইল্হামের সম্পর্ক উপলব্ধি জনিত বিষয়াদির সাথে। অর্থাৎ কোন বস্তু দৃশ্যমান না হয়ে কোন বিষয় মানসপটে উদয় হয়। তবে ইল্হামের তুলনায় কাশফ বেশি বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।[৬০]

মহানবি (স.)-এর উপর ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতিসমূহ

মহানবি (স.)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় হেরা গুহায় তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে। এরপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী তার নিকট ওহী এসেছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যেসব পদ্ধতিতে মহানবি (স.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ৫১ নম্বর আয়াতে তিন পদ্ধতিতে ওহী অবতরণের উল্লেখ রয়েছে।

১. অন্তর্লোকে কথা নিক্ষেপ করা।

২. পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা এবং

৩. ফিরিশতা প্রেরণ করা।

যেমন আল্লাহ বলেন,

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٥١

"কোন মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন। তবে তিনি কারো অন্তর্লোকে কথা নিক্ষেপ করেন। অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। অথবা তিনি কোন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। যিনি তার অনুমতিতে যা চান তা ব্যক্ত করেন ।"[৬১]

একইভাবে হাদিসে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। যেমন: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হারেস ইবন হিসাম (রা.) নবি (স.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর নবি আপনার প্রতি কিভাবে ওহী আসে? উত্তরে নবি (স.) বলেছিলেন, আমার নিকট কোন কোন সময় ওহী আসে ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায়। তবে এ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর প্রত্যাদেশের সবকিছুই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো ফিরিশতা আমার সম্মুখে মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসে।[৬২]

এ হাদিসে ওহী অবতরণের দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে স্বপ্ন যোগে ওহীর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন,আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ[১]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন।"[৬৩]

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মহানবি (স.)-এর প্রতি ওহী অবতরণের বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ আল-কুরআন সংরক্ষণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এর সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান রাব্বুল আলামিন নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ۝

" নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণকারী।"[৬৪]

অন্যত্র আছে-

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْاٰنَهُ۝ فَإِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۝

"এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমার।"[৬৫]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় মহান আল্লাহ শুধুমাত্র কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠের দায়িত্বই গ্রহণ করেন নি, বরং এর বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও নিগুড় তত্ত্ব উপলব্ধি করানোর দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। মহানবি (স.) কুরআনকে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এটিকে গ্রন্থের আকারে রূপদানের সুযোগ পাননি। কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য মহানবি (স.) মৌলিকভাবে যে দুটি পদ্ধতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা হলো,

১। আরব জাতির প্রখর স্মৃতিশক্তি তথা মুখস্থকরণ এবং

২। স্থায়ীত্বের প্রতীক লিখন পদ্ধতি।

কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীলতার আর একটি প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْاٰنَهُ۝

"কুরআনকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্যে আপনি দ্রুত জিহবা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই কুরআন আপনার অন্তরে একত্র করানো ও আবৃত্তি করানোর দায়িত্ব আমারই।"[৬৬]

ওফাতের বছর রমযান মাসে নবি (স.) দুবার হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পুরো কুরআন শুনিয়েছেন এবং জিবরাঈল (আ.) থেকে ও শুনেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত ফাতিমা (রা.) বর্ণনা করেন,

فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي،

রাসূল (স.) আমাদের গোপনে বলেছেন, "জিব্রাঈল (আ.) আমার সাথে প্রতি বছর একবার কুরআন অধ্যয়ন করতেন, আর এ বছর তিনি আমার সাথে দুবার অধ্যয়ন করেন। আমার মনে হয় আমার মৃত্যু এসে গেছে।"[৬৭]

রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় বহু সংখ্যক সাহাবা হাফিজ-ই-কুরআন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছে, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত সাদ (রা.), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.), হযরত সালেম (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.), হযরত আমর ইব্ন আস (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাঈর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবন সায়েব (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রা.), হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.), হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.), হযরত আবু হালিমা মু'আয (রা.), হযরত জায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.), হযরত আবুদ দারদা (রা.), হযরত মুজাম্মা ইব্ন জাবিয়া (রা.), হযরত মাসলামা ইব্ন মুখালাদ (রা.), হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ। এ সব সাহাবাদের নাম হাফিজে কুরআন হিসেবে হাদিসে উল্লেখ আছে।[৬৮] এছাড়াও ইসালামের ইতিহাসের অন্যতম বেদনাদায়ক হত্যাকান্ড বীর-ই-মাউনের ঘটনায় ও ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিজ শহীদ হন। তবে রাসূল (স.) কুরআন শিক্ষার ব্যাপক চর্চার জন্য আসহাবে সুফফা

গঠিত করেন ও প্রশিক্ষিত সাহাবাগণকে শহর ও গ্রামে প্রেরণ করেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মুস'আব ইব্ন উমায়র এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় প্রেরণ করেন। আর হিজরতের পর হিফজ করানোর উদ্দেশ্যে হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন।

এছাড়া লিখিত ভাবে কুরআন সংরক্ষণ সম্পর্কে অন্যতম ওহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, আমি রাসূল করিম (স.)-এর ওহী লেখার কাজ করতাম, তার উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাকে প্রচণ্ড গরম পেয়ে বসত। তার দেহ মুবারক থেকে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোটা ঝরে পড়ত। তার এ অবস্থার অবসান ঘটলে আমি জন্তুর ঘাড়ের অস্থি অথবা অন্য কোন টুকরো নিয়ে তার কাছে হাজির হতাম। তিনি আমাকে লিখাতেন আমি লিখতে থাকতাম। আমি যখন লেখার কাজ শেষ করতাম তখন কুরআন নকলের ভারে আমার পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হতো। আামি মনে মনে ভাবতাম, আমি আর কখনো দু, পায়ের উপর ভর করে হাটঁতে পারব না। অতঃপর আমার লেখা শেষ হলে নবিজী বলতেন, পড়। আমি লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শুনাতাম। তাতে যদি কোন ভুল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হত, তিনি তা শুধরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি তা সকলের সামনে হাজির করতেন।[৬৯]

কুরআন লিখার উপকরণ

মহানবি (স.)-এর সময়ে ওহী লিখার উপকরণ হিসেবে প্রধাণত গাছের বাকল, ভঙ্গুর হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফৌম বস্ত্র এবং তখনকার দিনে আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ ব্যবহার হয়েছে।[৭০]

কুরআন লেখকগণ

নবি করিম (স.) কুরআন মাজিদ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি সুশিক্ষিত ও সর্বোত্তম গুণাবলী সম্পন্ন একদল সাহাবাকে মনোনীত করেন। যাদেরকে বলা হয় কাতেবীনে ওহী বা ওহী লেখকবৃন্দ। এদের সংখ্যা চল্লিশ জন।[৭১]

এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন-১। হযরত আবু বকর (রা.) ২। হযরত উমর (রা.) ৩। হযরত উসমান (রা.) ৪। হযরত আলী (রা.) ৫। হযরত উবাই ইবন কাব (রা.) ৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উবাই সাবাহ (রা.) ৭। হযরত জুবাইর ইব্ন আওযাম (রা.) ৮। হযরত খালেক ইব্ন সায়ীদ ইব্ন আস (রা.)

৯। হযরত আবান ইব্ন সায়ীদ ইবন আস (রা.) ১০। হযরত হানজালা ইব্ন রাবী (রা.) ১১। হযরত আ'কীব ইব্ন আবি ফাতেমা (রা.) ১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আরকাম আল যোহরী (রা.) ১৩। হযরত শারহাবিল ইব্ন হাসানা (রা.) ১৪। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ (রা.)।[৭২]

১৫। হযরত আমের ইব্ন ফাহিরা (রা.) ১৬। হযরত আমর ইব্ন আস (রা.) ১৭। হযরত সাবিত ইব্ন কায়েস শাম্মাস (রা.), ১৮। হযরত মুগিরা ইব্ন শো'বা (রা.) ১৯। হযরত খালিদ ইব্ন অলীদ (রা.) ২০। হযরত মুরাবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং ২১। হযরত যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.) প্রমুখ।[৭৩]

হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করিম (স.)-এর নিয়ম ছিল যখন কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন ওহী লেখকদের তিনি এ বলে নির্দেশনা প্রদান করতেন যে, এ অংশটি অমুক সূরার অমুক আয়াতের পরে লেখ।[৭৪]

হুজুরের নির্দেশনা মোতাবেক তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপি গুলোর মধ্যে কুরআনের একটা কপি এমনও ছিল, যেটি স্বয়ং রাসূল করিম (স.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।[৭৫]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে কুরআন সংরক্ষণ

ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করার পর হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শে হযরত যায়েদ ইব্ন সাবেত (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে অনেক যাচাই বাছাই এর পর সম্পূর্ণ কুরআন কে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়। গ্রন্থাবদ্ধ এ কুরআন খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। এরপর এ কুরআন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এরপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।[৭৬]

হযরত উসমান (রা.)-এর সময় কুরআন সংরক্ষণ

হযরত উসমান (রা.) যখন খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন ইরান ও রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইসলামের আলো ছাড়িয়ে পড়ল ও অনারব ভাষাভাষি লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে দুরকম উচ্চারণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যেহেতু কুরআন সাত ক্বিরাতে পড়ার বিধান রয়েছে সেহেতু অনারব লোকদের কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা এমনকি ভুল উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয়। এটা দেখে হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট চারজন হাফেজ সাহাবাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তারা হচ্ছেন হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) সাঈদ ইবনূল আস (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন হিশাম (রা.)। উক্ত চারজন সাহাবার মধ্যে হযরত যায়দ (রা.) ছিলেন আনসারী এবং অবশিষ্ট তিন জন কুরাইশ বংশীয়।

এ প্রসঙ্গে বুখারীতে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ، قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ، وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ، قَبْلَ [ص:184] أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ اخْتِلاَفَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: «أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ»، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ "، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ» فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ، أَنْ يُحْرَقَ

হযরত ইব্ন শিহাব যুহরী (র.) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আগমন করেন। তিনি আরমানিয়া ও আযারবাইজান যুদ্ধে ইরাকিদের নিয়ে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় ঐ সব

অঞ্চলের মুসলমানদের কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মত পার্থক্য হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে অত্যন্ত শংকিত করে তোলে। যুদ্ধ শেষে মদীনা এসে তিনি খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি খলিফাকে বললেন আমিরুল মু'মিনীন! মুসলিম উম্মাহ ইহুদী ও নাসারাদের ন্যায় মত পার্থক্যে লিপ্ত হয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের রক্ষা করুন। এরপর ওসমান (রা.) হাফসা (রা.)-এর নিকট এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনি আপনার নিকট সংরক্ষিত কুরআনের পান্ডুলিপি গুলো আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন। আর এর থেকে আরো কপি করার কাজ শেষে আমরা আপনাকে পূনরায় তা ফিরিয়ে দিব। তখন হযরত হাফসা (রা.) তা উসমান (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন।
এরপর হযরত উসমান (রা.) যায়দ ইবন ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা.) সাঈদ ইবনুল আস (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশামকে (রা.) এ কাজের নির্দেশ দেন। তারা তা বিভিন্ন মুসহাফে রুপান্তরিত করেন। উসমান (রা.) তিন জন কুরাইশ বংশীয় সদস্যদেরকে বলেন, তোমরা এবং যায়দ ইবনে ছাবিত (রা.) যদি কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে মত পার্থক্যে পতিত হও, তাহলে তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন, এরপর হাফসা (রা.)-এর কপি তাকে ফেরত দেয়া হয়। আর লিপিবদ্ধ সহীফা গুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ সকল কপি ছাড়া কুরআনের অন্যান্য কপি গুলোকে তিনি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[৭৭]

তিলাওয়াত সহজ করার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা

হযরত উসমানের (রা.) প্রস্তুত করা কপিই পৃথিবীতে ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কুরআনে হরকত, (যের, যবর, পেশ) এবং নুকতার প্রচলন ছিলনা। এমনকি আরববাসীদের জন্য এর প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের সীমানা যখন অনারব ভূমি পর্যন্ত পৌঁছায় তখনই এর প্রয়োজন দেখা দেয়। যাতে অনারব ভাষাভাষি লোকেরা সহজে কুরআন অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয় সেজন্য কুরআনের নুকতা ও হরকত সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কুরআনে সর্বপ্রথম নুকতা ও হরকত সংযোজন এর ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[৭৮]

কুরআন মাজিদ মুদ্রণ

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ কুরআন করিম হাতে লিখতেন। আত্মনিবেদিত একদল মুমিন একাজ করতেন, এরপর মুন্দণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর জার্মানীর হেসবার্গে ১১১৩ হিজরীতে কুরআন সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।[৭৯]
এর একটি কপি এখনো মিশরের দারুল কুতুবে সংরক্ষিত আছে।[৮০]
রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে মাওলায়ে উসমান কর্তৃক সর্ব প্রথম কুরআন মুদ্রিত হয়। এরপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে কুরআন মাজিদ মুদ্রিত হয়।[৮১]
অতঃপর কুরআন মুদ্রণের কাজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।
অতএব, আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এর মর্ম বুঝে এর সঠিক অনুকরণ ও অনুসরণ এর মাঝেই মানব জাতির যথার্থ কল্যাণ নিহীত। কিন্তু এর যথার্থ স্বাদ আমরা তখনই পাবো যখন আমরা এর নাযিলের প্রেক্ষাপট অথাৎ আল-কুরআন এর সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, ওহী অবতরণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখব। তাহলে এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবণ করে নিজে এর অনুসরণ করতে পারব ও অন্যকে সঠিক ভাবে দিক নিদের্শনা দিয়ে সহায়তা করতে পারব।

তথ্যসূত্র

১। আল-কুরআন, ১৪: ১-২
২। আল-কুরআন, ৭: ১৫৮
৩। ড. এসরার আহমাদ, *কুরআনের পরিচয়*, অনু: মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা: নাকিব পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০৭ খ্রি. পৃ. ১০
৪। ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন*, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াত তুরাছিল আরাবী, ১৯৪৫ খ্রি. ১ম খ. পৃ. ০৮
৫। শায়খ মুতাওয়াল্লি আশশি'রাভী, *মু'জিজাতুল কুরআন*, মাকতাবাতুস শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা, বি. ১ম খ.পৃ. ২৫
৬। আদ্ দারেমী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান বিন ফাযল (মৃ. ২৫৫ হি.); *আস-সুনান*, রিয়াদ, দারুল মুগনী লিন্নাশর ওয়াত-তাওযী', ১ম সংস্করণ ২০০০ খ্রি. । হাদিস নং-২৯০৬
৭। ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৮। আল-কুরআন, ০২:০১-০২
৯। আল-কুরআন, ৪৩:৪৪
১০। আল-কুরআন, ০৬:১৫৫
১১। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্ তিরমিযী, *আস্সুনান*, বৈরুত: দারু ইহইয়াত তুরাছিল আরাবী, ৫ম খ. পৃ. ১৭২, হাদিস নং-২৮৩১
১২। হাফেজ মুনিরউদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমি, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১১ খ্রি. , পৃ. ১৯
১৩। বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ যারাকশি, *আল বুরহান ফি 'উলুমিল কুরআন*, বৈরুত: দারুয যাইল, ১৪০৮ হি. প্রথম খ. পৃ. ২৭৩
১৪। জালালুদ্দীন আসসুয়ূতি, *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, সপ্তদশ অধ্যায়, মাকতাবাতুল মা, আরিফিল ইসলামি, ১ম সংস্করণ, তা. বি. পৃ. ০৭-৩০
১৫। আল্লামা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, দেওবন্দ: কুতুবখানা নাযিমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ২৩
১৬। মান্না আল-কাত্তান, *ফী উলুম আল-কুরআন*, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৯৯৫ খ্রি. সংস্করণ-২৬, পৃ. ৯
১৭। ড. মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশনস্, ১৯৯২ খ্রি. পৃ. ১, ভূমিকা দ্র.।
১৮। ফরাসী পন্ডিত Dr. Maurice চমৎকার বলেছেন, "The Quran may well be regarded as an academy of science for the scientists, a lexicon for etymologists, a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and an encyclopedia of laws and legislation. Indeed no other book anterior to the Quran could be held equal to a single chapter there of." ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, বগুড়া: সাহিত্য কুটির: ১৯৮৪ খ্রি. পৃ. ১৬৯

১৯। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *তাফসির ফী যিলালীল কুরআন*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমি, ১৯৯৮ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৩৩৩

২০। সৈয়দ আমির আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদ: অধ্যাপক দরবেশ আলী খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩ খ্রি. খ. ১, পৃ. ২১৬

২১। ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আল-যারকানী, *আল-বুরহান ফী উলুমুল কুরআন*, কায়রো: মাকতাবাতু দারুত্ তুরছি, তা.বি. খ. ২, পৃ. ১০১

২২। আল-কুরআন, ৪৪:৩

২৩। আল-কুরআন, ৪৪:৩; ৯৭:১

২৪। আল-কুরআন, ১৭: ১০৬

২৫। আল-কুরআন, ২৫:৩২

২৬। আল-কুরআন, ৭৬:২৩

২৭। আল-কুরআন, ১৭:১০৬

২৮। শেখ আব্দুল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব নজদী, *মোখতাসার সীরাতে রাসূল*, মিশর: মাতবায়ে সালাফিয়া ১৩৭৯ হি. খ. ১, পৃ.৭৫

২৯। আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৮৮

৩০। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (মৃ. ২৫৬ হি.); *আস-সহীহ*, বৈরূত: দারু ইবনু কাছীর, ২০০২ খ্রি. হাদিস নং ৪৯৮৭

৩১। When it was the night on which God honoured him with his mission and showed mercy on his servant there by, Gabriel brought him the command of God. `He come to me, said the Apposite of God, 'While I was asleep with a coverlet of brocade, where on was some writing and said, 'Read'. Ibn-i -Islaq: P. 106.

৩২। আল-কুরআন, ৯৬: ১-৫

ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল জাহেলিয়াতের সময়ও সত্যান্বেষী, জ্ঞানী ও খাঁটি ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি ইরানী ভাষাতেও সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওয়ারাকা রাসূলের উম্মতের মধ্যে শামিল কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তিনি যে খাঁটি মুমিন ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি মহানবিকে (স.) সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া রাসূল (স.) নিজেই বলেছেন, "আমি স্বপ্নে ওয়ারাকাকে বেহেশতে সাদা রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।" নবির স্বপ্ন ওহী। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, বুখারী শরিফ, খ. ১, পৃ. ১০

৩৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩

* ওয়ারাকার বক্তব্য শুনে মহানবি (স.) বুঝে ছিলেন, নবুয়তের দায়িত্ব পালনের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, কন্টকাকীর্ণ। সকল নবিই এ দুর্গম পথ অতিক্রম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকেও এ কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। এতে ভয় বা আশাহত হওয়ার কিছু নেই।

৩৪। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৩৪

৩৫। মান্না আল-কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩৬। ড. ইবরাহীম আনীস, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, খ.২, পৃ. ১০১৮

৩৭। মান্না আল-কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯। আল্লামা কারমানী, *শারহুল বুখারী*, খ.১, পৃ. ১৪

৩৮। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, *ফয়জুল বারী*, খ. ১, পাকিস্তান: আল-মাতবুয়াতে ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খ্রি. পৃ. ১০১৮

৩৯। ড. ইবরাহীম আনীস, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, খ. ২, পৃ. ১০১৮, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল সুকরী, আল-মিসবাহুল মুনীর, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, ১৯৯০ খ্রি. খ.১, পৃ. ৬৫১-৬৫২
৪০। আল-কুরআন, ৪২: ৫১
৪১। "In this case an idea is convered to the mind and the subject to which it relates is illumined as if by a lash of lighting. It is not a massage in words but simply an idea which clears up a doubt or a difficulty and it is not the result of meditation. Moulana Muhammad Ali, The Religion of Islam-20.
৪২। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, *ফয়জুল বারী*, ১ম খণ্ড (পাকিস্তান: আল-মাতবুয়াতে ইসলামিয়াহ, ১৯৭৮ খ্রি. পৃ. ১৪-১৮
৪৩। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, *মাদারিজুল সালেকীন*, খ. ১, পৃ. ৩৭
৪৪। *আল-কুরআন*, ১৬:৬৮
৪৫। আল-কুরআন, ২৮:৭
৪৬। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদিস নং-২, পৃ. ২
৪৭। আল-কুরআন, ৪৮:২৭
৪৮। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২
৪৯। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০
৫০। মান্না আল-কাত্তান, প্রাগুক্ত, ১৪১৪ হি. পৃ.৩৯
৫১। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২
৫২। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৪৭
৫৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২
৫৪। আল-কুরআন, ২:৯৭
৫৫। জালাল উদ্দীন সূয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন*, মিসর: ১৯৫১ খ্রি. খ.১, পৃ. ৪৬
৫৬। ইবনে হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, মাতবায়ে সালাফিয়া, খ. ১, পৃ. ১৮, ১৯
৫৭। জালাল উদ্দীন সূয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৬
৫৮। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকেম নিশাপুরী, *আল মুস্তাদরাক*, খ.২, পৃ.
৫৯। জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৬
৬০। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৯
৬১। আল-কুরআন, ৪২:৫১
৬২। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২
৬৩। আল-কুরআন, ৪৮:২৭
৬৪। আল-কুরআন, ১৫:৯
ইতঃপূর্বে কুরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। যেমন, *আল-কুরআন*, ৮৫:২১, আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, "বরং এটি এমন কুরআন যা সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত আছে।"
৬৫। আল-কুরআন, ৭৫:১৭-১৯
৬৬। আল-কুরআন, ৭৫:১৬-১৭
৬৭। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ, ২, পৃ. ১৪৮
৬৮। জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, মিসর:১৯৫১ খ্রি. খ.১৩, পৃ. ৭৩-৭৪
৭৯। আল্লামা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৭০। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৭১। আল্লামা তাকী উসমানী, *উলুমূল কুরআন এবং উসুলে তাফসির*, অনুবাদ মাওলানা উসমান আবদুল খালেক, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স-২০০৫ খ্রি.।

৭২। ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৮
৭৩। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম, *যাদুল মায়াদ*, খ.১, পৃ. ৩৭
৭৪। ইবনে হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৮
৭৫। মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, কুরআন, *সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: দারুল কিতাব-২০০০ খৃ. পৃ. ১৯২
৭৬। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৫-১৪৬
৭৭। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৭৪৬
৭৮। মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল আনসারী আল-কুরতবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, বৈরুত, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৬৩
৭৯। মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: দারুল কিতাব, ২০০০ খ্রি. পৃ. ২১৮
৮০। মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮
৮১। আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল-কুরআন ও নারী

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন ও নারী

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই পুরুষের সঙ্গী হিসেবে নারীকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ একাকী চলতে পারে না। আর মানুষের উত্তম সঙ্গী তার স্ত্রী, যদি কিনা স্ত্রী দীনদার, বুঝদার ও সমঝদার হয়। মানব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে তার পরিবার এবং মা হচ্ছে সন্তানের উত্তম শিক্ষিকা। মা ভাল হলে সন্তান ভাল হবে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারি। এক জন মানুষ তার পরিবার থেকে যা শিখে সারা জীবনেও সেই শিক্ষা থেকে সে বের হতে পারে না। তাই যত বড় উচ্চ শিক্ষিতই হোক না কেন, আদর্শবতী মায়ের উত্তম আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান কখনো কোন প্রলোভনে নীতিভ্রষ্ট হয় না। আবার ইসলামি জ্ঞান সম্পন্ন আদর্শবতী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী সারাটি জীবন সুখে-দুঃখে স্বামীর সাথে হাসিমুখে কাটিয়ে দেয়। স্বামীকে বিপদে-আপদে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেয়। সন্তানদেরকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলে, যা সারা জীবন তাদেরকে সঠিক ভাবে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করে। এভাবেই জাতি পায় আদর্শ মানব, যা আদর্শবতী নারীর ফসল স্বরুপ।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ আল-কুরআনে নারী প্রসঙ্গ

যুগে যুগে নারীদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে। নারীকে মনে করা হয়েছে পাপের উৎস। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মানুষ মন খারাপ করে। কারণ তাকে সময় ও অর্থ ব্যয় করে বড় করে অনেক উপহার উপঢৌকন সহ অন্যের হাতে সোপর্দ করতে হবে । আবার সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুরু হয় যৌতুকের জ্বালা। অশান্তির চরম পর্যায়ে যদি সংসার ভেঙ্গে যায় তখন সেই মেয়েকে নিয়ে অভিভাকদের নতুন করে ভাবতে হয়। নতুন চিন্তার বোঝা তাদের মাথায় চাপে। আবার সমাজের কিছু সুবিধাবাদী লোক এই সব বিপদগ্রস্ত মেয়েদেরকে অন্যায় ও অবৈধভাবে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে চায়। কখনো কখনো তাদেরকে ফাঁদে ফেলে বিভিন্ন ভাবে তাদের থেকে সুবিধা আদায় করে। যার কারণে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে স্বাভাবিক ভাবে বেশির ভাগ মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। যা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে আরব সমাজে বিদ্যমান ছিল। যার কারণে আল্লাহ্পাক কুরআনে আয়াত নাযিল করেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ۝۵۸ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ۝۵۹

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। আপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ!"[১]

ঐসময়ে দুঃখে অপমানে অনেকে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। কারণ সমাজে তখন নারীর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ইসলামে নারীর প্রতি মানবতা বিরোধী আচরণের প্রতিবাদ করে কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ۝۸ بِاَىِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ۝۹

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"[২]

আসলে কন্যাটির কোন অপরাধ নেই, অপরাধ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার। আমাদের সামাজেই কন্যাদের সাথে অপমানজনক আচরণ করা হয়। অথচ ইসলাম প্রতিটি মানবের সম্মান নিশ্চিত করেছে। এভাবে নারী জাতির সম্মানার্থে কুরআন-হাদিসে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। ইসলাম নারীকে দিয়েছে মাতার সম্মান, স্ত্রীর মর্যাদা, বোনের সম্মান, মেয়ের প্রতি আদর, স্নেহ ও ভালবাসা যা অন্য ধর্মে দেখা যায় না।

পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহর আইনে মাতৃ উদরে, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর হতেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে মহানবি (স.) গমেদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন নি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর তার মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা ছিল। সুতরাং ইসলামি আইন বিশারদগণ সন্তান গর্ভধারণের ১২০ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য্য করেছেন। কেননা এই সময়ে গর্ভ সঞ্চার (Fetus) গোশতপিন্ডে রুপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর 'মানুষ' পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। ইসলামের এ অভিমত শত-সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে।[৩]

আবার কন্যা সন্তানের সম্মানার্থে কুরআন-হাদিসে বহু বর্ণনা রয়েছে। যেমন,

হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তান বা তিন বোনের লালন-পালন করবে (তারা কন্যা বা বোন) সে ব্যক্তির দোযখে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।[৪]

আবার কন্যা সন্তানদের প্রতি সুবিচার করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) তাকীদ করেছেন। হাদীছে এ বিষয়ে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا-يَعْنِي الذُّكْرَ- أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ "

ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যদি একটি পরিবারে একের পর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে কন্যারা তাদের পিতা-মাতাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবে।[৫]

রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দুই কন্যাকে তাদের বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৬]

এরপর রাসূলের (স.)-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে নারী পেয়েছে তার যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামকে যথাযথ ভাবে পালন করলে কারো মনে কোন দুঃখ, কষ্ট, ক্ষোভ ইত্যাদি থাকতো না। এবং ইহকাল ও পরকালে শান্তি ও মুক্তির আশায় মানুষ নারীর সাথে উত্তম ও সম্মানজনক আচরণ করতো। কারণ একজন নারীর মাধ্যমেই মানব সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখে ও তার শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে বেড়ে ওঠে। সঠিক ইসলামি জ্ঞান মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নারীদের করণীয় দিক বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা

ইসলাম নারী জাতির সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেই একদিকে যেমন পুরুষকে দিয়েছে নারীর কর্তৃত্ব, অপর দিকে তেমনি তার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ তথা সুশাসন থেকে ন্যায্য চাহিদা পূরণের সমস্ত দায়ভারও পুরুষের কাঁধেই অর্পণ করেছে। এ সম্পর্কে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল করিম (স.) তার উম্মতদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেন যে, পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, অতএব, হে পুরুষগণ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত রেখ। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, স্ত্রীদেরও হক তোমাদের উপর হক রয়েছে।

তোমাদের বড় হক তাদের উপর এই যে, তারা তোমাদের বিছানায় অন্যকে স্থান দিবে না; যা তোমাদের নিকট অগ্রহণীয় (নিজের সতীত্ব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করবে) এবং এই হক যে তারা এমন কোন কাজ করবে না যা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, ফাহেশা ও বেহায়াপনা; যদি এমন কাজ করে তাহলে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে শয্যায় তাদের থেকে বিমুখ বিরাগী হয়ে থাকা; আরও প্রয়োজন হলে শাস্তি ও দিতে পার। কিন্তু আঘাত জনিত প্রহার করতে পারবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় যদি নির্লজ্জ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়, তবে ভদ্রোচিত খোরপোষের পূর্ণ অধিকার তাদের জন্য প্রকৃতিতে থাকবে। নারীদের সম্পর্কে আমার বিশেষ নির্দেশ পালন করো যে, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখবে, তারা তোমাদের স্বামীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে, স্বেচ্ছাধীন তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজের পথ নিজে গ্রহণ করার সুযোগ তাদের নেই। তোমরা তাদেরকে লাভ করেছ আল্লাহর আমানত হিসেবে এবং তাদের সতীত্বকে নিজের জন্য হালাল করতে পেরেছ আল্লাহর বিধানের অধীনে। সেই আল্লাহর রাসূল আমি, তাদের সম্পর্কে তোমাদের এসব নির্দেশ দিলাম।[৭]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ۪ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

"আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৮]

নারীগণ তাদের সাজ সজ্জা ঘরের লোকজন বিশেষ করে নিজ স্বামীর সামনে প্রকাশ করবে। বাইরে পর পুরুষের সামনে প্রকাশ করবে না। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ قَرْنَ فِیْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه۪ٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবি পরিবার, আল্লাহতো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৯]

আর ঘরের বাহিরে চলাফেরার সময় কিভাবে চলতে হবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক রাসূল (স.) কে নির্দেশ দিলেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

"হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১০]

* জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

"ইসলাম প্রয়োজন হলে নারীদের অবশ্যই বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করেছে। বাস্তবে নারীরা যে ঘরের বাইরে যাবে এই সত্যের উপর ভিত্তি করেই পর্দার ধারনাটি এসেছে। কেননা ঘরের ভিতরে থাকলে তো আর পর্দার দরকার পড়ে না। নবি (স.) নিজে বলেছেন যে, আল্লাহ নারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। আত্মরক্ষার্থে নারীরা হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে জাতি ও দেশের প্রতিরক্ষায় নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। নবির (স.) স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মুসলমান নারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন। পূর্বে উল্লেখ আছে, নবির (স.) স্ত্রী আয়েশা নিজেই উষ্ট্রের যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।[১১]

স্বামীর অগোচরে তার সম্পদ প্রয়োজন অনুসারে স্ত্রী নিতে পারে । এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উৎবাহ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার এবং আমার সন্তান সন্ততির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সে আমাকে দেয় না বলে আমি তার অগোচরে যা প্রয়োজন ততটুকু নেই। তারপর রাসূল (স.) বলেন, 'তোমার ও সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পার।'[১২]

বুখারীতে সংকলিত একটি হাদিসে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবি করিম (স.) বলেছেন, যখন কোন স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘর থেকে গরীব দুঃখীকে অনুদান (বা অর্থ দান) করে, অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন পর্যায়ে নয় তখন সেই স্ত্রী নিজের দান কার্যের সওয়াবের অধিকারিনী হয় এবং স্বামীও নিজের অর্জিত অন্ন বা ধন খরচ হওয়ার সওয়াব লাভ করে। এমনকি সেই ধনের কোষাধ্যক্ষ ও সওয়াব লাভ করে।

হাদিসটি যদিও প্রত্যক্ষভাবে দান খয়রাতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তথাপি পরোক্ষভাবে এতে স্বামীর সম্পদের বা ধনের উপর স্ত্রীর অধিকারের বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হয়।[১৩]

যেহেতু ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে, সেহেতু স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য তাকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও অনেক নারী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ছিল। নবির (স.) স্ত্রী খাদিজা একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। এমনকি সেই সময়ে নারীরা গৃহস্থালীর জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে যেতেন। হযরত ওমর

(রা.), হযরত শিফা (রা.) নামে এক মহিলা সাহাবিকে বাজার ব্যবস্থাপনার কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। পুরোপুরি পর্দা মেনে চলেও তাঁরা তাঁদের এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন।[১৪]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৫]

হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (স.) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।[১৬]

অপর এক হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

«مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

"তোমাদের মধ্যে শরিয়ত বিরোধী কাজ হতে দেখলে সে তা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করবে। যদি সে এর শক্তি না রাখে তবে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে, আর যদি এর শক্তিও না রাখে তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটাই হল ইমানের দুর্বলতম স্তর।"[১৭]

আর আমরা যেন সঠিক নিয়মে ইসলাম সম্মত জীবন যাপন করি ও অন্যদেরকে সেভাবে চলতে উৎসাহিত করি। সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

"আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।"[১৮]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"[১৯]

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন ও চলাফেরা শালীনভাবে করার জন্য আল্লাহ পাক আল-কুরআনে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ؕ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۳﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা নবির ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নবিকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আর যখন নবিপত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার (মৃত্যুর) পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয় এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ।"[২০]

স্ত্রী জাতির সাথে কেমন ধরণের আচার-আচরণ ও জীবন যাপন করতে হবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এমনকি সম্পর্ক বিচ্ছেদের সময়েও যেন মানুষ স্ত্রীর সাথে দুর্বব্যবহার করার সাহস না করে। সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍؕ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۲۲۹

"তালাক দুবার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম।"[২১]

অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ্ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা সঠিকভাবে মেনে চলে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি নিশ্চিত করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নারীদের বর্জণীয় দিক বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা

নারীদের বর্জণীয় দিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

"হে নবি, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২২]

একবার কিছু লোক হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেন, সে সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱﴾ لَوْ لَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۲﴾

"নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহা আযাব। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ'?"[২৩]

সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে আমরাও সচেতন হব এবং অন্যের সম্পর্কে সব সময় ভালো ধারণা পোষণ করব। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿۲۵﴾

"যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য।"[২৪]

নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেউ যেন কারো নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ না করে। সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে অন্য বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

"যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।"[২৫]

অতএব প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্যে আমাদের কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা উচিত নয়। মুনাফিক চরিত্রের লোকদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٦٧

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, আর ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন নিশ্চয় মুনাফিকরা হচ্ছে ফাসিক।"[২৬]

কোনো ক্রমে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং তারা বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায়ে পৌঁছে যায় সে সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর নির্দেশ সমূহ নিম্নরূপ:

وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢٢٨

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরূ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে এবং তাদের জন্য হালাল হবে না যে, আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা তারা গোপন করবে, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর এর মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধন চায়। আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৭]

* 'কুরূ' দ্বারা হায়েয মতান্তরে তুহূর বা পবিত্রাবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

তালাক প্রসঙ্গে

রাসূল (স.) বলেছেন, অনুমতিযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে তালাক অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়।[২৮]

হাদিসে আছে, যে স্ত্রী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তালাক নেয়, সে কোনদিন বেহেশতে যাবে না।[২৯]

অতএব, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তাহলেই আমাদের ইহকালীন জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে ও আমরা আমাদের পরকালীন জীবনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নারীদের সম্মান বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা

নারী-পুরুষ সবাই যে যার নিজস্ব অর্জিত সম্পদের অধিকারী। কেউ কারো উপার্জিত সম্পদ জোর করে ভোগ-দখল করার স্বাধীনতা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেন নি। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ
لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"[৩০]

আল-কুরআনে এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে,

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ
ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ
اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

"আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"[৩১]

আল-কুরআনে সন্তানদের মধ্যে সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ
كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ
مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতাপিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতাপিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত

পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতাপিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩২]

তালাক প্রসঙ্গে ও দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নির্দেশনা

وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۲۴۱

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধি মোতাবেক ভরণ-পোষণ। (এটি) মুত্তাকীদের উপর আবশ্যক।"[৩৩]

আল-কুরআনে এ বিষয়ে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ
اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۲۳۲

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৩৪]

আতিকা বিনতে মায়দের বিয়ে হয়েছিল হযরত আবুবকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ সাথে। বিশেষ কিছু কারণে আবূবকর (রা.) তালাক দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। পিতার পরামর্শ অনুযায়ী আবদুল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে, কিন্তু এ কাজের জন্য তার যথেষ্ট অনুশোচনা ও দুঃখ ছিল। কারণ তিনি আতিকাকে খুবই ভালবাসতেন। আবদুল্লাহর আগ্রহ দেখে হযরত আবূবকর (রা.) আতিকাকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি তাঁকে পুনরায় বিয়ে করলেন। তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ শহীদ হলেন। কোন কোন রিওয়ায়েত অনুসারে এরপর যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতিকাকে বিয়ে করলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে উমর (রা.) এবং তারপর যুবায়র (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত যুবায়র (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতিকা নিজেই বিয়ে করতে অস্বীকার করেন।[৩৫]

সাহল বিনতে সুহাইলের বিয়ে হয়েছিল পর পর চার জনের সঙ্গে অর্থাৎ হযরত হুযাইফা বিন আতাবা (রা.) আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ, শাম্মাখ ইবনে সাইদ এবং আব্দুর রহমান ইবনে হাওফ এর সাথে।[৩৬]

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয় হযরত আলী (রা.)-এর ভাই জাফর (রা.)-এর সাথে। অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলাতে অনুষ্ঠিত মুতার যুদ্ধে জাফর (রা.) শাহাদত লাভ করলে আসমা হযরত আবূবকর (রা.)-কে বিয়ে করেন। আবূবকর (রা.)-এর ওফাতের পর তিনি আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৩৭]

হযরত আলী (রা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম আপন চাচাতো ভাই আউন বিন জাফরের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। আউন এর মৃত্যুর পর তারই অপর ভাই মুহাম্মদ বিন জাফরকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ এর ওফাতের পর তাদের অন্য ভাই আবদুল্লাহ বিন জাফরের সাথে উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়।[৩৮]

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

নারী-পুরুষ সবাই স্বাধীনভাবে নিজস্ব কাজকর্ম ও মত প্রকাশের অধিকার এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٧١

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৯]

আবদুল্লাহ ইবন রাফে (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মকান্ডে লোকদের সমবেত করার উদ্দেশ্যে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করতেন। তখন উম্মে সালমা (রা.) উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলতেন, আমিও মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।[৪০]

নবির (স.) স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেই যুদ্ধে নবির সাহাবিরাসহ অনেক পুরুষ, হযরত আয়েশা (রা.)-এর নেতৃত্ব মেনে নেন। তিনজন খলিফা আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), এবং ওসমান (রা.) হযরত আয়েশাকে ধর্মের ব্যাখ্যাকারিণী হিসেবে এবং ধর্মের ফতোয়া দানকারিণী হিসেবে মেনে নেন এবং বিশেষ মর্যাদা দেন। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানকে (রা.) খলিফা নির্বাচনের সময় পুরুষ ও নারী উভয়ের মতামত চাওয়া হয়েছিল। তখন উপদেশ এবং পরামর্শ সভা (shura) ও অন্যান্য সভায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতো, যার মাধ্যমে তারা কৌশলগত ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর নীতি নির্ধারণের সুযোগ পেতেন।[৪১]

কর্মক্ষেত্রে নারী

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ۝٣٢

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"[৪২]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বোন হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রা.) নিজে নয় মাইল হেঁটে কর্মক্ষেত্রে যেতেন, আবার বোঝা (শুকনো খেজুরের বীচি) মাথায় করে নয় মাইল পথ হেঁটে ফিরে আসতেন। অথচ তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি যুবায়েরের স্ত্রী।[৪৩]

একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা বাইরে কাজে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে লোকেরা তাকে গালমন্দ করলেন। মহিলাটি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে গেলে তিনি তাকে বাইরে যাবার অনুমতি দেন এবং পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, মহিলাটি যদি তার অর্থনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে তবে সে তার সংগৃহীত অর্থ সৎকাজে ব্যয় করতে পারবে এবং মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।[৪৪]

যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর অবদান

জিহাদ ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। নারীগণ যখন শুনতে পেলেন আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভকারীর মর্যাদা অনেক বড়, তখন তাঁরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবি করীম (স.)-এর যুগে নারীরা সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা যোদ্ধাদের পানি পান করানো, সেবা শুশ্রুষা, খাদ্য তৈরী ও আহতদের চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তবে প্রয়োজনে নারীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতেন। তাদের মধ্যে উম্মে আম্মারা নাসীবা (রা.) যখন ওহুদের সশস্ত্র জিহাদে মুসলমানদের দুরবস্থা এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-কে আহত দেখেন, তখন একজন সাহাবির পরিত্যক্ত তরবারি নিয়ে শত্রুর প্রতি আক্রমণ করেন। রাসূল (স.) বলেন, ডানে ও বামে আমি যে দিকে তাকাচ্ছিলাম, সেদিকেই দেখছিলাম উম্মে আম্মারা (রা.) আমাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়াই করছিল।[৪৫]

হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সালীত (রা.)-এর নিকট একখানা তলোয়ার দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তলোয়ার দিয়ে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, তলোয়ার এজন্য নিয়েছি যে, আমার নিকট দিয়ে কোন মুশরিককে যেতে দেখলে তার পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেব। তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) হেসে দিলেন।[৪৬]

বিবাহের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের নির্দেশনা

বিবাহ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ١ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ١ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ١ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ١ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ١ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ١ؕ وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝۲۵

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন–মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে (বিবাহ করবে) তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্য থেকে, তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের কাউকে। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা একে অন্যের থেকে (এসেছ)। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও এমতাবস্থায় যে, তারা হবে সতী-সাধ্বী, ব্যভিচারিণী কিংবা গোপন যৌনসঙ্গী গ্রহণকারিণী নয়। অতঃপর যখন তারা বিবাহিত হবে তখন যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর স্বাধীন নারীর অর্ধেক আযাব হবে। এটা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৭]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً١ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا۝۳۲

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"[৪৮]

পর্দা বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা

পর্দা বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآىِٕكُمْ١ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۝۳۲

"হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[৪৯]

আল-কুরআনে নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ١ۖ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ١ۖ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ١ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۳۱

"আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫০]

আল-কুরআনে পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ١ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۳۰

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[৫১]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا١ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ١ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ۲۷

"হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না।"[৫২]

মুমিন নারী-পুরুষ এর সম্বন্ধে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ١ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۳۵

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।"[৫৩]

যিনাকারী মহিলা প্রসঙ্গে

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের জনৈকা মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে নবি (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর নবি। আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, তাই আমাকে দণ্ডিত করুন। নবি করিম (স.) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভাল ব্যবহার করো এবং সে সন্তান প্রসব করলে তাকে নিয়ে আমার এখানে এসো। সে তাই করল। মহিলাকে কাপড় দিয়ে ঢেঁকে ফেলা হল। তারপর নবি (স.)-এর আদেশক্রমে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল এবং তার জানাযা পড়া হল। তখন উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবি! আপনি এই যিনাকারী মহিলার জানাযা পড়লেন? তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে, যা মদীনার সত্তর জন লোকের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের ক্ষমার জন্য তা যথেষ্ট হত। সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। এর চেয়ে উত্তম তওবা কি তুমি করেছো।[৫৪]

মহিলাদের জামায়াতে নামায প্রসঙ্গে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাবের সহধর্মিনী ফজর এবং এশার নামাযের জামায়াতে মসজিদে হাজির হতেন। তাকে বলা হলো আপনি নামাজের জন্য বের হচ্ছেন, অথচ আপনি জানেন, উমর (রা.) এটা অপছন্দ করেন এবং তার আত্মমর্যাদায় বাঁধে। তিনি জবাব দিলেন, কে তাকে আমাকে নিষেধ করতে মানা করেছে? জবাব দিলেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর এই হাদিস তাকে নিষেধ করতে বাঁধা দিয়েছে। আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাঁধা দিয়ো না।[৫৫]

সম্পত্তি বণ্টন প্রসঙ্গে

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ١۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ١ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا۝۷

"পুরুষদের জন্য মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক নির্ধারিত হারে।"[৫৬]

কুরআনুল কারীমে ওয়ারিসদের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে সূরা নিসা ৭, ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে, কয়েকটি অবস্থা ব্যতীত নারীর সে অংশ হচ্ছে পুরুষের অর্ধেক।

পুরুষদের জন্য মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক নির্ধারিত হারে।[৫৭]

আল-কুরআনে সন্তানদের মধ্যে সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ١ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ١ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ١ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ١ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ١ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ١ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ١ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا١ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۝۱۱

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতাপিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতাপিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতাপিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৫৮]

আল-কুরআনে স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ١ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ١ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ١ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ١ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ١ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ١ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ١ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾

"আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"[৫৯]

আল-কুরআনে 'কালালা' সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يَسْتَفْتُوْنَكَ١ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ١ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ١ۚ وَ هُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ١ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ١ؕ وَ اِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ١ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا١ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

"তারা তোমার কাছে সমাধান চায়। বল, ' আল্লাহ তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন 'কালালা' সম্পর্কে। কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় এমন অবস্থায় যে, তার কোন সন্তান নেই এবং তার এক বোন রয়েছে, তবে সে যা রেখে গিয়েছে বোনের জন্য তার অর্ধেক, আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যদি তারা (বোনেরা) দুজন হয়, তবে সে যা রেখে গিয়েছে তাদের জন্য তার দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি তারা কয়েক ভাইবোন পুরুষ ও নারী হয়, তবে পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান হবে'। আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।"[৬০]

* যার পিতা মাতা জীবিত নেই এবং যে সন্তানহীন তাকে 'কালালা' বলা হয়।[৬১]

স্ত্রীর সাথে পরার্মশের ক্ষেত্রে

রাসূল (স.) সব সময় পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকে তাগিদ করতেন। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানের দুধপান প্রসঙ্গে পরামর্শের ক্ষেত্রে আল-কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে, নিম্নরূপ:

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ١ؕ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا١ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ١ۗ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ١ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا١ؕ وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۲۳۳

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মা দেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[৬২]

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমণ ও বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূল (স.)-এর সঙ্গে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবি নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় রাসূল (স.) তাদেরকে ঐখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবিদের মধ্যে তার এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নি। এ অবস্থা দেখে রাসূল (স.) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সবকথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবিগণ কাজ করতে লেগে যাবেন। রাসূল (স.) তাই করলেন এবং সাহাবিরাও রাসূল (স.)-কে অনুসরণ করল।[৬৩]

এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পরামর্শ কাজে লেগেছিল। তাই বলা যায়, স্ত্রীকে নারী হওয়ার কারণে দুর্বল ভেবে অবহেলা না করে সকল কাজ স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে করলে অনেক কল্যাণ সাধিত হয়।

নারীদের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন তথা আইনগত অধিকার

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ١ۖ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ۚ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۲ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً١ۖ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ١ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ۳

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে

পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।"[৬৪]

আল-কুরআনে চুরির শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ١ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۳۸

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৬৫]

অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا١ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ۴ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا١ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۵

"আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক। তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬৬]

নবি (স.) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেওয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেন।[৬৭]

আল-কুরআনে দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا١ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا١ۙ **وَ اجْعَلْ** لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۷۵

"আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী'।"[৬৮]

হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবি ও রাসূল এবং আমরা তাঁর সর্বোত্তম উম্মত। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ١ؕ **وَ** لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ١ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ۱۱۰

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"[৬৯]

ঈদের উৎসবে নারীদের অংশগ্রহণ

হযরত উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। এমন কি আমরা কুমারীদেরকেও পর্দার ভিতর থেকে বের করে আনতাম।

ঋতুবতী মহিলারা বেরিয়ে পুরুষদের পিছনে বসে থাকতেন। তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলতো এবং ঐ দিনের বরকত কামনা করতো ও গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতো।[৭০]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

"কল্যাণ ও মুমিনদের দোয়ায় উপস্থিত থাকার জন্য বেরিয়ে আসতো।"[৭১]

হযরত আবু খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, মেয়েরা রাসূল (স.)-কে বলল, আপনার কাছে সব সময় পুরুষদের ভিড় লেগে থাকে। তাই আমরা আপনার মুল্যবান উপদেশ হতে বঞ্চিত থেকে যাই। আপনি আমাদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য্য করুন, এবং তিনি আলাদা দিন ধার্য্য করে সেই দিন তাদের কাছে গেলেন। তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্যে হারাম। এক ভদ্র মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুটি হয়? রাসূল (স.) বললেন, দুটি হলেও।[৭২]

أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا»

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, আমার কাছে মানুষ ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আসে। তাদের এক পক্ষ, অপর পক্ষের তুলনায় আমি তাকে সত্যবাদী বলে মনে করি এবং তার স্বপক্ষে রায় দিয়ে দেই। আমি যদি কোন মুসলমানের অধিকার ক্ষুন্ন করে রায় প্রদান করে থাকি, তবে তা হবে আগুনের টুকরো, সে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে বা পরিত্যাগ ও করতে পারে।[৭৩]

হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে

ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'রাওহা' নামক স্থানে একটি কাফেলার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন কওমের লোক? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তারা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহর রাসূল। তখন এক মহিলা তার সামনে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তার পুরস্কার লাভ করবে তুমি।"[৭৪]

রাসূল (স.)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "বিদায় হজ্জের সময় আমরা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে যাত্রা করলাম... আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ই করলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি আমাকে বললেন, চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরার নিয়ত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম... ।"[৭৫]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে (রা.) বলেন, "রাসূল (স.) যখন কোন রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মকান্ডে লোকদের সমবেত করার উদ্দেশ্যে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করতেন তখন উম্মে সালমা (রা.) উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলতেন, আমি ও মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।"[৭৬]

হযরত মুআবিয়া (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে লিখেছিলেন যে, আমাকে অল্প কথায় এমন কিছু উপদেশ দিন, যা আমি সব সময় সামনে রাখতে পারি। তাই হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে নিম্নে উল্লেখিত নবি (স.)-এর অত্যন্ত কার্যকর বাণীটি লিখে পাঠান যা মানদণ্ডের অধিকারীদের পথ নির্দেশনা দিতে সক্ষম।

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে মানুষ তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। (আর এ ক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে সে সরকার পরিচালনা করে)।[৭৭]

জুলুম নির্যাতিত অবস্থায় হিজরত প্রসঙ্গে

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ
قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ سَآءَتْ
مَصِيْرًا ۙ ٩٧ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لَا
يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ ٩٨ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ٩٩ وَ مَنْ
يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا
اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ قَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ١٠٠

"নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনে আলোচিত নারীগণ

আল-কুরআনে নারীদের প্রসঙ্গে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয় নারীদের প্রসঙ্গে সরাসরি আয়াত নাযিল হয়েছে, যা ঐ সমস্ত নারীদের সম্মানের নিদর্শন স্বরুপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু নারীদের বিবরণ ও সেই প্রসঙ্গে আল-কুরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো,

বিবি হাওয়া (আ.)

হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবি হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী। হযরত আদম (আ.) আদি পিতা আর হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীর সকল মানুষের মা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ শক্তির দ্বারা হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হযরত আদম (আ.)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তাঁদের উভয়কে জান্নাতে থাকার স্থান দিয়েছেন। আর জান্নাতের বিশেষ একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন।[৭৯]

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ١١٧

"অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে কিছুতেই বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা দুর্ভোগ পোহাবে'।"[৮০]

শয়তান তাঁদেরকে এই বলে ধোঁকা দিয়েছেন যে, তোমরা এই গাছের ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হতে পারবে। তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সেই গাছের ফল খেয়েছেন। তখন আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, তোমরা জান্নাত ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাও।[৮১]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ١٢٠ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَ عَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ١٢١ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى ١٢٢

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?' অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেল। তখন তাদের উভয়ের সতর তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল।"[৮২]

হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে এসে নিজের ভুলের জন্য খুব কেঁদেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ভুলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতোপূবেহযরত হাওয়া (আ.) হযরত আদম (আ.) থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। (এক জয়ীফ বর্ণনামতে জান্নাত থেকে হযরত আদম (আ.)-কে হিন্দুস্থানে এবং হযরত হাওয়া (আ.)-কে জেদ্দায় নামানো হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে একত্রিত করে দিয়েছেন।[৮৩]

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ۫ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٢٣

"তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুল্ম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'।"[৮৪]

সূরা ত্ব-হা-র ১২২ নং আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ দুজনকে বেহেশত হতে বিতাড়িত করার পূর্বে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহর বাণী বহনের জন্য নবি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। আদি পাপের কোন ধারণা ইসলামে নেই। সকল আদম সন্তান নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।[৮৫]

মুসলিম গণ বিশ্বাস করে না যে, নিষিদ্ধ ফল খেতে বিবি হাওয়া হযরত আদমকে প্ররোচিত করেছিল। যদিও কোন কোন ধর্মমতে হযরত আদমকে বেহেশত থেকে বিতাড়নের জন্য বিবি হাওয়াকে দায়ী করা হয়। শয়তান হযরত আদমকেই নিষিদ্ধ ফল খেতে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।[৮৬]

অতঃপর তাঁদের থেকে অসংখ্য সন্তান সন্ততি হয়েছে। মানব বংশ বৃদ্ধিতে হযরত আদম অপেক্ষা বিবি হাওয়ার অবদান কম নয়। সন্তান ধারণ এবং প্রসবে পুরুষের চেয়ে নারীর ব্যথা-বেদনা, যাতনা অনেক বেশি।

বিবি সারা (আ.)

জেরুজালেমের দিকে হারান এলাকায় খাজায়েনুল ওয়াজাহ একটি জায়গার বাদশার কন্যা ছিলেন হযরত সারা (আ.)। স্বামী হিসেবে পাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সারা (আ.) স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেন ও তাঁর গলায় মালা পরিয়ে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ লাভ করে স্ত্রী সারাকে নিয়ে বাবেলের পথে যাত্রা করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শুশুর বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে নিজ দেশে আসার জন্য মিশরের সীমান্ত এলাকায় এসে সাধুনের রাজ্যে উপস্থিত হন।

সে তার রাজ্য দিয়ে প্রবেশকারীদের কাছে কোন সুন্দরী মেয়ে পেলে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হত এবং পুরুষকে হত্যা অথবা কারাগারে আটক করা হত। হযরত ইবরাহীম (আ.) মিশর সীমান্তে উপস্থিত হয়ে একথা জানার পর ভীষণ চিন্তায় পড়েন এবং একটি বুদ্ধি করে স্ত্রী সারাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে ভরে তালা মেরে দেন এবং পূণরায় পথ চলতে আরম্ভ করেন। সীমান্তে উপস্থিত হলে রক্ষীরা সিন্দুক খোলার জন্য অনুরোধ করে। ইবরাহীম (আ.) বলেন, এটা খোলা যাবে না। কিন্তু সীমান্ত রক্ষীদের মনে কৌতুহল জাগে। তারা মনে করে এতে গোপনীয় বস্তু আছে, তাই তারা জোরপূর্বক সিন্দুক খুলে এরপর ইবরাহীম ও তার স্ত্রী সারাকে বাদশাহ সাধুনের প্রসাদে নিয়ে যায়। তখন সাধুন অনুচরদের বলে, এ যুবককে কারাগারে নিয়ে যাও, আর এ সুন্দরীকে আমার মনোরঞ্জনের জন্য আমার শাহী মহলে নিয়ে এস। যখনই সাধুন সারার প্রতি এগিয়ে যায় তখনই তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে অত্যাচারী সাধুনের শরীর অবশ হয়ে আসে। সাধুন অসহায়ের মত হযরত সারা (আ.)-এর কাছে বলে মা আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনাদের মুক্ত করে সম্মানের সাথে বিদায় করব। আমি আর অন্যায় করব না, তখন হযরত সারা (আ.) আল্লাহর কাছে আবেদন করার পর সাধুন আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে পেল। এর পর সাধুন লোকদের বলে এ মহিলা ও কারাগারে আটক যুবকদের মুক্ত করে সম্মানের সাথে বিদায় করে দাও। বাদশাহর কথানুযায়ী কাজ হল কিন্তু তাদের শুধু খালি হাতেই বিদায় করা হল না। অনেক ধন-সম্পদ ও বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী প্রদান করে, সম্মানের সাথে বিদায় করা হল। যাবার সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)ও সারার খেদমতের জন্য একজন দাসী প্রদান করা হল, যার নাম হযরত হাজেরা।

বাদশাহ সাধুনের দরবার থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী সারা ও দাসী হাজেরাকে নিয়ে বাবেলে এসে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হলেও সন্তান জন্মেনি। তার স্ত্রী তাকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন মনে মনে এ প্রস্তাবকে সমর্থন করার পরও মুখে হ্যা বা না কিছুই বলেননি। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় বিয়ে করতে রাজি হলেন এবং জিজ্ঞেস করেন তোমার পছন্দ করা পাত্রীটি কে? তখন সারা বলেন এ জন্য আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। পাত্রীতো আমার ঘরেই আছে, আমি আমাদের পরিচারিকা হাজেরার সাথে আপনার বিয়ে দিতে চাই। পরিশেষে এভাবেই একদিন হাজেরার সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিয়ে সম্পন্ন হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) হাজেরাকে বিয়ে করার কিছু দিনের মধ্যে হযরত হাজেরার গর্ভে সন্তান আসে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স যখন ৭০ বছর তখন হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাইল (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন হযরত সারা (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)কে লক্ষ্য করে বলেন, হাজেরা থাকলে আমি অন্য স্থানে চলে যাব, আর যদি আপনি আমাকে রাখতে চান তাহলে হাজেরা ও তার পুত্রকে অন্যস্থানে রেখে আসতে হবে। মহান আল্লাহ তাকে নির্দেশ করেন, 'সারা যা ইচ্ছা করে তাই করুন। হযরত হাজেরা

(আ.)ও শিশু ইসমাইলকে নির্জন মরুময় স্থানে নির্বাসিত করে আসুন। যেখানে ফল ফলাদি ও পানির কোন চিহ্ন নেই।'[৮৭]

অতঃপর কিছুদিন পর হযরত সারা (আ.) আল্লাহর অশেষ রহমতে সন্তান লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন।আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ امْرَاَتُهٗ قَآىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ١ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ۝۷۱ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا١ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ۝۷۲

"আর তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে উঠল। অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়া'কূবের। সে বলল, 'হায়, কী আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি বৃদ্ধা, আর এ আমার স্বামী, বৃদ্ধ? এটা তো অবশ্যই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার'!"[৮৮]

হযরত ইসমাঈল যখন দুগ্ধপায়ী শিশু, তখন আল্লাহ তাআলার মর্জি হল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মাধ্যমে মক্কা আবাদ করবেন। অথচ তখন মক্কা নগরী ছিল এক জনশূন্য প্রান্তর। হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল সহ বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল শহরে বাস করতেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে আদেশ করলেন, হযরত হাজেরাকে তাঁর দুধের শিশুসহ মক্কায় রেখে এসো। আমিই তাঁদেরকে রক্ষা করব। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তান ও স্ত্রীকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে রেখে এলেন। সম্বল হিসেবে রেখে এলেন এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে সেখানে রেখে শামদেশে চলে আসছিলেন, তখন হযরত হাজেরা (আ.) পিছে পিছে আসছিলেন আর বলছিলেন, আপনি এখানে আমাদেরকে একাকী রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) কোন জবাব দিচ্ছিলেন না। অবশেষে হযরত হাজেরা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার প্রভুর নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বাললেন, হ্যাঁ! তখন হযরত হাজেরা (আ.) বলে উঠলেন, তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ নিজেই আমাদের অবস্থা দেখবেন।

তারপর হযরত হাজেরা (আ.) আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্ষুধা পেলে খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিতেন আর হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে দুধ পান করাতেন। ধীরে ধীরে যখন মশকের পানি ফুরিয়ে গেল, তখন মা পুত্র উভয়ের পিপাসা বাড়তে লাগল। শিশু ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করতে লাগল। মা হাজেরা সন্তানের এই দশা বরদাশত করতে পারলেন না। কোন মা-ই সন্তানের এই করুণ দশা সহ্য করতে পারে না। সন্তানের এই করুণ দশা দেখে মা হাজেরা পানির সন্ধানে নেমে পড়লেন। দৌড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। সেখানে পানির সন্ধান না পেয়ে পার্শ্ববর্তী 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানের ভূমির মাঝে কিছুটা স্থান নিচু আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমতল ভূমিতে চলছিলেন, ততক্ষণ বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যখন ঐ নিচু স্থানে আসলেন, তখন আর বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাই দৌড়ে ঐ নিচু স্থান পার হয়েছিলেন। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আবার চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। সেখানে পানির সন্ধান না পেয়ে পার্শ্ববর্তী 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানে সমতল ভূমির মাঝে কিছুটা স্থান নিচু আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমতল ভূমিতে চলছিলেন, ততক্ষণ বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিলেন! যখন ঐ নিচু স্থানে আসলেন, তখন আর বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাই দৌড়ে ঐ নিচু স্থান পার হয়েছিলেন। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আবার চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেখানেও পানির কোন সন্ধান পেলেন না। আবার ছুটে গেলেন সাফা পাহাড়ে। মাঝখানের সেই নিচু স্থানটি প্রতিবারই দৌড়ে অতিক্রম করলেন। হযরত হাজেরা (আ.)-এর এই আমল আল্লাহ তাআলার কাছে খুব পছন্দ হল। সেমতে তিনি এই সাফা-মারওয়ার ছোটাছুটিকে হাজীদের নিয়মিত আমলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। এখনও সকল হাজীকে সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী

করার সময় মাঝখানের সেই নিচু স্থানটুকু দৌড়ে অগ্রসর হতে হয়। 'মা' হাজেরা ছুটতে ছুটতে অবশেষে যখন মারওয়া পাহাড়ে এসে দাঁড়ান, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পান। আওয়াজ শুনে তিনি থমকে দাঁড়ান। আবার সেই আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। হযরত হাজেরা আওয়াজ দিয়ে বললেন, আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি! কেউ সাহায্য করার থাকলে সাহায্য করুন। ঠিক তখনই যমযম কূপের স্থানটিতে একজন ফেরেশতাকে দেখা গেল। ফেরেশতা সেখানে তার ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। আর সেখান থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। হযরত হাজেরা (আ.) চারদিকে মাটির বাঁধ তৈরি করে পানি আঁটকাতে লাগলেন। পানি দিয়ে মশক ভরে নিলেন। শিশু ইসমাঈলকে পানি পান করালেন। নিজেও পান করলেন। ফেরেশতা বললেন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই ছেলে এবং তার পিতা মিলে এই ঘর নির্মাণ করবে। এখানেও জনবসতি গড়ে উঠবে।[৮৯]

হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত হাজেরা (আ.) ও শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে নির্জন স্থানে রেখে প্রস্থান করলেন। তৎকালীন সময়ে বায়তুল্লাহর জমিন টিলার ন্যায় উচু ছিল এবং সেখানে কোন বসতি ছিল না। হাজেরা (আ.) শিশুপুত্র ইসমাইলকে নিয়েই দিনযাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত "জুরহুম" গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে অবতরণ করে দেখতে পেল কতগুলো পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল নিশ্চয়ই এ পাখিগুলো পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা ময়দানে বহুদিন কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তারা একজন বা দুজন লোক মিলে (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল এবং সবাইকে পানির সংবাদ দিল। (সংবাদ পেয়ে) সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাইলের মাতা পানির কাছে বসে ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদের অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে সম্মতি জানাল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনি ও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। এরপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ও সংবাদ পাঠাল। তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে বসতি গড়ে উঠল। ইসমাঈল (আ.) তাদের কাছ থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল।[৯০]

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন। পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। তখন যমযমের পানি মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। কিছুদিন পর কূপের আকারে যমযম আত্মপ্রকাশ করে। হাজেরা ও ইসমাইল (আ.) সম্মন্ধে আল-কুরআনে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর কথা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡـِٕدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَ ارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ﴿۳۷﴾

'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিয্ক প্রদান করুন ফল–ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।'[৯১]

বিবি রহিমা (আ.)

হযরত ইসহাক (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হযরত ইয়াকুব (আ.)। হয়রত ইয়াকুব (আ.)-এর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.) এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল আফ্রাহাম। আফ্রাহাম এবং তার স্ত্রী উভয়েই সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু বিবাহের পর বহুদিন এ দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে এ দম্পতি যুগলের প্রতি আল্লাহর রহমত হল। চাঁদের মত

উজ্জ্বল অপরূপ সুন্দর ফুটফুটে এক কন্যা জন্ম লাভ করে। পিতার মত মাতাও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং তার অন্তরে মাতৃত্বের স্নেহ-মমতা ও ভালাবাসার স্রোত বইতে থাকে।

রহিমার পিতা আফ্রাহাম কেনান দেশের সর্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত আইউব (আ.) সঙ্গীগণ সহ ভ্রমণ করতে করতে একদিন হঠাৎ সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অচেনা পথে চলতে চলতে সহসা পথের পাশে বিরাট এক প্রসাদ ভবন এবং তার অনতি দূরে একটি পানির কূপ দেখতে পেলেন। হযরত আইউব (আ.) বলেন, আমি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়েছি। পথিকের এরূপ কথা শুনে রহিমা বাড়িতে এসে পিতাকে বলেন, এক পিপাসার্ত পথিক পানি পান করতে চান, বের হয়ে দেখুন। পথিকের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে আফ্রাহামের পরিষ্কার ধারণা জন্মেছিল যে, ইনিই সে শামাধিপতি আল্লাহর নবি হযরত আইউব (আ.)। তিনি বুঝতে পারেন তার স্বপ্ন সফল করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সিরিয়া থেকে হযরত আইউব (আ.)-কে এখানে পাঠিয়েছেন। রাতে সম্মানিত অতিথিকে বহুবিধ সুস্বাদু ও সুখাদ্য দ্বারা তৃপ্তির সাথে আহার পর্ব শেষ হলে আফ্রাহাম তার পাশে এসে ধীর শান্ত কণ্ঠে সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিতভাবে নানান কথারপর, তিনি হযরত আইউব (আ.)-এর কাছে স্বীয় কন্যা রহিমাকে সমর্পণের প্রস্তাব দেন। আফ্রাহাম বলেন, আপনি আল্লাহর নবি, এবং বিশাল রাজ্য শামের অধিপতি। দেখুন, আপনি যে শামের অধিপতি আল্লাহ নবি হযরত আইউব (আ.), আপনি এখানে আসবেন এবং আপনার সাথে যে আমার একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হবে এ কথা বহু পূর্বে আল্লাহ আমাদের স্বপ্নে খুলে বলেন। এরপর বলেন, আপনি বলুন আল্লাহর ইঙ্গিত প্রদত্ত এ প্রস্তাবে আপনি সন্তুষ্টি কি না?

আফ্রাহামে মুখে আল্লাহ প্রদত্ত স্বপ্নের কথা শুনে হযরত আইউব (আ.) আনন্দিত হয়ে বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এমন ইচ্ছা থাকলে এটা আমার সৌভাগ্যের কথা। আপনার এ প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি।

এরপর সে দিনই বিয়ে হয়। রহিমাকে বিবাহ করার সময় হযরত আইউব (আ.) বিবাহিত ছিলেন এবং এর পূর্বেই তিনি তিনজন স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা তিনজনই বর্তমান ছিলেন। তাঁর তিন স্ত্রীর গর্ভের সাতটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা সন্তান বর্তমান রয়েছেন।[৯২]

বিবি রহিমা স্বামীর এমন সেবা করেছেন, যা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। একবার হযরত আইয়ূব (আ.) খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সারা শরীর জখমে ছেয়ে যায়। তাঁর আপনজন সকলেই তাঁর কাছ থেকে সরে পড়ে। কাছে থাকেন কেবল তাঁর স্ত্রী রহিমা। তিনি তাঁর খেদমতে থাকেন। সব রকম কষ্ট বরদাশত করেন। স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। একবার হযরত আইয়ূব (আ.) কোন কারণে বিবি রহিমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে কসম করেন যে, আমি সুস্থ হলে তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব। তিনি যখন সুস্থ হন তখন তাঁর কসম পূরণ করার এরাদা করেন। এখন স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। বিষয়টি খুবই কঠিন, এমন সতীসাধ্বী ও স্বামীর খেদমত পরায়ণা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে বিষয়টি সহজ করে দিলেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ.)-কে বলে দিলেন, একশত শলাকা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু নিয়ে একবার আঘাত কর। তাহলে এটাকেই একশত আঘাত হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং এভাবে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি তা-ই করলেন। বিবি রহিমা সহজে একশত বেত্রাঘাত খাওয়া থেকে মুক্তি পেলেন।[৯৩]

এ সম্মন্ধে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ﴿۴۳﴾ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَ لَا تَحْنَثْ١ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا١ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ١ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ﴿۴۴﴾

"আর আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সাথে তাদের অনুরূপ অনেককে। আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর। আর কসম ভংগ করো না। নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী।"[৯৪]

সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। [৯৫]

হযরত মূসা (আ.)-এর মা ইউখান্দ

হযরত মূসা (আ.) ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈল বংশের নবি। তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই মিসরে ফেরআউনের রাজত্ব ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে গণকরা ফেরআউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈল বংশে এমন এক সন্তান জন্ম লাভ করবে, যে আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে। তখন ফেরআউন তার লোকজনকে আদেশ দিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করে ফেলবে। তখন সেই আদেশ মোতাবেক বনী ইসরাঈলের অসংখ্য পুত্র সন্তান হত্যা করা হয়। এরই এক ফাঁকে হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নাম ছিল ইউখান্দ। অন্য বর্ণনামতে ইয়ারুখা বা ইয়াযুখ্ত। জন্মের সময় হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের অন্তরে আল্লাহ তাআলা একথা ঢেলে দিলেন যে, চিন্তার কোনই কারণ নেই। তোমার শিশুকে তুমি নিশ্চিন্তে দুধপান করাতে থাকবে। আর যখন সন্দেহ হবে যে, কেউ জেনে গেছে, তখন শিশুটিকে একটি সিন্ধুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিবে। আমি তাকে আমার ইচ্ছামত হেফাযত করব এবং পুনরায় তোমার কাছে পৌঁছে দিব। হযরত মূসা (আ.)-এর মা আল্লাহ্‌র কথার উপর ভরসা করে সে মোতাবেক কাজ করে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূর্ণ করলেন। শিশু মূসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ তাআলার কুদরত এমন যে, সেই ফেরআউনের ঘরেই হযরত মূসা (আ.) লালিত-পালিত হলেন। এবং যে ফেরাআউন মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, সেই মূসা (আ.)-ই ফেরাউনের করুণভাবে মৃত্যুর কারণ হল।[৯৬]

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ١ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِىْ وَ لَا تَحْزَنِىْ١ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝٧

"আর আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব'।"[৯৭]

এ সম্পর্কে কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا١ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْ لَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝١٠

وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ١ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۝١١ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ۝١٢ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝١٣

"আর মূসার মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সে তো তার পরিচয় প্রকাশ করেই দিত, যদি আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে সে আস্থাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়।। আর সে মূসার বোনকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও'। সে দূর থেকে তাকে দেখছিল, কিন্তু তারা টের পায়নি। আর আমি তার জন্য পূর্ব থেকেই ধাত্রী (স্তন্য পান) নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর মূসার বোন এসে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যারা এ শিশুটিকে তোমাদের পক্ষে লালন পালন করবে এবং তারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী হবে'। অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার

চোখ জুড়ায় এবং সে যেন কোন দুশ্চিন্তা না করে। আর সে যেন জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[৯৮]

বিবি আসিয়া (আ.)

মিসরের বাদশাহ ছিল ফেরআউন। সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। হযরত আসিয়া ছিলেন এই ফেরআউনেরই স্ত্রী। আল্লাহর কী অপূর্ব লীলা, স্বামী এক শয়তান আর স্ত্রী হলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় ওলী, যার সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে প্রশংসা এসেছে এবং আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: পুরুষদের মধ্যে কামেল হয়েছে অনেকে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে হযরত মারইয়াম ও হযরত আসিয়া ব্যতীত আর কেউ কামেল হয়নি। তবে একথাটি পূর্ববর্তী উম্মতের আলোচনা প্রসঙ্গে নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অন্যথায় হাদিসে হযরত ফাতেমা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সমস্ত নারীর সরদার হবেন।

এই বিবি আসিয়া-ই হযরত মূসা (আ.)-কে শিশু অবস্থায় জালেম ফেরআউনের হাত থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। বিবি আসিয়ার ভাগ্যে ছিল, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনবেন, তাই মূসা (আ.)-এর শিশুকাল থেকেই তার প্রতি আসিয়ার গভীর ভালাবাসা জমে উঠেছিল।[৯৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ لَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۫ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

"অতঃপর ফির'আউন পরিবার তাকে উঠিয়ে নিল, পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃশ্চিন্তার কারণ হবে। নিশ্চয় ফির'আউন, হামান ও তাদের সৈন্যরা ছিল অপরাধী। আর ফির'আউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। আশা করা যায়, সে আমাদের কোন উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি'। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারেনি।"[১০০]

যখন হযরত মূসা (আ.) নবুওয়াত লাভ করেন, তখন ফেরআউন তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। কিন্তু তার স্ত্রী হযরত আসিয়া মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। যখন ফেরআউন একথা জানতে পারল যে, আসিয়া মূসার প্রতি ঈমান এনেছে, তখন তার সাথে খুব কঠিন আচরণ শুরু করে। বিভিন্নভাবে তাকে নির্যাতন করে, কিন্তুবিবি আসিয়া ঈমানের ওপর অটল অবিচল থাকেন এবং ঈমানের সাথেই দুনিয়া ত্যাগ করেন।[১০১]

ঈমানদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

"আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ ফির'আউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফির'আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন, আর আমাকে নাজাত দিন যালিম সম্প্রদায় হতে।"[১০২]

হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সাফূরা

হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল সাফূরা। সাফূরা ছিলেন হযরত শুআইব (আ.)-এর বড় কন্যা। তিনি কীভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হলেন, তার একটি প্রেক্ষাপট ছিল। হযরত মূসা (আ.) মিসরে বসবাস করতেন। মিসরে তখন ফেরআউনের রাজত্ব ছিল। একদিন ফেরআউনী গোত্রের এক লোক হযরত মূসা (আ.)-এর গোত্রের এক ব্যক্তির ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করল। মূসা (আ.)-এর গোত্রের

লোকটা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে সাহায্য চাইল। হযরত মূসা (আ.) তার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন এবং ফেরআউনী গোত্রের লোকটাকে শাসন-মূলক একটা থাপ্পড় দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই থাপ্পড়ে লোকটা মারা গেলে। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। হযরত মূসা (আ.) আত্মগোপন করে পালিয়ে মিসর থেকে বর্তমান সৌদী আরবের মাদইয়ান এলাকায় চলে গেলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন মাদইয়ানের উপকণ্ঠে পৌঁছেন, তখন দেখেন অনেকগুলো রাখাল কূপ থেকে পানি তুলে নিজ নিজ ছাগল-বকরিগুলোকে পান করাচ্ছে। তিনি দেখলেন সেখানে দুইজন মেয়ে পানি পান করানোর জন্য তাদের ছাগলগুলো কূপের দিকে নিয়ে এসেছে এবং তারা সকলের পেছনে অপেক্ষা করছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মেয়ে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা কেন ছাগল চরাতে এসেছ এবং দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা জানাল, আমাদের বাড়িতে কাজ করার মতো কোন পুরুষ মানুষ নেই। তাই ছাগল চরাতে আমাদেরকেই আসতে হয়। কিন্তু আমরা মেয়ে মানুষ, তাই দূরে অপেক্ষা করছি। পুরুষরা চলে যাওয়ার পর আমরা আমাদের ছাগলকে পান করাব। তাদের কথা শুনে হযরত মূসা (আ.)-এর খুব মায়া হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলে নিজ হাতে পানি তুলে তাদের ছাগলগুলোকে পান করিয়ে দিলেন। মেয়ে দুটি বাড়িতে গিয়ে তাদের শ্রদ্ধেয় পিতা, বিশিষ্ট নবি হযরত শুআইব (আ.)-এর কাছে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করল।

ঘটনা শুনে হযরত শুআইব (আ.) বড় মেয়েকে এই বলে পাঠালেন যে, যাও আবার সেখানে গিয়ে লোকটিকে ডেকে নিয়ে এসো! মেয়েটি এসে সলজ্জকণ্ঠে হযরত মূসা (আ.)-কে জানাল যে, আমার পিতা হযরত শুআইব (আ.) আপনাকে যাওয়ার জন্য বলেছেন। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন এবং হযরত শুআইব (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। হযরত শুআইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা শুনে তাঁকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমার ইচ্ছা আমার একটি মেয়ে তোমার কাছে বিবাহ দিব। তবে শর্ত হল ৮ বৎসর অথবা ১০ বৎসর আমার ছাগল চরাতে হবে। হযরত মূসা (আ.) শর্তে রাজি হয়ে গেলেন। এ সময় বড় মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। এই মেয়েরই নাম ছিল সাফূরা। বিবাহের পরও হযরত মূসা (আ.) কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। এরপর একদিন হযরত মূসা (আ.) পুনরায় মিসরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথে প্রচণ্ড শীত পড়ল। তূর পাহাড়ের কাছে এলে শীতের প্রচণ্ডতার কারণে আগুনের প্রয়োজন হল। আগুনের সন্ধানে তিনি এদিকে সেদিক দৃষ্টি ফেরাতে থাকলেন। তূর পাহাড়ে আগুন দেখা গেল। তিনি আগুন আনতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সেতো আগুন নয়, আল্লাহর নূর এবং সেখানেই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বললেন এবং তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন।[১০৩]

এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এভাবে বর্ণিত আছে,

وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ١ۖ وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ١ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا١ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ١ؕ وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ۝۲۳ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ۝۲۴ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ١ۖ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا١ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ١ۙ قَالَ لَا تَخَفْ١ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝۲۵ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ١ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ۝۲۶ قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ١ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ١ۚ وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ١ؕ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝۲۷

"আর যখন সে মাদইয়ানের পানির নিকট উপনীত হল, তখন সেখানে একদল লোককে পেল, যারা (পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের ছাড়া দুজন নারীকে পেল, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে। সে বলল, 'তোমাদের ব্যাপার কী'? তারা বলল, 'আমরা (আমাদের পশুগুলোর) পানি পান

করাতে পারি না। যতক্ষণ না রাখালরা তাদের (পশুগুলো) নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা অতিবৃদ্ধ'। তখন মূসা তাদের পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দিল। তারপর ছায়ায় ফিরে গেল এবং বলল, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহণ নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী'। অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বলল যে, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে'। অতঃপর যখন মূসা তার নিকট আসল এবং সকল ঘটনা তার কাছে খুলে বলল, তখন সে বলল, 'তুমি ভয় করো না। তুমি যালিম কওম থেকে রেহাই পেয়ে গেছ'। নারীদ্বয়ের একজন বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত'। সে বলল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরী করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে (অতিরিক্ত)। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে'।"[১০৪]

হযরত মারইয়ামের এর মা বিবি হান্নাহ

হযরত মারইয়াম হলেন আল্লাহর নবি হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা। মারইয়ামের মাতার নাম ছিল হান্নাহ্ হান্নাহর স্বামী অর্থাৎ, মারইয়ামের পিতার নাম ছিল ইমরান। হযরত মারইয়াম যখন গর্ভে তখন তার মা আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে মান্নত করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে সন্তান, তাকে মসজিদের খেদমতের জন্য মুক্ত করে দিব, অর্থাৎ তাকে দিয়ে দুনিয়ার কোন কাজ করাব না।

হান্নাহ্র মনে মনে আশা ছিল ছেলে হবে। কারণ, মসজিদের খেদমত পুরুষ মানুষরাই করতে পারে। সেই আমলে এই জাতীয় মান্নতের রেওয়াজও ছিল, এবং তা বৈধও ছিল। বর্তমানে এ ধরণের মান্নতের রেওয়াজ নেই এবং তা বৈধও নয়। কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, দেখা গেল ছেলে হয়নি, হয়েছে মেয়ে। তখন বিবি হান্নাহ আফসোস করে বললেন যে, হে আল্লাহ! এ তো মেয়ে হয়েছে। অর্থাৎ আমিতো তোমার কাছে ছেলের আশা করেছিলাম কিন্তু এ দেখছি মেয়ে হয়েছে! তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ হল, এই মেয়ে পুরুষের চেয়েও উত্তম হবে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে কবূল করেছেন।

যাহোক, শিশুর নাম রাখা হল মারইয়াম। ("মারইয়াম" শব্দের অর্থ ইবাদত-কারিণী।) হযরত মারইয়ামের মা হযরত মারইয়ামের জন্য এই দুআ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে এবং তার সন্তানদের শয়তান থেকে রক্ষা কর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোন সন্তান জন্মগ্রহণের সময় শয়তান তাকে খোঁচা মারে। কিন্তু হযরত মারইয়াম ও তার সন্তান হযরত ঈসা (আ.)-কে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। অর্থাৎ তাদের জীবনে শয়তান কোন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১০৫]

হযরত মারইয়ামের জন্ম প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ﴿٣٤﴾ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَ اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ اِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

"তারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ'। অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল, বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে'। আর আল্লাহই ভাল জানেন সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে। 'আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয় এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি

মারইয়াম। আর নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় দিচ্ছি'।"[১০৬]

হযরত ঈসা (আ.)-এর মা মারইয়াম

হযরত মারইয়াম ছিলেন আল্লাহর নবি হযরত ঈসা (আ.)-এর মা। হযরত মারইয়ামের জন্মের পর তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন এবং সেখানকার বুযুর্গদের খেদমতে গিয়ে আরয করলেন, আমি এই সন্তানকে মসজিদের খেদমতে প্রদান করার মান্নত করেছিলাম। এতএব আপনারা একে গ্রহণ করুন। যেহেতু হযরত মারইয়াম অনেক উঁচু এবং মর্যাদাপূর্ণ বংশের সন্তান ছিলেন, তাই কে এই শিশু সন্তানের দায়িত্বভার নিবে তার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম ছিলেন আল্লাহর এক নবি হযরত যাকারিয়া (আ.)। হযরত যাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে হযরত মারইয়ামের 'খালু' হতেন। খালু হওয়ার সুবাদে মারইয়ামের দায়িত্ব নেয়ার অধিকার ছিল তাঁরই বেশি, কিন্তু অন্য লোকজন সহজে তা মানছিল না। অবশেষে লটারি হল এবং লটারি মোতাবেক হযরত যাকারিয়া (আ.) শিশু মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব লাভ করলেন।[১০৭]

হযরত যাকারিয়া (আ.) নির্বিঘ্নে শিশু মরিয়মের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন,

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا١ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا١

"অতঃপর তার রব তাকে উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে গড়ে তুললেন। আর তাকে যাকারিয়্যার দায়িত্বে দিলেন।"[১০৮]

শিশু মারইয়ামকে লালন পালন করার সময় হযরত যাকারিয়া (আ.) লক্ষ্য করলেন, শিশু মারইয়াম অন্য বাচ্চাদের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন মারইয়াম শিশুকাল থেকেই বুযুর্গ স্বভাবের। হযরত যাকারিয়া (আ.) দেখতেন যে মৌসুমের যে ফল নয় সে মৌসুমে মারইয়ামের কাছে গায়েব থেকে সেই ফল আসত। এই দেখে একদিন হযরত যাকারিয়া (আ.) মারইয়ামকে প্রশ্ন করেছিলেন; মারইয়াম! এই ফল কোত্থেকে এসেছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। এ দ্বারা প্রমাণ হল তিনি ছিলেন আল্লাহ্র ওলী। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে হযরত মারইয়ামকে ওলী বলে উল্লেখ করেছেন। গায়েব থেকে এই ফল আসা ছিল আল্লাহ্র ওলী হিসেবে হযরত মারইয়ামের কারামত। হযরত মারইয়াম যখন যুবতী হলেন, তখন আল্লাহর কুদরতে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই তিনি গর্ভধারণ করেন। তাঁর গর্ভে জন্ম লাভ করেন আল্লাহ্র নবি হযরত ঈসা (আ.)। বিবাহ ছাড়া সন্তান হওয়ার ঘটনায় ইহুদীরা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলতে লাগল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে হযরত ঈসা (আ.) জন্মের পর থেকেই কথা বলতে থাকেন। অলৌকিকভাবে শিশু ঈসা (আ.) জন্মের পর থেকেই কথা বলতে থাকেন। অলৌকিকভাবে শিশু ঈসার কথা বলা দেখে বিবেকবান লোকেরা সাথে সাথেই বিশ্বাস করে নিল যে, মারইয়াম সতী-সাধ্বী নারী। পিতা ছাড়াই ঈসার জন্ম হয়েছে। ঈসার জন্ম আল্লাহ্র কুদরতের এক জ্বলন্ত নমুনা। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মারইয়ামের প্রশংসা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, নারীদের মধ্যে দুইজন মর্যাদার পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। তাঁদের একজন হযরত মারইয়াম, অন্যজন হযরত আসিয়া।[১০৯]

বিবি মরিয়ম (আ.)-এর কাহিনী অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে আল-কুরআনে। যদিও তার গর্ভধারণ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ তবুও তাঁর মনে যে ভীতি ও শঙ্কা ছিল, তাও প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও তিনি জানতেন যে, তিনি নিষ্পাপ, তথাপিও মানুষের ভুল বুঝাবুঝির ভয়ে তিনি ছিলেন শঙ্কিত। আল্লাহ তার শঙ্কা দূর করেছিল, তার শিশু সন্তানকে নবুওয়াত দানের সুসংবাদের মাধ্যমে।[১১০]

এ সম্পর্কিত আয়াতগুলি নিম্নরূপ:

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ۝۴۲

"আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর'।"[১১১]

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ﴿۴۵﴾

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'।"[১১২]

জন্মের পর ঈসা (আ.) মায়ের কোলে থেকে কথা বললে সেখানকার লোকগণ তখন বুঝেছে, মরিয়মের পুত্রটি সত্যি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। আর কোন প্রেরিত মহাপুরুষ অসতী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং মরিয়ম অসতী নয়। আল্লাহর অসীম কুদরতের বলেই এ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে মরিয়ম ও তার শিশু পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করে।

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

"(আল্লাহ আরো উদাহরণ পেশ করেন) ইমরান কন্যা মারয়াম-এর, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তার রবের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[১১৩]

وَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾

"আর স্মরণ কর সে নারীর কথা, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য করেছিলাম এক নিদর্শন।"[১১৪]

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলীকে ১৩ টি সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার পবিত্র জীবনের সূচনারূপে তার বুযুর্গী মাতা হযরত মরিয়ম-এর জীবনের ঘটনাগুলোকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তা করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন কোন স্থানে তার নাম ঈসা বলা হয়েছে এবং কোন কোন স্থানে মসিহ বলা হয়েছে ও আবদুল্লাহ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোন কোন স্থানে তার কুনিয়াত বা ডাক নাম ইবনে মরিয়ম প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরআনুল কারীমের নীচের সুরাগুলোতে তার নাম উল্লেখ রয়েছে। যথা, সূরা আল বাকারা-৮৭, ১৩৬, ১৩৮, ২৫৩; সূরা আল ইমরান-৪২, ৫৬; সূরা আন নিসা-৪৫৬, ১৮৯, ১৭১, ১৭২; সূরা আল মায়িদা-১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০, ১২০; সূরা আল আনআম-৮৫; সূরা তাওবা-২০, ৩১; সূরা মারইয়াম-১৬-৩৫; সূরা আল মুমিনুন-৫০; সূরা আল আহযাব-৭-৮; সূরা আশশুরা, সূরা আয্যুখরুখ-৫৭, ৬৩; সূরা আল হাদিদ-২৭; সূরা আসসাফ-৬-১৪।[১১৫]

রাণী বিলকীস

রাণী বিলকীস ছিলেন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে সাবা রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। সমস্ত প্রাণীর উপর হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব ছিল। হযরত সুলাইমান (আ.) পাখির কথাও বুঝতেন। একদিন হুদহুদ নামক এক পাখি এসে হযরত সুলাইমান (আ.)-কে সংবাদ দিল যে, আমি সাবা রাজ্যে এক নারী সম্রাজ্ঞীকে দেখে এসেছি। সে সূর্যের পূজা করে। হযরত সুলাইমান (আ.) একটা চিঠি লিখে হুদহুদকে দিলেন যে, রাণী বিলকীসের দরবারে চিঠিটি ফেলে দিয়ে আসবে। হুদহুদ যথাসময়ে চিঠি পৌঁছে দিল।

হযরত সুলাইমান (আ.) সেই চিঠিতে লিখেছিলেন, "তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে আমার দরবারে হাজির হও।" চিঠি পেয়ে বিলকীস পরামর্শের জন্য তার আমীর ও মন্ত্রীবর্গকে ডাকলেন। অনেক কথাবার্তার পর অবশেষে রাণী বিলকীস নিজেই এই সিদ্ধান্ত দিল যে, আমি তাঁর খেদমতে কিছু উপহার সামগ্রী পাঠাব। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন, তাহলে বুঝব তিনি দুনিয়াদার বাদশাহ। আর যদি গ্রহণ না

করেন, তাহলে বুঝব তিনি আল্লাহর নবি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করা হল। উপহার সামগ্রী হযরত সুলাইমান (আ.)-এর হাতে আসার পর তিনি এই বলে তা ফেরত পাঠালেন যে, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের সম্পদের চেয়ে অনেক উত্তম। তোমরা তোমাদের হাদিয়া ফেরত নাও। আর জেনে রাখ ঈমান না আনলে শিগগিরই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছি। একথা শুনে রাণী বিলকীসের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, হযরত সুলাইমান (আ.) নিশ্চিতই আল্লাহর নবি। এরপর রাণী বিলকীস ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিজ দেশ ছেড়ে রওনা হলেন। রাণী বিলকীসের একটা মূল্যবান সিংহাসন ছিল। রাণী বিলকীস তার দেশ থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত সুলাইমান (আ.) নিজ মুজিযা বলে রাণী বিলকীসের সেই সিংহাসনটি তুলে এনে নিজের দরবারে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য, রানী বিলকীস এসে তার সিংহাসন এখানে দেখে নবির মুজিযা বুঝতে পারবে। সাথে সাথে তিনি সিংহাসনের কিছু মণি-মুক্তা একদিক থেকে তুলে অন্যদিকে স্থাপনপূর্বক তাতে সামান্য পরিবর্তনও সাধন করালেন। রাণী বিলকীস পৌঁছার পর তার বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য বলা হল, দেখ তো! এটা তোমার সিংহাসন কি-না? উত্তরে রাণী বললেন, হ্যাঁ তেমনই তো মনে হয়! তবে কিছু আকৃতি পরিবর্তন করা হয়েছে। তার উত্তরে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে যে বাদশাহী ও রাজত্ব দান করেছেন তা রাণী বিলকীসের রাজত্ব ও বাদশাহীর চেয়ে অনেক বড়, রাণীকে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে আদেশ করলেন, একটি পানির হাউজ তৈরি করে তার উপর স্বচ্ছ কাঁচের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাই করা হল। তারপর হযরত সুলাইমান (আ.) এমন স্থানে গিয়ে বসলেন যে, সেই কাঁচের উপর দিয়ে ছাড়া তাঁর কাছে পৌঁছার আর কোন উপায় নেই। আর কাঁচটি ছিল এতই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম যে, তা কারও দৃষ্টিতেও পড়ত না। রাণী বিলকীসকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কাছে যাওয়ার জন্য বলা হল। রাণী যাওয়ার সময় কাঁচ দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন আমাকে পানির উপর দিয়েই যেতে হবে। এই ভেবে যে-ই তিনি কাপড় উঠাতে যাবেন, অমনি তাকে বলে দেয়া হল যে, পানির উপর কাঁচ রয়েছে, কাপড় তুলতে হবে না, আপনি সোজা চলে আসুন। রাণী বিলকীস হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে নিজের সিংহাসন দেখে বুঝলেন এটা নবির মুজিযা। তারপর এত সূক্ষ্ম শিল্প করিগরী দেখে বুঝলেন সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বের সাথে তাঁর রাজত্বের কোন তুলনা হয় না। এমন মহা রাজত্ব আল্লাহ্‌র বিশেষ দান ছাড়া হতে পারে না। এসব কিছু মিলিয়ে তিনি বুঝলেন যে হযরত সুলায়মান (আ.) নিশ্চিতই আল্লাহর নবি। তিনি তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। কোন কোন আলেম বলেছেন, তারপর হযরত সুলাইমান (আ.) তাকে বিবাহ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন: ইয়ামানের এক বাদশাহের সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দেন।[১১৬]

এ ঘটনাগুলো সম্পর্কে আল-কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿۳۲﴾

"সে (রাণী) বলল, 'হে পারিষদবর্গ, তোমরা আমার ব্যাপারে আমাকে অভিমত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।"[১১৭]

وَ اِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

"আর নিশ্চয় আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখি দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে।"[১১৮]

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾

"সুলাইমান বলল, 'হে পারিষদবর্গ, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (রাণীর) সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে'?"[১১৯]

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۴۱﴾

"সুলাইমান বলল, 'তোমরা তার জন্য তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দাও। দেখব সে সঠিক দিশা পায় নাকি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, যারা সঠিক দিশা পায় না'।"[১২০]

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿۴۲﴾

"অতঃপর যখন সে আসল, তখন তাকে বলা হল; 'এরূপই কি তোমার সিংহাসন'? সে বলল, 'এটি যেন সেটিই'। আর বলল, 'আমাদেরকে তার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং আমরা আত্মসমর্পণ করেছিলাম'।"[১২১]

হযরত লূত (আ.)-এর কন্যাগণ: হযরত লূত (আ.) ফিলিস্তীনের সাদূম এলাকার অধিবাসীদের নিকট নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর কথা মানেনি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাছে ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতারা এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, আপনাকে যারা মানে না, তাদের প্রতি অচিরেই আল্লাহ্র আযাব নেমে আসবে। আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাঁকে একথাও জানালেন, আপনি আপনার অনুসারী মুসলামানদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাতের মধ্যেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। সে মোতাবেক তিনি রাতের মধ্যেই মুসলমানদেরকে নিয়ে এলাকা থেকে বের হয়ে গেলেন। তাঁদের বের হয়ে যাওয়ার পর সেখানে আযাব অবতীর্ণ হয়। তাঁর সঙ্গে যেসব মুসলমান এলাকা থেকে বের হয়ে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তাঁর কন্যাগণও ছিলেন। তাঁরাও আযাব থেকে রক্ষা পান, কারণ তাঁরাও ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী মুসলমান হয়নি, ফলে সে ঐ এলাকায় কাফেরদের সাথে থেকে যায় এবং আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা লূত সম্প্রদায়ের বস্তীকে সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে গোটা বস্তীকে ধ্বংস করে দেন। তাদের বস্তী মাটির নিচে চলে যায় এবং সে বস্তীটা একটা সাগরে পরিণত হয়। আজও সেই সাগর আছে, তাকে "মৃতসাগর" বলা হয়। কারণ, সেখানে আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়েছিল, ফলে সেই পানিতে কোন প্রাণী বাঁচে না, তাই তাকে মৃতসাগর বলা হয়।[১২২]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:

وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ١ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ١ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ١ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ۝۷۸ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ١ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ۝۷۹

"আর তার কওম তার কাছে ছুটে আসল এবং ইতোপূবে তারা মন্দ কাজ করত। সে বলল, 'হে আমার কওম, এরা আমার মেয়ে, তারা তোমাদের জন্য পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবোধ ব্যক্তি নেই'? তারা বলল, 'তুমি অবশ্যই জান, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কী চাই, তা তুমি নিশ্চয় জান'।"[১২৩]

قَالَ هٰۤؤُلَآءِ بَنٰتِيْۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ۝۷۱

"সে বলল, 'ওরা আমার মেয়ে ('আমার মেয়ে' দ্বারা উদ্দেশ্য কওমের মেয়েরা। কারণ, যে কোন কওমের নবি তাদের পিতাতুল্য), যদি তোমরা করতেই চাও (তবে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে কর)।"[১২৪]

অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন,

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ١ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ١ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ١ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ۝۸۱

"পারবে না। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে রাতের কোন এক অংশে রওয়ানা হও, আর তোমাদের কেউ পিছে তাকাবে না। তবে তোমার স্ত্রী (রওয়ানা হবে না), কেননা তাকে তা-ই আক্রান্ত করবে যা তাদেরকে আক্রান্ত করবে। নিশ্চয় তাদের (আযাবের) নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। সকাল কি নিকটে নয়?"[১২৫]

নবি করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ

হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)

হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) হলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রথম স্ত্রী। হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে যখন রাসূল (স.)-এর বিয়ে হয় তখন রাসূল (স.)-এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজা জীবিত থাকা কালে রাসূল (স.) অন্য কোন বিবাহ করেন নি। রাসূল (স.)-এর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন হযরত খাদিজা (রা.) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১২৬]

ইতোপূবেহযরত খাদীজা (রা.)-এর আরো দুইবার বিবাহ হয়েছিল।[১২৭]

হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে রাসূল (স.)-এর দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় শৈশবেই পরলোকগমন করেন। কন্যাদের নাম হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.), হযরত যয়নব (রা.), হযরত রুকাইয়া (রা.) ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)।[১২৮]

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদীজা (রা.)-এর জীবদ্দশায় রাসূল (স.) অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করেননি।[১২৯]

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "মরিয়ম ছিলেন পূর্ববর্তী নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উম্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[১৩০]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরাইল (আ.) রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসতেন তাতে তরকারি কিংবা খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাকে তার রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে মনিমুক্তা খচিত একটা প্রসাদের সুসংবাদ দিন যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন কষ্ট-ক্লান্তি থাকবে।" [১৩১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূল (স.)-এর তৃতীয় এবং বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি রাসূল (স.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের প্রায় ৮ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং মাতা উম্মে রুম্মান।[১৩২]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিবাহ

হযরত আয়েশা (রা.) আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) তাকে বলেন, বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দুবার অথবা তিনবার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে তুমি একখন্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত। আমাকে বলা হল, ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।[১৩৩]

তিনি আরো বলেন, আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবি (স.) আমাকে বিয়ে করেন। আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে খাজরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই মাত্র রয়ে গেল। অতঃপর আমার চুল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছল তখন একদিন আমার সঙ্গিনীদের নিয়ে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুম্মান আমাকে ডাকলেন। আমি তার কাছে আসলাম কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর তিনি আমার হাত ধরে একটা ঘরের দরজায় এনে দাড় করালেন। আমি তখন হাপাচ্ছিলাম, অতঃপর আমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তারা বললেন,

আগমন কল্যাণময় এবং বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যৎ শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর রাসূল (স.)-এর আগমন আমাকে চকিত করে তুলল। যখন তারা (আনসার মহিলারা) আমাকে তুলে দিলেন তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।"[১৩৪]

হযরত আয়েশা (রা.) অগাধ জ্ঞানী ছিলেন। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ, ফতওয়া ইত্যাদি ইসলামি শিক্ষার সকল বিভাগেই তার অগাধ জ্ঞান ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক সংশোধিত বিষয়সমূহ সংগ্রহ করে আল্লামা সুয়ূতী একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।[১৩৫]

শরীয়াত সংক্রান্ত কোন সূক্ষ ও জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে তদানীন্তন বড় বড় আলেমগণ মীমাংসার জন্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে সমাধানের যথোপযুক্ত জ্ঞান তাঁর নিকট পেতেন। [১৩৬]

হাদিস গ্রন্থ সমূহে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক ২২১০ টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে শরঈ বিধিবিধানের এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যারা শরঈ বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। যদি একা হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক এক চতুর্থাংশ বর্ণিত হয়ে থাকে তবে এর দ্বারা তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাচুর্য উপলব্ধি করা যায়।[১৩৭]

তন্মধ্যে ১৭৪ টি হাদিস ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে, ৫৪ টি ইমাম বুখারী এককভাবে এবং ৬৯ টি হাদিস ইমাম মুসলিম এককভাবে নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[১৩৮]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেরানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটা একটা ছিনতাই ঘটনা। এর দ্বারা শয়তান বান্দার নামায থেকে কিছু ছিনতাই করে নেয়।[১৩৯]

বড় বড় সাহাবি ও তাবেয়ীগণ পর্যন্ত তাঁর কাছে হাদিস ও মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। আর তিনি শরিয়তের পর্দা পূর্ণভাবে রক্ষা করে আড়ালে থেকে খুব ক্ষীণ আওয়াজে সকলের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এত আগ্রহ ছিল যে, জানার জন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেই থাকতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে যুবায়ের (রা.) দুই বস্তা ভরে প্রায় এক লাখ আশি হাজার দেরহাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কাছে পাঠান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সব দেরহাম দান করে দেন। এভাবে বিভিন্ন সময় প্রচুর অর্থ হাতে আসা সত্ত্বেও তিনি তা সব দান করে দিতেন আর নিজের জামায় তালি লাগিয়ে পরিধান করতেন। অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। নিজের সাজ-সজ্জার প্রতিও কোন খাহেশ ছিল না।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনেক মর্যাদার কথা হাদীছে বর্ণিত আছে। একবার এক সাহাবি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন আয়েশাকে। সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে আপনার প্রিয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; তাঁর পিতা। অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। এছাড়াও হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে আরও অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বুকে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৫৮ হিজরীর রমযান মাসে সোমবার রাতে হযরত আয়েশা (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক রাতের বেলায় তাঁকে দাফন করা হয়।[১৪০]

হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত কিছু আয়াত নিচে দেওয়া হলো:

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

"নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাআযাব।"[১৪১]

لَوْ لَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝

"যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ'?"[১৪২]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

"যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।"[১৪৩]

*এটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান করেন। রাতের শেষ ভাগে আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু দূরে যান। কিন্তু পথে তিনি তাঁর গলার হারটি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর হার খুঁজতে থাকেন। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হাওদার ভিতরেই আছেন মনে করে কেউ তাঁর খোঁজ করেনি কারণ তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা। হার খুঁজে পেয়ে তিনি এসে দেখেন যে, কাফেলা চলে গেছে। তখন তিনি ছুটাছুটি না করে সেখানেই বসে পড়েন। এ আশায় যে কাফেলার রেখে যাওয়া মালামালের সন্ধানে নিয়োজিত কোন লোক আসবেন। অবশেষে এ কাজে নিয়োজিত সাফওয়ান (রা.) সকাল বেলায় আয়েশা (রা.)-কে দেখতে পেলেন এবং নিজের উটে তাঁকে আরোহণ করিয়ে নিজে পায়ে হেটে উটের রশি টেনে সসম্মানে তাঁকে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা.)-এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো নাযিল করে আয়েশা (রা.)-কে নির্দোষ ঘোষণা করেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে দেন। এই ঘটনাটি 'ইফ্ক' এর ঘটনা হিসেবে প্রসিদ্ধ।[১৪৪]

হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা.)

হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা.) প্রিয় নবীজির জীবনসঙ্গিনী। তাঁর পিতা জাহ্শ ইবনে রবাব। মা হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা, নাম উমায়মা। অর্থাৎ হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন ফুফাতো বোন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর সাথে যায়নাব বিনতে জাহ্শের প্রথম বিবাহ হয়েছিল। ইসলামের প্রথম দিকে পালক পুত্র বানানো বৈধ ছিল। পরে এই হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে যায়নাবের সম্পর্ক অবনতি দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ (রা.) তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। তখন নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভাবনায় পড়েন। কেননা যায়নাবের ভাই এবং বোন প্রথমে এই বিবাহে রাজী ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ভাই-বোন রাজী হয়েছিল। তিনি চিন্তা করলেন তাদের মনে সন্ত্বনা দেবার কী উপায় হতে পারে! অবশেষে মনে করলেন, আমি যদি যায়নাবকে বিবাহ করি তাহলে হয়তো তাঁদের মনে আর কষ্ট থাকবে না।

সাথে সাথে এই চিন্তাও করলেন যে, যায়নাবকে বিবাহ করতে গেলেই কাফেররা এই নিয়ে অনেক কথা বলবে যে, দেখ! মুহাম্মদ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছে। যদিও শরিয়তে পালকপুত্র আপন পুত্রের মত নয়। তাই পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুখ কে ঠেকাবে! নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেবেচিন্তে যায়নাবের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। পয়গাম শুনে হযরত যায়নাব (রা.) বললেন, আমি আমার বিবেক থেকে কিছুই বলব না। আল্লাহ যা খুশি তাই করবেন এবং তার ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। একথা বলে হযরত যায়নাব (রা.) উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের পর দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠালেন যে, 'আমি যায়নাবের সাথে তোমার বিবাহ করে দিয়েছি।' আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রা.)-এর কাছে গিয়ে আয়াত শুনিয়ে দিলেন। এই নিয়ে হযরত যায়নাব (রা.) সকলের সাথে গর্ব করে বলতেন: দেখ, তোমাদের সকলের বিবাহ দিয়েছেন তোমাদের পিতা-মাতা। আর আমার বিবাহ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।

হযরত যায়নাব (রা.) খুব দানশীল ছিলেন। ভালো হাতের কাজ জানতেন। চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মালামাল প্রস্তুত করে বিক্রি করতেন। তার আয় থেকে ফকির-মিসকীনদের মধ্যে দান-খয়রাত করতেন।

একবার সকল স্ত্রী মিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন, আপনার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম আপনার সাথে গিয়ে মিলিত হবেন কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাত বেশি লম্বা সে। আরবিতে দানশীলকে দীর্ঘহস্ত বা লম্বা হাতওয়ালা বলা হয়। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চাইলেন, যে বেশি দানশীলা সেই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তারপর বাস্তাবেও দেখা গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সকলের পূর্বে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) ইন্তিকাল করলেন।[১৪৫]

হযরত যয়নবের (রা.) বিয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যা আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে তা এরূপ:

১। পালিত ও ধর্মপুত্রকে যে ঔরসজাত পুত্রের সমান জ্ঞান করা হত, সে ভ্রান্তি দূর হয়।

২। দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার যে পর্বত পরিমাণ ব্যবধান ছিল তা দূর করে ইসলামি সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত এ বিয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস যায়েদকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অভিজাত খান্দার বনু হামিমের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৩। এ বিয়েকে কেন্দ্র করে হিযাবের আদেশ নাযিল হয়, অথবা বলা চলে এ বিয়ে ছিল হিযাবের আদেশ নাযিলের পটভূমি।

৪। এ বিয়ের জন্য ওহী নাযিল হয়।

৫। এ বিয়ের ওলীমা হয় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে।

এসবের কারণেই হযরত যয়নব (রা.) তার অন্য সতীনদের সামনে উল্লাস করতেন। একদিন তো তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলেই বসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর মত নই। তাদের মধ্যে এমন কেউ নইে যার বিয়ে তার পিতা, ভাই অথবা খান্দারেন কোন অভিভাবক দেন নি। একমাত্র আমি-যার বিয়ে আল্লাহ আসমান থেকে আপনার সাথে সম্পন্ন করেছেন। আপনার ও আমার দাদা একই ব্যক্তি আর আমার ব্যাপারে জিবরাঈল (আ.) হলেন দূত।[১৪৬]

নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ

হযরত যায়নাব (রা.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার কন্যা ছিল। যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা। এই চার কন্যাই হযরত খাদীজা (রা.)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বড়। আর হযরত ফাতেমা (রা.) ছিলেন সবচেয়ে ছোট। নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রা.)-কে খুব ভালবাসতেন।

যায়নাব (রা.)-এর প্রথম বিবাহ হয় তার খালাতো ভাই হযরত আবুল আস ইবনুর রাবী' (রা.)-এর সাথে। বিবাহের সময় আবুল আস মুসলমান ছিলেন না। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমান -অমুসলমানেও বিবাহ জায়েয ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায় এবং মুসলমান অমুসলমানে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হযরত যায়নাব (রা.) যখন মুসলমান হন আবুল আস তখন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এক পর্যায়ে হযরত যায়নাব (রা.) স্বামীকে ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। ৭ম হিজরীতে হযরত আবুল আসও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রা.)-কে পুনরায় হযরত আবুল আস (রা.)-এর নিকট স্ত্রী হিসেবে সোপর্দ করেন। ৮ম হিজরীতে হযরত যায়নাব (রা.) ইন্তেকাল করেন।

হযরত রুকাইয়া (রা.)

হযরত রুকাইয়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের কন্যা। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেজ মেয়ে। তার প্রথম বিবাহ হয় আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে। তবে বাসর হয়নি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবাহ হয়নি তবে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবি হওয়ার পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উতবা তার পিতা আবু লাহাবের চাপে হযরত রুকাইয়াকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে হযরত রুকাইয়ার বিবাহ দেন। মুসলমানদের চরম দুর্দিনের সময় হযরত রুকাইয়া (রা.) স্বামী উছমান গনী (রা.)-এর সাথে হাবশায় হিজরত করেন এবং হাবশায় সহায়-সম্বলহীনভাবে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেন।

যখন 'বদর' যুদ্ধ শুরু হয় তখন হযরত রুকাইয়া (রা.) অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখা শোনা করার জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে মদীনায় রেখে যান এবং বলে যান, তুমিও জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব পাবে। যেদিন বদরে মুসলমানদের বিজয় হয় সেদিনই হযরত রুকাইয়া (রা.) ইন্তেকাল করেন।

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ও নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের কন্যা। তিনি ছিলেন নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা। তাঁর বিবাহও প্রথমে কাফের আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে হয়েছিল। বিবাহের পর স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বেই নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভ করেন। তিনি নবি হওয়ায় আবু লাহাব ও তার স্ত্রী রাসূলের শত্রুতে পরিণত হয়। তখন উতাইবা তার পিতা আবু লাহাবের পরামর্শে হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে তালাক দিয়ে দেয়। তিনি মদীনায় হিজরত করে পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করতে থাকেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছিল। হযরত রুকাইয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসাকে বিবাহ করার জন্য উসমান (রা.) এর কাছে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মতি প্রকাশ করলেন না। এতে হযরত ওমর (রা.) কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ শুনতে পেয়ে বলেন, আল্লাহ পাক হাফসার জন্য উসমানের চেয়ে ভাল স্বামীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন আর উসমানের জন্য হাফসার চেয়ে ভাল স্ত্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। তারপর নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসাকে বিবাহ করেন আর নিজের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। এই বিবাহের ঘটনা ঘটে ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উসমান গনী (রা.)-এর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে মাত্র ছয় বৎসর জীবন যাপন করার পর ৯ম হিজরীর

শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। এভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একের পর এক দুই কন্যার বিবাহ দেন। এ জন্যেই হযরত উসমান (রা.)-কে "যিননূরাইন" অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী বলা হয়ে থাকে।

হযরত ফাতেমা (রা.)

হযরত ফাতেমা (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ছোট কন্যা, সর্বাধিক আদরের মেয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তাঁকে স্বীয় প্রাণের টুকরা বলেছেন। সকল নারীর সরদার বলেছেন। আরও বলেছেন: যে কারণে ফাতেমার কষ্ট হয়, সে কারণে আমিও কষ্ট পাই। রেওয়ায়েতে আছে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) উভয়েই হযরত ফাতেমাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁদের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ফাতেমার বয়স কম, আপনাদের সাথে মিল হবে না। অন্য এক বর্ণনামতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষা করতে বলেন। এরপর হযরত আলী (রা.) প্রস্তাব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ফাতেমার বিবাহ দেন এবং বলেন, ফাতেমাকে আলীর সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের সময় একমাত্র ফাতেমাকে কাছে ডেকে গোপনে বলেছিলেন ফাতেমা, আমার বিদায়ের সময় নিকটবর্তী। ফাতেমা কাঁদতে শুরু করেন। তারপর নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরও কাছে ডেকে কানে কানে বলেছিলেন, কেঁদোনা মা। আমার ইন্তিকালের পর তুমিই সকলের পূর্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তুমি হবে সকল বেহেশতী নারীর প্রধান। একথা শুনে তিনি হেসে ফেলেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হযরত ফাতেমা (রা.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানে কানে তোমাকে কী বলেছেন? কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ৬ মাস পর সকলের আগে হযরত ফাতেমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর যখন বিবাহ হয়, তখন খেজুর আঁশের একটি তোষক, একটি পানির কলস, মাটির দুটি মটকা এবং একটি চাদর ছিল ফাতেমার বিবাহ সামগ্রী। হযরত আলী (রা.) একবার তাঁর এক শাগরেদকে বললেন, আমি কি আমার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমার বর্ণনা তোমাকে শোনাব না? শাগরেদ বললেন নিশ্চয় শোনাবেন। তখন তিনি বললেন, ফাতেমা ছিলেন পরিবারের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আদরের। ফাতেমা নিজ হাতে চাক্কি পিষতেন, ফলে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে মশক ভরে পানি উঠাতেন, ফলে কাপড় চোপড় প্রায়ই ময়লা থাকত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অনেকগুলি গোলাম-বাদী আসে। আমি ফাতেমাকে বললাম, তোমার আব্বাজানের খেদমতে গিয়ে যদি একজন খাদেম চেয়ে আনতে, তাহলে কাজ-কর্মে অনেক সাহায্য হত। ফাতেমা গিয়ে দেখে যে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লোকজনের অনেক ভিড়। ফলে সে ফিরে আসল। পরের দিন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ এনে জিজ্ঞাসা করেন, মা ফাতেমা! গতকাল তুমি কি জন্য গিয়েছিলে? সে লজ্জায় কিছুই বলল না। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাক্কি চালাতে চালাতে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছে। মশক উঠানোর দরুণ তার বুকে দাগ পড়ে গেছে। ঘরে ঝাড়ু দেয়ায় দরুন প্রায়ই তার কাপড়-চোপড় ময়লা থাকে। গতকাল আপনার খেদমতে কিছু গোলাম-বাঁদী আসায় আমি তাকে বলেছিলাম, একটা খাদেম চেয়ে আনলে কাজ কর্মে সাহায্য হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর ফরয আদায় করতে থাক। তুমি ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতে থাক এবং যখন শয়ন

করবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও। এ আমল খাদেম থেকেও উত্তম। ফাতেমা বলল: আমি আল্লাহু ও আল্লাহর রাসূলের ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট আছি। অন্য হাদিসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে নিজেদের কষ্টের কথা প্রকাশ করে খাদেম চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে খাদেম থেকে উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। তা হল, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ আর ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে এবং একবার পড়বে। (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন ক্বাদীর)।[১৪৭]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝৫৯

আল্লাহ পাক রাসূল (সা.) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের (জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে)কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৪৮]

অতএব, আমরা বলতে পারি যে, নারী আল্লাহ প্রদত্ত এমনই এক নিয়ামত যার সঠিক তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার সাথে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করলে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র মানব সমাজই উপকৃত হবে। যার কারণে আল-কুরআনে নারীদের করণীয় ও বর্জনীয় দিক সম্পর্কে আল্লাহ গোটা মানব জাতিকে অবহিত করেছেন। এমনকি নারী জাতির সম্মানার্থে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেছেন ও কয়েকজন পূণ্যবতী নারীদের কথাও তিনি আল-কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন। এগুলো হতে পারে নারী জাতির জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা স্বরুপ।

তথ্যসূত্র

১। আল-কুরআন, ১৬: ৫৮-৫৯
২। আল-কুরআন, ৮১: ৯
৩। মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০১, পৃ. ২২৫
৪। আব্দুল হালিম আবু সুক্কা, *রাসূল (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা*, ঢাকা: ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১৭১
৫। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল (মৃ. ২৪১ হি.); *মুসনাদ*, বৈরূত: মুয়াসসাতুর রিসালাহ; প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ খ্রি. হাদিস নং ১৯৫৭, পৃ. ৮৮
৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৭। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২১
৮। আল-কুরআন, ২৪:৩১
৯। আল-কুরআন, ৩৩:৩৩
১০। আল-কুরআন, ৩৩:৫৯
১১। ইউ.এ.বি রাজিয়া আক্তার বানু, সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশের মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খ. ১২, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৬
১২। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৩৫
১৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩
১৪। হান্নান, শাহ আব্দুল, *নারীর সমস্যা ও ইসলাম*, ঢাকা, ক্রীসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ৪৩৫ বড় মগ বাজার, পৃ. ৯
১৫। আল-কুরআন, ৯: ৭১
১৬। মুহামদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব, আত্ তিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*: কিতাবুল ইল্ম, আল মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, পৃ. ৪৩৬
১৭। মুহামদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬
১৮। আল-কুরআন, ৩:১০৪
১৯। আল-কুরআন, ৩:১১০
২০। আল-কুরআন, ৩৩:৫৩
২১। আল-কুরআন: ২:২২৯
২২। আল-কুরআন, ৬০: ১২
২৩। আল-কুরআন, ২৪: ১১-১২
২৪। আল-কুরআন, ২৪: ২৩-২৫
২৫। আল-কুরআন, ২৪:২৩
২৬। আল-কুরআন, ৯: ৬৭
২৭। আল-কুরআন, ২:২২৮
২৮। ইবন মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল-কাযবীনী (মৃ. ২৮৩ হি.); *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুর রিসালাতুল আলামিয়্যাহ; তাহকীক: শুআয়ীব আল-আরনাঊত, ১ম সংস্করণ ২০০৯ খ্রি. হাদিস নং ৩১২
২৯। ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬২
৩০। আল-কুরআন, ৪:৩২
৩১। আল-কুরআন, ৪:১২
৩২। আল-কুরআন, ৪:১১
৩৩। আল-কুরআন, ২:২৪১
৩৪। আল-কুরআন, ২:২৩২

৩৫। মুহাম্মদ বিন সাদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*: দারুল ইয়াহিয়াত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, লেবানন: ১৯৯৬, খ. ৮, পৃ. ৩৮১-৩৮২, দ্রষ্টব্য, মাঃ সাইয়িদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৩৫৬
৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪
৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯১
৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩
৩৯। আল-কুরআন, ৯:৭১
৪০। ইসলামি ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মার্চ, ২০১২ খ্রি. পৃ. ৯৫
৪১। আনিস আহমেদ, *Muslim women and Higher Education (Institute of policy studies)* ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৯৮৪ খ্রি. পৃ. ৪৯
৪২। আল-কুরআন, ৪:৩২
৪৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫
৪৪। ইসলামি ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মার্চ, ২০১২ খ্রি. পৃ. ৮০
৪৫। ইবনে হাজার আসকালানী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৬
৪৬। ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল-কুশাইরী আন নিসাপুরী (মৃ. ২৬১ হি.); *আস-সহীহ*, বৈরূতঃ দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি. খ. ৩, পৃ. ১৪৪৭
৪৭। আল-কুরআন, ৪:২৫
৪৮। আল-কুরআন, ১৭:৩২
৪৯। আল-কুরআন, ১৭:৩২
৫০। আল-কুরআন, ২৪:৩
৫১। আল-কুরআন, ২৪:৩০
৫২। আল-কুরআন, ৭:২৭
৫৩। আল-কুরআন, ৩৩:৩৫
৫৪। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ১২০
৫৫। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪
৫৬। আল-কুরআন, ৪:৭
৫৭। *আল-কুরআন*, ৪:৭
৫৮। আল-কুরআন, ৪:১১
৫৯। আল-কুরআন, ৪:১২
৬০। আল-কুরআন, ৪:১৭৬
৬১। আল-কুরআন, ৪:১৭৬
৬২। আল-কুরআন, ২: ২৩৩
৬৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১ এর বরাত দিয়ে মাওলানা আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৬৪। আল-কুরআন, ২৪: ২-৩
৬৫। আল-কুরআন, ৫:৩৮
৬৬। আল-কুরআন, ২৪: ৪-৫
৬৭। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২১
৬৮। আল-কুরআন, ৪: ৭৫
৬৯। আল-কুরআন, ৩: ১১০
৭০। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৯
৭১। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২০, বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১১৫

৭২। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০
৭৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১
৭৪। মুসলিম প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০১
৭৫। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৯
৭৬। মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে নারী পুরুষের সম অধিকার*, একটি সমীক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ২০৭
৭৭। তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ অধ্যায় এর বরাতে জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২; মাওলানা আব্দুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৭৮। আল-কুরআন, ৪: ৯৭-১০০
৭৯। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৮০। আল-কুরআন, ২০: ১১৭
৮১। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৮২। আল-কুরআন, ২০: ১২০-১২২
৮৩। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৮৪। আল-কুরআন, ৭:২৩
৮৫। Abdel Rahim Umrance op-cit, P-63.
৮৬। Abdel Rahim Umrance op-cit, P-62.
৮৭। শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সংকলিত, মুহাম্মদ শামসুজ্জামান সম্পাদিত, *জান্নাতী পঁচিশ রমণী তাঁদের আদর্শ নারী জীবন*, ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১৫২-১৬২
৮৮। আল-কুরআন, ১১:৭১-৭২
৮৯। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮
৯০। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২১২
৯১। আল-কুরআন, ১৪:৩৭
৯২। শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৮
৯৩। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৯৪। আল-কুরআন, ৩৮: ৪৩-৪৪
৯৫। আল-কুরআন, ২১: ৮৩-৮৪
৯৬। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬
৯৭। আল-কুরআন, ২৮: ৭
৯৮। আল-কুরআন, ২৮: ১০-১৩
৯৯। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১০০। আল-কুরআন, ২৮: ৮-৯
১০১। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১০২। আল-কুরআন, ৬৬: ১১
১০৩। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১
১০৬। আল-কুরআন, ৩: ৩৪, ৩৫, ৩৬
১০৭। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১০৮। আল-কুরআন, ৩: ৩৭
১০৯। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১১০। Abdel Rahim Umrance op-cit, P-64.
১১১। আল-কুরআন, ৩: ৪২
১১২। আল-কুরআন, ৩: ৪৫

১১৩। আল-কুরআন, ৬৬: ১২
১১৪। আল-কুরআন, ২১: ৯১
১১৫। মাওলানা হিফযুর রহমান, হযরত ঈসা (আ.), *কাসাসুল কুরআন*, মিনা বুক হাউজ, পৃ.-৫২৭, ঢাকা।
১১৬। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫
১১৭। আল-কুরআন, ২৭:৩২
১১৮। আল-কুরআন, ২৭:৩৫
১১৯। আল-কুরআন, ২৭:৩৮
১২০। আল-কুরআন, ২৭:৪১
১২১। আল-কুরআন, ২৭:৪২
১২২। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯
১২৩। আল-কুরআন, ১১: ৭৮, ৮৯
১২৪। আল-কুরআন, ১৫: ৭১
১২৫। আল-কুরআন, ৩: ৮১
১২৬। ইবন কায়্যিম আল জাওযিয়া, *যাদুল মাআদ*, মিসর: মাতবা আ মুসতফাল বাবিল হলবী, ১৯০৫ হি. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬
১২৭। আবু হালা ইবন হারার সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। আবু হারার ঔরসে হিন্দ নামক এক পুত্র ও যয়নব নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আবু হালার মৃত্যুর পর উতায়্যিক ইবন আবিদ এর সাথে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। উতায়্যিকের ঔরসে হিন্দু নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উতায়্যিকের মৃত্যুর পর রাসূল (স.)-এর সাথে তার তৃতীয় বিবাহ হয়। (শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি. / ১৪১৯ হি. ঢাকা ইসলামিক রিচার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৯৬১
১২৮। শিবলী নুমানী, *সীরতুন্নবী*, আযমগড়: মাতবা মা'আরিফ, ১৯৬৯ হি. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪-১৮৫
১২৯। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৩৪
১৩০। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৮৮
১৩১। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৯০
১৩২। আহমাদ ইবনে আলী, ইবনে হাজার আল আসকালানী (র.), *ফাতহুল বারী*, খ. ৮, বৈরুত: দারুল মারেফা, লেবানন, তা.বি. পৃ. ১০৬, ১০৭
১৩৩। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৮৫
১৩৪। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৩০
১৩৫। শিবলী নুমানী, *সীরাতুন্নবী*, প্রাগুক্ত, ১৩৬৯ হি. খ.২, পৃ. ৪০৭
১৩৬। মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী, *আসাহুসসিয়ার*, ঢাকা: কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রি. পৃ. ৫৭১
১৩৭। শিবলী নুমানী, *সীরাতুন্নবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭
১৩৮। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২, পৃ. ১৩৯
১৩৯। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৪, 'আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০
১৪০। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১৪১। আল-কুরআন, ২৪:১১
১৪২। আল-কুরআন, ২৪:১২
১৪৩। আল-কুরআন, ২৪:১৩
১৪৪। আল-কুরআনুল কারীম, সরল অর্থানুবাদ, প্রকাশক: প্রকাশনী বিভাগ, আল বায়ান ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১২৩০, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট-২০০৮ খ্রি. পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
১৪৬। খাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০-৪৫১
১৪৭। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫৫
১৪৮। আল-কুরআন, ২৮:৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী প্রসঙ্গ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বা ধর্মে কখনো নারীকে সম্মানের চোখে দেখা হয় নি। বরং তাদেরকে ভোগ সামগ্রী হিসেবেই দেখা হয়েছে অথবা তদেরকে মনে করা হয়েছে পাপের উৎস হিসেবে। ইসলাম পূর্ব বর্বর যুগে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন সম্মান ছিল না, সমাজে দাস দাসীদের মতই স্ত্রীদের মূল্যায়ন করা হত। সমাজে পিশাচ প্রকৃতির ক্ষমতাধর পাষণ্ড সরদার মোড়লরা আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী নিজ নিজ আস্তানায় একাধিক স্ত্রী, উপ স্ত্রী বন্দী দশায় আবদ্ধ করে রাখত। উপরন্তু স্বামীদের বিকৃত লালসা পূরণ করতে হত স্ত্রীদের। সামান্য অপরাধে অমানবিক জুলম নির্যাতন চালানো হতো। একান্ত অসহায় ও আশ্রয়হীনা ধর্ষিতা কিশোরীর মত চাপা কান্না ও নিভৃতে অশ্রু ঝরানো ছাড়া অভাগিনী স্ত্রীদের জন্য কোন উপায় ছিল না। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শান্তির আধার, সান্ত্বনার উৎস, প্রেম ও ভালবাসার অর্ধাঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে মর্যাদার অধিকারিণী করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ গ্রীক সভ্যতার নারী

প্রাচীন গ্রীস সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকে তাই প্রথম সভ্য নারী হিসেবে বিবেচনা করা চলে। গ্রীসের নারীরা ছিল অত্যন্ত সতীসাধ্বী এবং তারা ঘরের বাইরে বের হতো না বলা যায়। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল, ফলে সাধারণ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারত না। শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচলন ছিল এবং খুব কম সংখ্যক নারী পর্দা করত। আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায়। বাজারে তার বেচা-কেনা চলত। যে সব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে তার কোন স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। সারা জীবন তারা পুরুষের দাস-দাসীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। পুরুষেরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারত না। বৈবাহিক বিষয়েও নারীর নিজের কোন স্বাধীনতা ছিল না।[১]

অবশ্য স্পষ্টভাষী নারীদের প্রতি কিছুটা নমনীয়তা দেখানো হতো এবং তারা কিছু কিছু নাগরিক অধিকার পেতো। তবে এটা নারীর পক্ষ থেকে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নিদর্শন ছিল না। নারীরা এথেন্সের নারীর চেয়ে বেশি রাস্তায় বেরোতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। এ্যারিস্টটল অবশ্য এ বিষয়ে স্পার্টার সমালোচনা করেছেন। দেখা গেল গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করলো তখন নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লো এবং পুরুষের সাথে অবাধে সভা-সমিতিতে মেলামেশা ও যোগদান করতে লাগল। সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মুর্তি স্থান পেল ও প্রদর্শন করা শুরু হলো। এরপর ধর্মও নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশাকে এক সময় স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। অবৈধ ও যৌন সম্পর্ক এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে তা এক অশুভ বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। হারমোডিস ও আরাসতোজেনের মূর্তী তার স্বাক্ষর বহন করে।

সমাজে নারীরা এতটাই ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হতো। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হতো। সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকারও নারীকে দেওয়া হতো না। বরং এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো। যেমন- কোন নারী যখন তালাক চাইবার জন্য আদালতে যেত, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওঁত পেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়া মাত্র পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

অবশ্য স্পার্টাবাসী কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে নারীকে কিছু কিছু নাগরিক অধিকার দিয়েছিল। তাকে উত্তরাধিকার, তালাক ও আর্থিক লেনদেনের এখতিয়ার দিয়েছিল। তবে এটা তাদের পক্ষ থেকে নারীর

যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নিদর্শন ছিল না। এর কারণ ছিল স্পার্টার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু পুরুষরা সর্বক্ষণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো, তাই তারা তাদের অনুপস্থিতিকালে গৃহস্থালির কাজকর্ম নারীদের ওপর ন্যস্ত রাখতো। এ কারণে স্পার্টার মহিলারা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগরীর মহিলাদের চেয়ে বেশি রাস্তায় বেরুতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতো। তথাপি এরিস্টটল নারীকে এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পার্টাবাসীর নিন্দা করতেন এবং এই অধিকার প্রদানকেই স্পার্টার পতনের জন্য দায়ী করতেন।

অতঃপর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করলো, তখন নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভাসমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো। ফলে নিলর্জ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যভিচার আর দূষণীয় মনে হতো না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠলো সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগলো। এরপর তাদের ধর্মও নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো। তাদের দেবী 'আফ্রোদাইতি' এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারণ মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ঔরস থেকে সে 'কিওপিড' নামক যে সন্তান প্রসব করে, তা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষেও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর নিদর্শন স্বরুপ "হারমোডিস ও আরাসতোজেন" নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।[২]

গ্রীক সভ্যতায় নারী কেমন মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি বলেন,

Woman is the greatest source of chaose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.

নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের মত, যা দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি এটি খেয়ে ফেললে এটির মৃত্যু নিশ্চিত।

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এণ্ডারসকি (Anderosky) বলেন,

Cure is possible for fire burns and Snake-bite; but it is impossible to arrest woman's charms.

আগুনে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ রোমান সভ্যতায় নারী

প্রাচীন রোমান সমাজে এরুপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রাখতে পিতা বাধ্য থাকতো না। এটি বিশেষ ব্যবস্থায় পিতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। পিতা ইচ্ছা করলে সন্তানকে বিক্রি করতে পারতো। যাকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হতো তার উপর পরিবার প্রধানের সার্বিক কর্তৃত্ব থাকতো। কন্যা সন্তান হলে এমনকি পূত্রবধূ, নাত বধূ ও স্ত্রী এদের প্রতি কর্তৃত্বটা থাকতো জোড়ালো এবং আজীবন। এই কর্তৃত্ব এমন যে বিক্রি এবং হত্যা পর্যন্ত। ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনানের সময় এই বর্বর আইন সংশোধন করা হয়। অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যা শিশু বা নারীর আদৌ কোন অধিকার ছিল না। নারী বা কন্যা কোন অর্থ উপার্জন করলে তা পরিবার প্রধানের সম্পত্তি হিসেবে পরিণত হতো। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে নির্দিষ্ট হয় মায়ের সম্পত্তি মেয়ের হবে, পিতার নয়।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলে চালু হয় যে, মেয়ে বা নারী যে সম্পদ নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জন করবে অথবা পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করবে সে সম্পত্তি ঐ মেয়ের বা নারীরই হবে। পরিবার প্রধানের মৃত্যু হলে পুত্র সন্তান স্বাধীন হলেও কন্যারা স্বাধীন হতে পারত না। তখন তার নতুন অভিভাবক হতো। কন্যা নিজেকে নিজের কোন পছন্দনীয় অভিভাবকের নিকট বিক্রি করে দিতে পারতো। এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতো। তার নাম সার্বভৌমত্ব চুক্তি। এভাবে পিতার নিকট থেকে কন্যার কর্তৃত্ব স্বামীর নিকট হস্তান্তরিত হতো। মোট কথা পরবর্তীকালে রোমান সমাজের জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধিত হলে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব খানিকটা শিথিল হয় এবং তা প্রভূত্ব থেকে একধাপ নেমে তত্ত্বাবধায়ক সূলভ কর্তৃত্বের রুপ ধারণ করে। নাগরিক অধিকারের পথে তিনটি বিষয় রোমান আইনে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত ছিল। তা হলো-১। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ২। বুদ্ধির অপরিপক্কতা, এবং ৩। নারী হওয়া।

প্রাচীন রোমান আইনবিদগণের দৃষ্টিতে নারীরা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। তাই তাদের নাগরিক অধিকার প্রদান করা হতো না। আইনগত যোগ্যতার অভাবের কারণে তিন শ্রেণির শ্রেণি নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে চিহ্নিত ছিল। এরা হচ্ছে,

১। দাস-দাসী, ২। বিদেশী ৩। পরিবার প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীন স্ত্রী ও কন্যা।

আর বাস্তব যোগ্যতার অভাবের কারণে যে চার শ্রেণির নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হতো তারা হচ্ছে,

১। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা বালক বালিকা,

২। বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণগ্রস্ত,

৩। ঋণগ্রস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও স্ত্রী এবং

৪। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্ত ও অভিভাবকের আশ্রীতা স্বাধীনতা প্রাপ্ত বয়স্ক নারীগণ।

অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে নারীদের জন্য অভিভাবক থাকার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় উপরোক্ত চতুর্থ অবস্থাটা আর টিকে থাকেনি। তথাপি এসব প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীন নারীগণ ঋণগ্রস্ত থাকলে পুরোপুরিভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হতো না।

সুতরাং দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম অভ্যুদয়ের পূর্বে সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রে নারীগণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারতো না। যতটুকু অধিকার পেতো তা পুরুষ কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ এখানেও জেন্ডার বৈষম্য কথাটি লক্ষ্য করা যায়।[৪]

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হতো। পিতা যখন তাকে ধরে ওপরে তুলতো, তখন প্রমাণিত হতো যে, সে তাকে আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, অন্যথায় ধরে নেয়া হতো যে, পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপসনালয়ের বেদীতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো, না হলে শিশুটি ক্ষুধায়, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুঁকে ধুঁকে মরতো।

পরিবার প্রধান ইচ্ছা করলে যে কোন বহিরাগতকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতো এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে যাকে চাইতো, দাস-দাসীর মত বিক্রি করে পরিবার থেকে বের করে দিতে পারতো। অতঃপর এক সময় বিক্রির অধিকার তিনবার পর্যন্ত সীমিত করে দেয়া হয় নয়া আইন জারীর মাধ্যমে। পিতা কর্তৃক নিজ পুত্রকে বিক্রি করা দুইবারের বেশি হলে ঐ পুত্রের ওপর আর পিতার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা থাকতো না। তবে সন্তান যদি মেয়ে হতো, তাহলে তার উপর পিতার কর্তৃত্ব পিতার মৃত্যু পর্যন্তই বহাল থাকতো। এই কর্তৃত্ব বলতে বুঝাতো বিক্রি করার অধিকার, বহিষ্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করার অধিকারও। অন্য কথায় বলা যায়, পরিবারের ওপর পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব ছিল মালিকানামূলক, সংরক্ষণমূলক নয়। পরিবার প্রধানের এই কর্তৃত্ব ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনানের সময় খর্ব করা হয় এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু মারপিট করার চেয়ে বেশি কোন অধিকার তাকে দেয়া হয়নি।

পরিবারের প্রধান পরিবারের সকল সহায় সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হতো। পরিবারের কোন সদস্য কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারতো না। পরিবারের সদস্যরা নিছক পরিবার প্রধানের সম্পত্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হতো। পরিবার প্রধানই এককভাবে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিত এবং এ ব্যাপারে তাদের মতামতের তোয়াক্কা করতো না।

সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসাবে পাবে, তা তার পিতার সম্পত্তি হবেনা, বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে, তখন পিতা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে।

আর যদি যুবতী কন্যা বিয়ে করে, তবে তাকে তার স্বামীর সাথে "সার্বভৌমত্ব চুক্তি" নামে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে হতো। অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রীর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিতে হতো। এই চুক্তি সম্পাদিত হতো তিনটি উপায়ে:

১. পুরোহিতের পরিচালনাধীন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

২. প্রতীকী ক্রয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে যথারীতি মূল্য দিয়ে কিনে নিত।

৩. বিয়ের পর পুরো এক বছর স্বামীর সাথে বসবাসের মাধ্যমে।

এভাবে পরিবার প্রধান নিজের কন্যার ওপর থেকে পিতৃত্বের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতো এবং এ কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হতো স্বামীর নিকট।[৫]

রোমানগণ স্ত্রীকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু বলে গণ্য করত। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হত। বিবাহিতা স্ত্রী ও তার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলে যেত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সব রকম অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে এর বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি, স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারত।

রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতই থাকতে হত। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারত না। সে কোন আমানত রাখতে পারত না এবং কোন কিছুর জামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হতে পারত না। পুরুষের ঘর সাজাবার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের উপর তার আইনানুগ অধিকার জন্মাত।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ খৃষ্টধর্মে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান

খৃষ্টধর্মে নারীর প্রতি অবস্থান বিষয়টি এক কথায় বলা হলে অত্যন্ত চমকপ্রদ। প্রথম যুগের খৃষ্টধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজের অশ্লীলতার ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ঐ সবের জন্য নারীকে দায়ী করা শুরু করেন। খৃষ্ট ধর্মে নারীর চেয়ে পুরুষের বিস্তর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে কন্যা সন্তান নয় পুত্র সন্তান লাভে মাতৃত্বের দুঃখ বিদুরিত হয়। খৃষ্টান ধর্মে মনে করা হয় মানবজাতির সৃষ্টি পর্বে বাইবেলে পুরুষ অর্থাৎ আদমের বাঁকা হাড় থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে খৃষ্ট ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর কারণ হলো এ দুটি ধর্মই ঐশী বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টান ধর্মের যাজকগণ নারীকে শয়তানের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে আসছিল খৃস্টীয় প্রথম যুগে। তারা মনে করতো নারীর জন্যই পুরুষকে চিরসুখের স্থান স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে।

পাশ্চাত্য জগত খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত তাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও স্থির করা হয় যে তাদের কাজ হবে পুরুষের সেবা করা। মধ্যযুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের এই ধারা অব্যাহত থাকে যা নারীকে মানবাধিকারের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছিল। স্বামী তথা পুরুষের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী তথা নারী নিজের সম্পদ ব্যবহার পর্যন্ত করতে পারত না। ব্রিটিশ আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত স্বামীর স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার ক্ষমতা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লবের পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়, তখনও নারীর মর্যাদা বহাল হয়নি। তা শুধু খৃষ্ট ধর্মের যাজকদের জন্য। কারণ যাজকরাই তখন রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পুরাধার ছিলো, যারা নারীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হীনতর করে রেখেছিল। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে পুরুষকে দেখানো হয়েছে দেবতা বা প্রভুরূপে আর নারীর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অধঃস্তনরূপে। এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মেও অবশ্য তাগিদ আছে, তবে তা ইহুদি, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে ইসলামের নির্দেশের মধ্যে নারীর মর্যাদাহানী ঘটে সরাসরি এমন কোন কথা বলা হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এ খুব বেশি দিনের কথা নয় যে, শিক্ষা, গবেষণা বা সামাজিক সংস্কারের আলোচনায় মানুষ ধর্ম সম্মন্ধে সমালোচনা করার অধিকার রাখতে শুরু করেছে। মধ্যযুগে রাষ্ট্র যখন খৃষ্ট ধর্ম নির্ভর ছিল তখন রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নারীর অবস্থান খুব একটা সংশ্লিষ্টপূর্ণ ছিল না। তবে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম চেতনার ভিত্তিতে নারীকে সামাজিক অলংকার হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। রাজার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল ষোল আনা অধিকার আর রাণীর ছিল রাজার ক্ষমতায় অধিকার। এ ধরণের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ভারতীয় উপমহাদেশেও পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে নারীর অবস্থান খুব একটা সুখকর নয়। সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাজনৈতিকভাবেও নারীকে কল্পনা করা হয় অমঙ্গলের প্রতীকরূপে।[৭]

প্রথম যুগের খৃস্ট ধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতংকিত হয়ে পড়েন এবং এ সব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতো। তাই খৃস্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশি সম্মানার্হ, তারা ঘোষণা করে দিলেন যে, নারী হলো শয়তানের প্রবেশ দ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা নারীর সৌন্দর্য হলো বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র।

তারতোলিয়ান নামক জনৈক যাজক বললেন, "নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধান ভংগকারী এবং আল্লাহর চেহারা (অর্থাৎ পুরুষকে বিস্মৃতকারী)।"

মোস্তাম নামক আরেক যাজক বলেন, "নারী এক অনিবার্য আপদ। এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"

পঞ্চম শতাব্দীতে "মাকোন" একাডেমি এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, না কি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মা মরিয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়।

পাশ্চাত্য জগত খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপরোক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা ও তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। এমনকি যে যুগে নারীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো, পুরুষ যোদ্ধারা তাদের সাথে প্রণয় বিহার করে বেড়াতে লাগলো এবং তাদের মার্যাদা খানিকটা উন্নীত হলো বলে মনে হতে লাগলো, সে যুগটিও সামাজিক ও আইনগত মার্যদার দিক দিয়ে নারীর জন্য সুখকর প্রমাণিত হয়নি। কেননা এ যুগেও তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় থাকতে হয় এবং নিজের অর্থসম্পদেও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হাত দিতে পারতো না।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৮০৫ সাল পর্যন্তও বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনস। ঘটনাক্রমে ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে পাঁচশো পাউন্ডে বেঁচে দেয়। তার উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বললো যে, বৃটিশ আইন একশো বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আর ১৮০১ সালের বৃটিশ আইনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিক্রি করা হলে সে জন্য ছয় পেনস মূল্য নির্ধারিত ছিল। আদালত জবাবে বলেন যে, এ আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

ঐ সময়ে ইটালীতে স্ত্রী বিক্রির আরেকটি ঘটনা ঘটে। জনৈক ইটালীয় নিজের স্ত্রীকে কিস্তিতে বিক্রি করে। শেষের দিকের কয়েক কিস্তি বাকী থাকতে ক্রেতা দাম পরিশোধ করা বন্ধ করলে বিক্রেতা তাকে হত্যা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতর জীবন যাপন থেকে মুক্তি দানের কথা ঘোষণা করা হলো, তখনও নারীর মর্যাদা পুনর্বহাল হলো না। ফরাসী নাগরিক আইনে নারী অবিবাহিত হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হলো। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী শিশু ও পাগল-এই তিন শ্রেণির মানুষ অধিকারহীন ও দায়দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীর স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু এরপরও বিবাহিতা নারীর কিছু কিছু তৎপরতার ওপর কড়াকড়ি বহাল থাকে।[৮]

খ্রীস্টধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর নিষ্ঠুর নিদারুণ ও নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। পোপ শাসিত 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে; দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেচঁড়ানো হয়েছে, মজবুত স্তম্ভে বেঁধে রেখে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে। এতেও নারীজাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, Woman has no soul-নারীর কোন আত্মা নাই।

ড. এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

১৫০০ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। এটি নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালাবার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খ্রীস্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খ্রীস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।

খ্রীস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রীস্টধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বলেন,

It is well for a man not to touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if a girl marries she does not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from Inxieties. The unmarried man is Inxious about the affairs of the Lord, how to please the Lord; but the married man is Inxious about wordly affairs, how to please his wife. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.

কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল, সে যেমন আছে তেমন থাকাই তার জন্য উত্তম। বিয়ে করতে চেও না। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিয়ে করলে সেও পাপ করে না। তবে যারা বিয়ে করে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক, এটাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন, কিভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন; কিভাবে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছি, তোমার উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নয়; বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি একথা বলছি।

খ্রীস্টান ধর্মমতে নারী পাপের উৎস, এই ধারণাই তার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীর জীবনের পরম অবদান হল পরিবারের প্রতি দরদ ও সতর্ক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্ত অধীন হয়ে থাকা ও নিজকে স্বামী হতে হীন বলে মেনে নেওয়া ছিল তার পরম সাফল্য।

Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a trangrssor.

পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করবে। পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তার উপর কর্তৃত্ব করবার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেইনি; সে নির্বাক থাকবে। কারণ, সর্বপ্রথমে আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন, তারপর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হন নি; বরং হাওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলেন।

নির্জনে থেকে নারী সূতা কাটবে, বস্ত্র বুনবে ও রং করবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে তাদেরকে বের হতে হলে তারা অবশ্যই পর্দা করবে।

Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made form woman but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a woman ought to have a veil.

নারী পর্দা পরিধান করবে। যেহেতু পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব। এইজন্য তার মস্তক আবৃত করা উচিত নয়। কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব। কারণ পুরুষ নারী হতে সৃষ্ট হয় নি; বরং নারী পুরুষ হতে সৃষ্ট হয়েছে। এজন্যই নারীকে পর্দা করতে হবে।[৯]

খৃস্টানরা আরও মনে করে মা হযরত হাওয়া (আ.)-এর ভুলের কারণে নারী রক্তে পাপ স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে। মানব শরীরে মাতৃরক্তের অংশ থাকে বলে সন্তান পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই পাপ ও পাপ সৃষ্টি বহুদিন থেকে চলে আসছিলো, তাই পৃথিবীতে এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির আগমনের প্রয়োজন ছিলো যিনি নিজ রক্ত দানে মানব আঁচলের পাপ দাগ ধুয়ে মুছে দিতে পারেন। হযরত ঈসা (আ.) ই ঐ মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি শূল বরণ করে আত্মকুরবানী দ্বারা মানুষের এই পাপ কলংক মিটিয়েছিলেন। মা হাওয়া (আ.) কৃত পাপের কলংক ঘুচাবার এ ছাড়া আর কোন পথ ছিলো না। (নাউযুবিল্লাহ)

Dhaka University Institutional Repository

খৃস্টানরা দুটি কারণে নারী জাতির প্রতি ক্রোধান্বিত। দুটি কারণেই তারা নারীদের কোন রকম শ্রদ্ধা, দয়া ও ভালবাসার অধিকারিণী বলে স্বীকার করে না। প্রথম কারণ উপরে বর্ণিত হয়েছে, নারী নিজের নিষিদ্ধ ফল খেলো আবার পুরুষকেও খাওয়ালো, তারই কারণে পুরুষকেও বেহেশত হতে বঞ্চিত হতে হলো। দ্বিতীয় কারণ, নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো একজন শুদ্ধ মানুষের শূল বরণ করতে হলো। তাদের ভাষায় পাপ ও ঈসা হত্যা উভয়েরই মূল কারণ নারী, কাজেই সেই দোষী। এই মনগড়া কথা ও ধারণার কারণেই আবহমানকাল থেকে নারীকে হীন জীব বলে মনে করে আসছে তারা। এ কারণেই নারীদেরকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করাতো দূরের কথা, যুলুম অত্যাচার আরো বাড়ানো হয়েছে। তাদের বানানো ইঞ্জিল পাঠ করলে জানা যায়, হযরত ঈসা (আ.) নাকি নিজের পূত-পবিত্রা মা মরিয়মকেও ধিককার দিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ঈসায়ী জগতের এক প্রধান ধর্ম যাজক 'ইউহান্না' বলেন, "নারী ছলনার কন্যা, তা থেকে দূরে থাকো।"

খৃস্ট জগতে সেন্ট বার্নার্ড, সেন্ট সিপ্লিল, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জিরাম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মনীষীদের এক বিশেষ স্থান আছে। তাঁদের বাণী ঈসায়ীরা বিশেষভাবে পালন করে থাকে।

এই মনীষীরা নারী চরিত্রের যে লজ্জাকর ছবি এঁকেছেন, তা নিতান্তই দুঃখজনক। তারা একই মর্মে লিখেছেন, নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মতো রক্তপিপাসু তার মধ্যে সাপের বিষ নিহিত আছে, সমস্ত নৈতিক ত্রুটির মূল উৎস, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশনোন্মুখ বিচ্ছু এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মনের ওপর শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহায্যকারিণী।" উক্ত ধর্ম যাজকরা অন্যত্র লিখেছেন "তোদের আশা-আকাঙ্খা ও ইচ্ছা প্রবৃত্তি সব সময়ই পুরুষদের অধীনে থাকবে এবং পুরুষরাই তোদের ওপর প্রভুত্ব করবে। মাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তুমি কে? আমার কাছে তোমার প্রয়োজন কি? সেন্ট সামুয়েল যখন একথা বলে গৃহত্যাগ করলেন তখন তার বাবা ছেলের বিরহ সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। অবশ্য তার মা তখনও জীবিত ছিলেন। দীর্ঘ সাতাশ বছর পর যখন মা ছেলের খোঁজ পেলেন তখন বনে প্রবেশ করে সেন্ট সামুয়েলকে ডাকলেন, কিন্তু সেন্ট কোন উত্তর করলেন না। মা যখন খোশামদ ও বিরহ কান্নায় ফেটে পড়লেন, তখন সেন্ট বলে পাঠালেন, তুমি ওখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। বেচারী বৃদ্ধা মা ছেলের কথায় ছেলেকে দেখার আশায় সেখানে অপেক্ষা করতে করতে তিনদিন পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, কিন্তু ছেলের সাক্ষাৎ পেলেন না।

সিভলিয়া নামে আর একজন খৃস্টান সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বনজঙ্গলেই বৃদ্ধ হন। ভক্তরা তাকে শহরে থাকার অনুরোধ করলে তিনি এমন শহরের কথা বললেন, যেখানে কোন সময় ঘটনাক্রমেও নারীর সাক্ষাৎ হবে না, এমন শহর পাওয়া যায়নি বলে তিনিও আর জঙ্গল থেকে শহরে আসলেন না। জনৈক খৃস্টান সন্ন্যাসী নিজের হাত ও সর্ব শরীর কাপড় দিয়ে জড়াতে শুরু করলেন, মা জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা ও কি করছো? সন্ন্যাসী উত্তরে বললেন, মা আপনাকে কাঁধে করে পার করতে হবে। হঠাৎ যদি আপনার শরীরের কোন জায়গা স্পর্শ হয়ে যায় তা হলে এতো দিনের ইবাদত বন্দেগী সব বরাবাদ হয়ে যাবে! খৃস্ট ধর্মে এ ধরণের ঘটনা একটা দুটো নয়, বহু ঘটনা আছে। মা নারী বলে তাঁর সংগে যদি খৃস্টান ধর্ম যাজকের এই ব্যবহার হয় তাহলে স্ত্রীর সাথে কি ব্যবহার হবে এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শত শত বছর ধরে নারী জাতিসত্ত্বার কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। পশুপক্ষী পর্যন্ত তাদের আপন নীড়ে আরামে ঘুমোতে পারতো, অথচ বেচারী নারীর কপালে কোন রকম সুখ ছিলো না। স্ত্রীর কোন রকম ভুল-ত্রুটি হলে পর ঈসায়ী বিচারে এর কোন ক্ষমা নেই। তওবা ইস্তেগফার তাকে পাক করতে পারে না। প্রসূতি আইন অত্যন্ত কঠিন। সন্তান প্রসবের পর এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নারীকে অস্পৃশ্য অপবিত্র বলে ধরা হতো। কন্যা সন্তান প্রসব করলে এই নির্দিষ্ট সময়টি দ্বিগুণে পরিণত হতো।

গ্রেট পোলো খৃস্টানদের একজন পুণ্যবান নেতা বলে খ্যাত হন। তিনি বলেছেন, "পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্টি হয়নি, বরং নারীই পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" হিন্দু ধর্মের মতো ঈসায়ী ধর্মেও তালাক প্রথা অনুমোদিত নয়। একবার বিয়ে হলে শত অসুবিধা থাকলেও এই বন্ধন ছাড়ানো যাবে না। না পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে, না স্ত্রী স্বামী থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে।

ঈসায়ী ধর্মে তালাকের ব্যবস্থা না থাকায় সম্পর্ক খারাপ হলে স্বামী স্ত্রীর বদকারী করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। এ ধর্মে কুমারী মেয়ের নিজস্ব সম্পত্তিও বিয়ের পর স্বামীর বলে গণ্য হতো, এমন কি স্ত্রীর নিজ নামটি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে মিসেস হেনরী, মিসেস ক্লার্ক ইত্যাদি হয়ে স্বামীর নামেই পরিচিত হতে হয়। বেচাকেনার ব্যাপারেও নারীদেরকে কোন স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হতো না। এই জাতীয় দায়িত্ব স্বামীর ওপরই ন্যস্ত থাকতো।

চার্চের আইনে স্ত্রীজাতি নাপাক পদার্থ বলে বিবেচিত হতো। এই জন্যই নারীরা চার্চের 'কুরবান গাহ' স্পর্শ করতে পারতোনা, যদি তাও না পাক হয়ে বসে।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জেরুযালেমের পাদ্রীদের মধ্যে এক ধর্মীয় কাউন্সিলে নারীদেরকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো যে, প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির 'আত্মা আছে কিনা' এবং নারী মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা? এতে অনেকেই রায় পেশ করেছিলো যে, নারীর প্রাণ থাকলেও 'আত্মা' নেই। কাজেই সে মানুষ নয়। আবার কিছু সভ্য দয়ার বশে রায় পেশ করলেন, যদিও নারীকে মানব সীমার বাইরে ফেলা যায় না, তবুও সে সকল দোষের আধার।

যে ধর্মের নেতারা ধর্মকে মনগড়া করে নারীকে মানব সীমার বাইরে এক প্রাণবন্ত পশুর পর্যায়ে ফেলতে পারে, সেই ধর্ম বা সমাজ নারী জাতিকে কতটুকু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দান করতে পারে? তখনকার সময়ে হাজার হাজার নির্দোষ পরীসম সুন্দরী নারীকে শুধু নারী হওয়ার অপরাধে এবং কন্যা প্রসবের অভিযোগে জীবিত অবস্থায় আগুনে জ্বালানো ও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। যদি কালে ভদ্রে দুই একজন বেঁচেও গেছে, তা হলে তাদের জীবন মৃত্যুর চেয়ে অধিক দুঃখের হতো।

অবশেষে ফারন লুথার নামের এক সংস্কারক খৃস্ট সমাজে শান্তির দূত হিসাবে পৃথিবীতে এলেন। তিনি নারীদের প্রতি এই যুলুম-অত্যাচার ও অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ঈসায়ী দুনিয়ার এক মহাপরিবর্তন আনয়ন করলেন। ফারন লুথারের প্রচারের ফলে জনসাধারণ বুঝতে পারলো যে, এতোদিন ধর্মের নামে যা শোনানো হয়েছিলো তা কোন ধর্মের বিধান ছিলো না, বরং তা ছিলো পাদ্রীদের মনগড়া বিধান।

আমাদেরও বিশ্বাস, এক খোদায়ী ধর্মে কখনো মানুষেরই একাংশ স্ত্রী জাতির বিরুদ্ধে এতো বিষ উদগীরণ করতে পারে না। ঈসা (আ.)-এর মতো দয়ার আধার নবি এ ধরণের শিক্ষা দিতে পারেন না।

মূল বা আসল ইঞ্জিল কিতাব তো দুনিয়াতে আর বাকী নেই। পরে অনুসারীরা নিজ নিজ খেয়াল খুশী মতো আযগুবী সব একত্র করে ইঞ্জিল নামে চালিয়ে দিয়েছে। খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে আলেকজান্ডার রাসেল লিখেছেন "পশ্চিমা খৃস্টীয় সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে মানব মনের ওপর কোন দাগ কাটাতে পারেনি। কারণ তা স্বার্থপরতা ও ভোগশক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইংলিশ চার্চগুলো সব সময় সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এরা সব উন্নতিকামী সম্প্রদায়সমূহকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে।

সত্য বলতে কি, আজ আমরা যাকে খৃস্টীয় সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করতে পারি তার উৎপত্তি ৮ম শতাব্দীতে স্পেনীয় মুসলমানদের কল্যাণেই হয়েছে। তখন খৃস্টান দুনিয়ার চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে বসেছিলো। ফারন লুথারের মতো সংস্কারকের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নারী জাতির তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। কারণ পুরোনো কিংবদন্তিগুলো মানুষের শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ করেছিলো এবং তাদের চোখের ওপর গোড়ামির মজবুত পট্টি বাঁধা ছিলো।

লর্ড বাইরন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি সেখানকার কবি গৌরব ছিলেন। তিনি নারীদের সম্পর্কে সংকীর্ণ মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। রুশো ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন, তিনিও নারীদেরকে এক চোট নিয়েছেন। জার্মানের সোপেনহারের দার্শনিক হিসাবে যেমন খ্যাতি আছে, নারী জাতির অপমানকর চিত্র অংকনেও তাঁর সমান খ্যাতি ছিলো। জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক নীটসে ও নারী মুক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। নেপোলিয়ানের ধারণাই ছিলো ভিন্ন। তার মতে, নারী জাতি কোন মর্যাদার পাত্রীই নয়।[১০]

এসব ঘটনা ও মতামত থেকে আমরা এ ধর্মে নারী জাতির তখনকার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান

হিন্দু ধর্মে নারীর যে অবস্থান রয়েছে তা অত্যন্ত অমর্যাদাকর। এ ধর্মে বিশেষ করে রামায়ণ গ্রন্থে নারীর বিচিত্র ও অদ্ভুত বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যা অবাস্তবও বটে। ঋগবেদের দশম মন্ডলে বর্ণিত আছে যে, ব্রম্মন্ড (স্বর্নডিম) ফেটে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। তাতে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে পানি। এই পানি থেকে আবির্ভূত হয় নর এবং পরে নারীর সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণিত আছে।

হিন্দু ধর্মে নারী বা কন্যা সন্তানকে আশির্বাদ হিসেবে দেখা হয় না। বিভিন্ন হিন্দু ধর্ম সূত্র এবং ধর্মগ্রন্থে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নারী বা কন্যা সন্তান নয় বরং বিভিন্ন অজুহাতে পূত্র সন্তান আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে। এমনকি নিজ স্ত্রী গর্ভে না হলে অন্য স্ত্রী গর্ভেও পুত্র সন্তান আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে। ঋগবেদের দশম মন্ডলে বলা হয়েছে, হে বৃষ্টি দাতা ইন্দ্র এ নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট, পূত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এর গর্ভে দশপুত্র উৎপাদন কর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুত্র সন্তান জন্মদানকারী নারীকে উত্তম বলে আখ্যা দিয়েছে। রামায়ণে পূত্র সন্তান কামনা করে রাজা দশরথ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। হিন্দু ধর্মে নারী মানুষের মর্যাদাও স্বীকৃতি পায়নি। হিন্দু ধর্মে নারীকে কুকুর জাতীয় হিংস্র প্রাণীর কাতারে শামিল করা হয়েছে। কেবল শতপথ ব্রাম্মনেই নয়, গীতায় ও নারীকে শূদ্র বৈশ্যের সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। মহাভারত ভীষ্ম যুধিষ্টিরকে বলেন, নারীর চেয়ে অশুভতর আর কিছুই নেই। নারীর প্রতি পুরুষের মমত্ববোধ থাকা উচিৎ নয়। হিন্দু ধর্মের আলোকে উপরের বাণীটির প্রতিফলন বাস্তবেও দেখা যায়। এক কালে রাজপুতরা কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলতো। এখনও ভারতের অনেক স্থানে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মেরে ফেলা হয়। এক কালে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীদের তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চিতায় পুড়িয়ে মৃত্যুবরণ ঘটানো হতো। এ ধর্মে স্ত্রীকে স্বামী যত অত্যাচারই করুক না কেন তাকে ত্যাগ করার অধিকার প্রদান করা হয়নি। এমনকি হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ করারও অনুমতি নেই। তারা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেনা। হিন্দু শাস্ত্রমতে নারীদের স্বাধীনতা অবৈধ। হিন্দু ধর্মমতে নিঃগৃহীত পশুর যেমন মর্যাদা আছে পুরুষের কাছে, নারীর ততখানি মর্যাদা নেই। তবে বর্তমানে সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষার আলোকে হিন্দু রমনীগণ সামাজিকী করণের মাধ্যমে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে চলেছে। তবে এটা কেবল সামাজিক চেতনায়, ধর্মীয় চেতনায় নয়।

হিরন্যকেশী গৃহসূত্রে পুত্র সন্তানকে সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুত্র কামনায় বার বার বিয়েকেও সমর্থন করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের প্রধান উপজীব্য হিসেবে দেখানো হয়েছে কেবল পুত্রের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ, তা না হলে স্ত্রী গ্রহণও প্রয়োজন হত না। পুত্র সন্তান বৃদ্ধি করে, পুত্র বংশকুল রক্ষা করে, পুত্রই শেষাশেষী অবলম্বন, এ মানসিকতায় দেখা গেছে একটি মাত্র পুত্রের আশায় অনেকেই ৫ থেকে ৯ টি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে। এটি কেবল হিন্দু ধর্মের বিষয় নয়, এটি অবশ্য একটি দরিদ্র গোত্রের সার্বিক সামাজিক চিত্র।[১১]

হিন্দু ধর্মে পুরুষের জন্য একই সময়ে দশটি স্ত্রী রাখারও অনুমতি আছে। হিন্দুদের খ্যাতনামা মনীষী ও প্রাধানদের মধ্যে এর বহু নযীর পাওয়া যায়। রাজা দশরথের তিন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পান্ডুর দুই ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিল। কোন মেয়ে পুরুষের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু এই ভালো না লাগার পরও ঐ পুরুষটিকে ঐ মেয়েলোক নিয়েই ঘর করতে হবে। সম্পর্ক ভালো হোক বা না হোক, স্ত্রী হিসাবে সেখানে থাকতেই হবে, ছাড়াছাড়ির কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই। পুরুষও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। এতে করে পুরুষটি স্ত্রীলোকটিকে বহুভাবে কষ্ট দেবার সুযোগ পায় এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এই নির্যাতন সয়ে আসতেই হচ্ছে হিন্দু সমাজে। স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর জীবন ভালোই যাবে, কিন্তু স্বামী অসৎ হলে তার যুলুম ও নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেবার কোন পথ হিন্দু ধর্মে নেই, এমন কি পুরুষকেও বলে দেয়া হয়নি যে, স্ত্রীর সাথে অসদ্ব্যবহার করা পাপ, বরং বলা হয়েছে, নারী দিনরাত্রির কোন সময় স্বাধীন থাকতে পারে না। সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকবে। অথচ এতে নারীর ক্ষতি ছাড়া উপকার খুব কমই হয়েছে। এ সম্পর্কীয় কতগুলো উদাহরণ হলো-(মনু ৯/২) নারী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত নয়। (মনু ৫/৪) নারী জীবনে কখনো নিজ ইচ্ছা মতো কোন কাজ করতে পারবে

না। (মনু ৫/২৭) বাবা মেয়েকে যার সাথে বিয়ে দেবেন সেখানেই আজীবন থাকতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অর্থাৎ সব সময় বিধবা হয়েই থাকবে। (মনু ৫/৫১) আরো বলা হয়েছে, শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, পাপাভীপ্সা, আত্মগর্ব, রাগ, এক গুঁয়েমি ও বিরক্তিকরণ নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গর্হিত কাজ করা তাদের অভ্যাস। মিথ্যা বলা তার স্বভাবজাত কাজ। (মনু ৮/১৮, ১১এর ৯/৯১) নারীর সঙ্গে পরামর্শ করতে নেই, এমন কি পরামর্শের সময় নারীকে কাছেও রাখতে নেই। (মনু ৮/১২৯) পুরুষরা বদকারীর ফলস্বরুপ পর জন্মে নারীত্ব লাভ করে। (সত্যার্থ প্রকাশ)।

সনাতন আইনে লিখিত আছে, "অসৃষ্ট নরক, বন্য ও বিষধর সর্প, এর কোনটিই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়।" বর্তমান হিন্দু নারী সমাজে যুগের প্রভাবে জাগরণ ও আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হওয়ায় সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনকেও এ ব্যাপারে কিছু রদবদল করা হচ্ছে। হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা ঘৃণা ও যুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দুঃখ প্রকাশ করছে। ১৯৩০ সালের ২২ শে নভেম্বরের আর্য্য গেজেটে 'সমাজে নারীর স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে এক শিক্ষিতা হিন্দু নারী লিখেছেন; হিন্দু গ্রন্থগুলোতে কিভাবে নারী জাতিকে হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তা দেখে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হই। আমাদের মনুস্মৃতির লেখক মহারাজ মনু তদীয় গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে ৪১৬ শ্লোকে নারীকে দাস সম্প্রদায়ভুক্ত করে নারীর সংগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আর একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, "যদি কোন শতবর্ষী হাজার রসনাবিশিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল নারীর দোষত্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না।" মনু বলেন, "ধনের ওপর নারী ও চাকরের কোন অধিকার নাই। ঋণে ডুবা ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে পরজন্মে নারী বা পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে।" লেখিকা আরো লেখেন, তুলসী রামায়ণেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় বলা হয়েছে যে, নারী জাতির অন্তরে সবসময় ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে, যেমন- ঔদ্ধত্য, মিথ্যা, চালাকি, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা ও দয়াহীনতা। আবার তিনি লিখলেন, "স্ত্রী ও শুদ্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দিও না। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় নারী সাজসজ্জাও করতে পারবে না।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা নারী জাতির প্রতি হিন্দু ধর্মের অসদাচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। কেউ হয়তো বলতে পারে এতো পুরনো যুগের কথা আজ কি আর তা আছে? তাহলে শুনুন ঐ মহিলাই আরো লিখেছেন, "আজও হিন্দুয়ানী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু নারীদের অবস্থা যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে। পুরুষ যতো বড় দুষ্কৃতিকারী, আহমক বা খারাপ লোকই হোক না কেন, সে স্ত্রীর মোক্ষদাতা। সে বিরাট পাপ করেও অপবিত্র হয় না, নারীর সাধারণ ভুল বা স্বামীর সঙ্গে তার সাধারণ অপরাধও ক্ষমার উপযুক্ত নয়। রান্না করা, কাপড় ধোয়া, পাত্র মাজা এবং দিবারাত্রি সেবা করাই তার কর্তব্য। পরামর্শস্থলে নারীর কোন স্থান নেই। নারী স্বামীর আমোদফুর্তির উপকরণমাত্র। স্বামীর সাথে সমতার দাবি করা, স্বামীর সমস্থানে বসা বা স্বামীর কাজে হাত দেয়ার অধিকার হিন্দু নারীর নেই। পুরুষ কোন দিনই স্ত্রীকে সম্পত্তির অংশীদার করেনি, ধন-দৌলতের মালিকানা পুরুষদেরই একচেটিয়া।"

যে কোন ধর্মেই হোক, যতোদিন পর্যন্ত নারী জাতিকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নিমজ্জিত করা হবে এবং তার কোনস্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত না হবে, ততোদিন পর্যন্ত নারীকে পাপের প্রতিমূর্তি ও ক্ষতিকর জীব বলেই বিবেচনা করা হবে এবং নারীর মুক্তি ও শান্তিপথ অজ্ঞাতই থাকবে। যতোদিন এই হিন্দুয়ানী শিক্ষা বিদ্যমান থাকবে, ততোদিন হিন্দু নারীর মার্যাদা উঁচু হওয়ার কোন আশাই করা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে হিন্দু নারীদের যে স্বাধীন চলাফেরা ও স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাদের ধর্মমতে বৈধ নয়।[১২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর কিছুটা মর্যাদা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্মের ন্যায় নারী এখানে ততটা অবহেলিত নয়। মহামঙ্গলে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণপোষণকে উত্তম মঙ্গলরূপে অভিহিত করেন। মহা পরিনির্বাণসূত্রে দেখা যায় তথাগত বুদ্ধ বজ্জিদেরকে যে সাতটি উপদেশ দেন তার মধ্যে পঞ্চমটি ছিল স্ত্রী জাতির মর্যাদা রক্ষা করা। হিন্দু ধর্মের অপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে যেমন নারীদের হোম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, বৌদ্ধ ধর্মে সেরূপ বলা হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের ধর্ম চর্চার অধিকার দেওয়া হয়নি, আর বৌদ্ধ নিজেই ছিলেন সংসার বিরোধী। সংসার ও স্ত্রীর প্রতি শেষ পর্যন্ত তার সম্পৃক্ততা ছিল না। তিনি স্ত্রী, পুত্র ফেলে সংসার পরিত্যাগ করে চলে যান। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তার স্ত্রী তার সব অধিকার এমনকি যৌন অধিকার পর্যন্ত হারায়। তাছাড়া সংঘে ভর্তি হওয়া ভিক্ষনীদেরও সংসার সুখ পরিত্যাগ করতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মেও পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ আছে। তাতে পঞ্চম গুণটি হলো পুত্রবতী হওয়া। অর্থাৎ যে স্ত্রীর পুত্র সন্তান হয়, তা একটি উৎকৃষ্ট গুণ। সংযুক্ত নিকায় প্রথম খন্ডে গৌতমবুদ্ধ কন্যা সন্তান বিষয়ে কোশলরাজ প্রশেনজিৎকে বলেন এমনটি এ কন্যা সন্তান রত্নগর্ভা হতে পারে, তার গর্ভজাত সন্তান ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারে। এবং সুবিশাল রাজ্যের অধিশ্বর হতে পারে। প্রকারান্তরে এখানে কন্যার চেয়ে পুত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কটঠাহার জাতকে বর্ণিত আছে, বারানসীরাজ ব্রম্মদত্ত তার স্ত্রীকে একটি আংটি দিয়ে বলেন, যদি কন্যাসন্তান হয় তবে তা বিক্রি করে ভরণ পোষণ করবে, আর যদি পুত্র সন্তান হয় তবে আংটিসহ আমার কাছে আসবে। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মে নারীর স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেই বললেও ভুল হবে না। এ ধর্মীয় চেতনায় নারীর সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত দূর্বল। রাজনৈতিক অধিকার বলতে এ ধর্মীয় চেতনায় নারীর কোন অবস্থান নেই।[১৩]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে যেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টারমার্ক বলেন,

Woman are of all the snares which the temper has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তার মধ্যে নারীই সবচেয়ে বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে-যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে বেটনী (Bettany) তাঁর World's Religions গ্রন্থে বলেন,

Unfathomably deep, like a fish's course in the water, is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড়-যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যের মত এবং সত্য মিথ্যার সমান।[১৪]

গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে একজন বড় সংস্কারকের খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। তিনি শুধু সংস্কার ও মুক্তির আবেগেই রাজসিংহাসন পর্যন্ত তুচ্ছ বলে জেনে ছিলেন। তিনি যখন ধর্মীয় নেতারূপে প্রকাশিত হলেন তখন তার মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্যের এক আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। তার ধর্ম মতে হিন্দু ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র বা বড়-ছোটর কোন প্রভেদ ছিল না। বংশ ও জাতির কোন বালাই তিনি মানতেন না। এই ছিলো তার বৌদ্ধ সাম্যের শিক্ষা। অপরদিকে দয়া ও সহৃদয়তার উদাহরণ এই ছিলো যে, পশু-পক্ষীর প্রতিও কোন নির্দয় ব্যবহার করা তার নীতিবিরুদ্ধ ছিলো। বৌদ্ধ ধর্মে পশু-পাখী মারা ও খাওয়া নিষিদ্ধ।

দয়া ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক এই বুদ্ধও নারী জাতির জন্য কিছু করে যাননি বা কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়াও মানবিয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" এভাবে অন্য সময়ও তিনি বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরুপ মেলামেশা বা অনুরাগ রেখো না। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলবে না, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরুপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভংগী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাসধন লুট করে নেয়; নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সামমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। যে ধর্ম বলে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেয়া উত্তম", সেই ধর্ম কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দান করতে পারে না। গৌতমের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এই জন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে লোকদের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের দিকে আহ্বান করেছিলেন।[১৫]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ইহুদী ধর্ম ও সমাজে নারী

ইহুদী জাতির কোন কোন গোষ্ঠীতে মেয়েকে দাসীর পর্যায়ে রাখা হয়। তার পিতা তাকে বিক্রি করে দিলেও দিতে পারে। কেবলমাত্র পুত্র সন্তান না থাকলেই মেয়ে সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাওরাতে আছে: "আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিলনা। তাদের পিতা তাদের ভাইদের সাথে তাদেরকে উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে।" অর্থাৎ একাধিক ভাই থাকলে শুধু সেই ক্ষেত্রেই বোন উত্তরাধিকার পেত। একজন ভাই থাকলে বোন পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এ ক্ষেত্রে বিয়ের সময় বোন ঐ ভাই এর কাছ থেকে খোরপোশ ও মোহরানার সমপরিমাণ এককালীন সম্পত্তি লাভ করতো। পিতা যদি ভূসম্পত্তি রেখে যেত, তবে ভাই তাকে কিছু ভূসম্পত্তি দিত। কিন্তু পিতা যদি অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যেত, তাহলে সে যত সম্পত্তি রেখে যাক, বোন ভাই এর কাছ থেকে তার কানাকড়িও পেতনা।

আর পুত্র সন্তান না থাকার কারণে যখন কন্যা পিতার উত্তরাধিকার পেত, তখন তার ওপর এই কড়াকড়ি আরোপিত থাকতো যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে ও উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেনা।

এ ছাড়া ইহুদীরা সচরাচর নারীকে অভিশাপ মনে করে থাকে। কারণ নারীই আদমকে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে বলা হয়েছে: "স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এ রকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সৎ পাওয়া যাবে না।"[১৬]

এ ধর্মমতে নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। এই ধর্মমতে নারী হতেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং তার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল বলে গণ্য করা হত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই গণ্য হত।

ইহুদী সমাজে নারী পুরুষ হতে অতি নিকৃষ্ট, এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। ভাই থাকলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রি করার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী। স্বামীকে অপর মহিলার সাথে শায়িত দেখলে ইহুদী স্ত্রীকে অভিযোগ না করে চুপ থাকতে হত। কারণ, স্বামীর যা ইচ্ছা, তাই করার অধিকার ছিল।

সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ, নারী মানুষরূপে গণ্য ছিল না।

এ সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এই জন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে এটি ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশি ছিল।

সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত। বিবিধ প্রকারের বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলিরই বিচ্ছেদ হতে পারত।

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চেয়ে চিৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষণকারীর সাথে বিবাহই ছিল এর বিধান।

মাতাপিতা কন্যাদেরকে বিবাহে বাধ্য করত না। কিন্তু তাদেরকে বিবাহ দেওয়া বা কারও নিকট বিক্রি করে ফেলার আইনসঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।

বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা, উপপত্নী রাখতে পারত। তদুপরি অবিবাহিতা দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধ বিবাহিতা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এইসব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হত না।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হত। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে নারী অপর স্বামী গ্রহণ করতে পারত।

স্বামী বহুক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করত। পিতা তার ছেলে-মেয়েদেরকে বিক্রি করতে পারত।[১৭]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বনি ইসরাঈলদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন ও ফিরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দানের নিমিত্ত হযরত মুসা (আ.) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন এবং তার ওপরই তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়। আজকাল যে তাওরাতের অস্তিত্ব দেখা যায় সঠিক মতে তা প্রকৃত তাওরাত নয়। তৎকালীন ভন্ড ইহুদী রাজাদের কল্যাণে প্রকৃত তাওরাত ভস্মীভূত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাওরাত রাখা বা পাঠ করা অন্যায় বলে গণ্য হতো। এর তিন শত বছর পর মানুষের মুখ থেকে শুনে শুনে (যার কোন মজবুত ভিত্তি ছিলো না) বর্তমান তাওরাত সংকলন করা হয়, তাই এ তাওরাত সত্য-মিথ্যার এক সমাবেশে পরিণত হয়। এ ধরণের মনগড়া তাওরাতে নারীদেরকে পণ্যদ্রব্যের মতো উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদী সমাজে পূর্ব হতেই শিশু মেয়েদের কেনা-বেচার প্রচলন বিদ্যমান ছিলো। বরের কাছ থেকে কনের দাসীত্বের মূল্যস্বরুপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া হতো। ইহুদী ধর্মে ভাইদের মৃত্যুর পর ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা এক অপরিহার্য নীতি, তাতে মেয়ের মতামত নেয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

ইহুদী সমাজে একাধিক বিয়ের এতো প্রচলন ছিলো যে, যার যা ইচ্ছা তাই বিয়ে করতে পারতো, এতে তাদের মনগড়া কিতাবে কোনরকম বিধি নিষেধ ছিলো না। এ সমাজে নারীদের দান প্রতিদান বা সাক্ষ্য দেয়ার কোন অধিকারই ছিলো না। নারীর শপথও নিরর্থক বলে বিবেচিত হতো। ইহুদীদের বিশ্বাস্য কিতাব "আহাদ নামায়ে আতীক" গ্রন্থে নারী জাতি সম্পর্কে লিখিত আছে, "নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম পরিবেশন করা, নারী পাপের প্রস্রবন। পূণ্যজনক কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে মান-সম্মানের যোগ্য হতে পারে না।"

ইহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, একমাত্র হাওয়া (আ.)-এর ফুসলানিতেই হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবনকে বিপদাপন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ থেকে ইহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারী জাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পাপের উস্কানিদাত্রী হয়ে আছে। অতএব সে ধর্মীয়, সামজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। শুধু এই একটি মাত্র কারণ থেকেই ইহুদীরা নারী জাতির অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মনগড়া তাওরাতের হুকুম ছিলো "দুজন পুরুষের মধ্যে ঝগড়া বা লড়াই আরম্ভ হলে কোন নারী যদি তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই অপরাধে ঐ নারীর উভয় হাত কেটে দেয়া হবে। এতে তার প্রতি কোন রকম দয়া প্রদর্শন করা যাবে না।" স্বামীর প্রতি নারীর মমত্ববোধ, হৃদ্যতা ও ভক্তির পুরস্কার হিসেবে এর চেয়ে বেশি আর কি দেয়া যেতে পারে? একটি কুকুরের প্রভুভক্তির প্রশংসা পাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু একটি নারী যদি তার স্বামীকে বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্য হাত বাড়ায় তবে তার এই মহব্বতের পুরস্কার হলো হাত কাটা।

ভাববার বিষয় যে, খ্যাতনামা নবি হযরত মুসা (আ.)-এর জীবনে নারীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের বহু উদাহরণ রয়েছে। তিনি কি নিজ উম্মতকে এ ধরণের পাশবিক বিধানের নির্দেশ দিতে পারেন? না, কখনো পারেন না। মুসা (আ.) যখন মাদায়েন যাচ্ছিলেন তখন তিনি এক কুয়ার পাশে পানির জন্য অপেক্ষমান দুটি বালিকাকে দেখতে পেয়ে নিজে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারই উম্মতের দাবিদার ইহুদীদে ইতিহাস নারী কেলেঙ্কারীতে পরিপূর্ণ।

তালাকের ব্যাপারেও এ ধরণের হৃদয়হীনতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর ছোট ছোট দোষ-ত্রুটিতো দূরের কথা, দোষ-ত্রুটি না পেয়েও পাপহীন তালাকের অধিকার পুরুষদের জন্য ছিলো। আরো বিপদ এই যে, ইহুদী সমাজে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর কেউ বিয়ে করতে পারবে না।

তরকারিতে লবণ একটু বেশি হলো বা কাপড় ধোয়া ভাল হয়নি অথবা কোন সুন্দরী নারী লাভের আশা পাওয়া গেলো অথবা এ ধরণের কোন তুচ্ছ ভুল নারী থেকে প্রকাশিত হলো, অমনি স্বামী তাকে পাপহীন তালাক দিতে কোনরকম দ্বিধা করতো না। তালাকতো নয়, স্ত্রীর জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া। ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। তাই প্রত্যেক ইহুদী পুরুষ তার ইবাদতের সময় এই বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া ও তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আজকের ইহুদী জাতি অবশ্য খৃস্টান সমাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার কারণে এবং যুগের পরিবর্তনের কারণে নারী সমাজকে সেই রকম অবহেলা আর করতে পারে না। তাই তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতকে তাদের মনের মত করে তারা গড়ে নিয়েছে।[১৮]

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান

পারসিক ধর্মে নারী

কথিত আছে যে, ইরানের অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিলো যরোয়েষ্টি।" তার ধর্মেও নারী জাতি সম্পর্কে লজ্জাকর বিধান দেখতে পাওয়া যায়। যরোয়েষ্টি বলতেন, "সন্তানবিহীন নারী পুলসিরাত পার হতে বা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই বেহেশতের অভিলাষিনী নারী যেনো অন্ততঃপক্ষে অপর কারো সন্তান পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।"

প্রসূতি ঘরের নিয়মও কঠোর ছিলো। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতি পেতো না। ঐ সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরের বারান্দায় পা দিতে পারতো না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হতো, এমন কি ঐ সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরের একটি মাস নির্ধারিত ছিলো। সেখানকার হতভাগা নারী জাতি নিজের জীবনকে বোঝা বলে মনে করতো। নারী ছিলো স্বামীর দাসীস্বরুপ, আল্লাহর ইবাদত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বামীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হতো।

যরোয়েষ্টির ধর্ম প্রাচীন ধর্ম। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের (পঁচিশ) বছর আগের যুগটি যরোয়েষ্টির যুগ। তবে এই ধর্মে বিভিন্ন রকমের যৌন উন্মাদনা থাকায় কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মতো প্রতাপশালী রাজারাও এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলো। যার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রচারনায় এই ধর্ম দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এই ধর্মের অন্য নাম ছিলো মজুসিয়াত। সম্রাট পারভেজও মজুসী ছিলো। একই সময় সে বার হাজার স্ত্রীর স্বামী ছিলো। এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে একশ এরও অধিক ছিলো তার মা, খালা, ফুফু, বোন ইত্যাদি নিকট আত্মীয়স্বজন। পারভেজ এই বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলো না। যখন তার ইচ্ছা হতো বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিতো অথবা হত্যা করতো, আবার পছন্দমতো স্ত্রী সংগ্রহ করে নিতো, এমন কি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে বা অন্য কারো সাথে শয়ন করতে দিতেও কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতো না। সে সময় নারী জাতি পণ্যদ্রব্য হিসাবে সাধারণভাবেই বেচাকেনা হতো। ধর্মের নামে দোহাই চলতো, নিজেকে পবিত্রসত্তা বলে আখ্যা দেয়া হতো। অথচ সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সংগম করাও চলতো। এতে কোন লাজ-লজ্জার বালাই ছিলো না। এভাবে মা-বোন বা মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই ধর্মের সংস্কারক হিসাবে তথাকথিত দার্শনিক ময়ুক এসে আরো বহু বিধি-বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করে যার অনুসারী হয়ে ছিলো শাহ কাবাদ এর মতো প্রতাপশালী রাজাও। ময়ুকের মতে ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল। তাই সে ধন ও নারীকে স্বাধীন করে দিলো অর্থাৎ ধন ও নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। ময়ুকের এই নীতি শাহ কাবাদের প্রচারণায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে শুরু করলো। এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর স্ত্রীতে পরিণত হতো।

এই বিশৃঙ্খলতার যুগে নিজের ধন বা নিজের স্ত্রীকে অপরের উপভোগ থেকে নিষেধ করার মতো সাহস কারো ছিলো না। প্রত্যেক মানুষের যে কোন নারী বা কারো স্ত্রীর সাথেই মেলামেশা করার অধিকার ছিলো, এমন কি শাহ কাবাদ এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার শাহী মহলের পাহারা ও বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিয়েছিলো। শহরের জনসাধারণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বেগম মহলে প্রবেশ করে শাহজাদী ও বেগমদেরকে ভোগ করে ময়ুকী মতবাদকে কার্যত রুপ প্রদান করতো। সকল মানুষই একে অপরের ঘরে প্রবেশ করে 'সমবায় কার্যক্রম' এর রুপদান করতো।

নওশেরোয়া এর পিতা শাহ কাবাদের স্ত্রী কথিতভাবে পাটরাণী বা মহারাণী বলে আখ্যায়িতা হতো বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার পুরুষ তাকে ভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলো। ছেলে নওশেরোয়া বড় হয়ে বাবার এই লজ্জাজনক ঘৃণিত কাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন, তিনি তার মাকে নিয়ে বলখের দিকে পলায়ন করলেন এবং সেখান থেকে এক সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে পিতা শাহ কাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন এবং এই যুদ্ধে নওশেরোয়া এর জয় হলো।[১৯]

চীন সভ্যতায় নারী

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়াতে চীনদেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম-গ্রন্থে নারীকে 'Waters of woe' (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কখনও কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি তার সন্তানদের উপরও তার কোন অধিকার থাকত না। স্বামী যখন ইচ্ছা, তখনই তাকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রিও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুনর্বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন, "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।"

সে দেশে বালকেরা দরজার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াত যেন তারা স্বর্গ হতে আগত দেবতা। স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করেছে এ সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর না পড়ে সেজ্জন্য সে নিজ ঘরে লুকিয়ে থাকত। মৃত্যুবরণ করলে কেউই তার জন্য কান্না করত না।

ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার মাতাপিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হত।

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিবাহের পর সে স্বামীর পরিবারে চলে যেত এবং স্বামীর মাতাপিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকত। অলংকারাদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিসপত্র ব্যতীত সে যে সম্পত্তিই সঙ্গে আনত, এর সকলই স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হত। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকে থাকতে পারত। পুত্র-সন্তান প্রসব ও স্বামীর মুরব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের পর স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা সবল হয়ে উঠত।

বর ও কনের পরিবার প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মতিতেই বিয়ের কাজ সম্পাদিত হত। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিয়ের উকিলের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন হত।[২০]

ভারতীয় সভ্যতায় নারী

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা খুব খারাপ ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সবসময় শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনু'র মতে তাকে দিন-রাত্রি অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবে দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

নারী সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণি ও রাজবংশের মহিলাদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাগণের আবাসস্থল কড়া পাহারায় রাখা হত। কোন কারণেই তাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এই কাজে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সেজ্জন্য কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় তাকে যেতে হলে খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হত, যেন সহজে সে কোন লোকের চোখে না পড়ে। তার বোনা বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করত, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমন্ডলের দিকে তাকাত অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সাথে বলত, তবে তাকে জরিমানা দিতে হত।

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণির হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা-প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়। সতীদাহ-প্রথা প্রাচীন ভারতে

সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হত। এখনও এই বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও ভারতকে এই প্রথা রহিত করে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। হিন্দুসমাজে নারী অশুভ প্রাণীবিশেষ। এই জন্যই সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত।

There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.

নারীর মত এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরুপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।"

'Men should not love them' নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নয়।

পুত্র সন্তান জন্মালে পরিবারে আনন্দ ধরত না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মালে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসত।

The birth of a girl grant if else-where, here grant a boy.

হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।

এইখানে গ্রন্থকার হিন্দু সমাজের অন্তরের আশা-আকাঙ্খারই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতার দ্বারা কন্যা বিক্রয় স্বরুপই ছিল। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। সেই যুগে বালিকাদেরকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেওয়া হত। দেবতাগণ তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করতে পারত। এই বালিকগণ অবশেষে মন্দিরের পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত এবং পুরোহিত মন্দিরের কর্মচারিদের উপরি পাওনারূপে গণ্য হত।

বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের মত ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদেরকে অপহরণ করত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর মত তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করে নিত। স্বামী স্ত্রীকে সেবা দাসীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বত্র লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি অপরাধের কারণে, এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।[২১]

আরব সমাজে নারী

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তারা মানবরূপে গণ্য ছিল না। পুরুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যস্থলে ছিল তাদের অবস্থান। কন্যা-সন্তানের জন্ম সে দেশে এক চরম অভিশাপ বলে গণ্য হত।

আল-ইসলাম রুহুল-মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয় সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর মত ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচে ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি সুনজর দেওয়া হত। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবদের মত নারীদেরকে এত বেশি অপমানিত ও নির্যাতিত করত না। কন্যা-সন্তান জন্মকে আরবগণ কুলক্ষণ ও অপমানজনক বলে মনে করত। নবজাত কন্যা -সন্তান হত্যার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হত। পণ্যদ্রব্যের মত তাদেরকে বিক্রিও করা হত এবং পশুর বদলে তাদেরকে বিনিময় করা হত। আরবদের ধারণা অনুসারে কন্যা-সন্তান অপমান ও অমর্যাদার কারণ ছিল বলেই তারা এই সকল কাজ করত।

নবজাত কন্যা-সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হত। কেউ কেউ গর্ত খুড়ে তাতে পুঁতে তাদেরকে হত্যা করত; কেউ কেউ খুব উঁচু স্থান হতে তাদেরকে নীচে নিক্ষেপ করত; আবার কেউ কেউ পানিতে ডুবিয়ে মারত বা কেটে ফেলত। এই সকল নির্যাতনের কারণে নারী মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করত যেন এমন মৃত্যুবরণের জন্যেই তার জন্ম হয়েছে। স্ত্রী কন্যা-সন্তান জন্ম দিলে আরবগণ সমাজের ভয়ে এটি গোপন

রাখত, যেন এটি ভীষণ পাপ অথবা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ ছিল। এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার অপহরণ করা হত যেন তারা কসাইখানায় জবাই হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশু ছিল।

এমনিভাবে নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিল-যা সে নিজ খেয়াল-খুশিমত ব্যবহার করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লাম তাঁর পয়গাম ও পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী নিয়ে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নারীদের উপর এমন অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। এর পূর্বে কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে তাকে কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলত যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হলে সেই আত্মীয় তাকে বিবাহ করত। আর সে সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হত এবং কারগারে মৃত্যুর পর সে তার সম্পত্তি দাবি করত।

কোন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করলে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাত। ফলে তাকে প্রদত্ত সকল সম্পদ স্বামীকে দিয়ে সে তার নিকট হতে নিস্তার লাভ করত। এই সম্পদ সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে ব্যবহার করত।

মদীনায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে তার বিধবা স্ত্রীরাও অধিকারী হত। বিধবা তার নিকট আমানতস্বরুপ গচ্ছিত থাকত এবং মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত সে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করত।

সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। এই সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদেরকে ধরে নিয়ে বিবাহ করত। এই জন্যই আরবগণ কন্যা সন্তানের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করত এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করত। কারণ, পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এই কারণেই আরবগণ কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।

This revolting custom prevailed extensively until it was supressed by Muhammad peace be on him.

হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লাম দমন না করা পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হত। সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিয়ে দিতে পারত আর সে তার বিয়ে বন্ধও করতে পারত। মা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হত।

আরব রমণীর স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। মুতআ-বিবাহ (নারী-পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ) এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথাও তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা, এমনকি তার বিধবা পুত্রবধূকেও বিয়ে করতে পারত। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভাইয়ের স্ত্রীকে নিজ স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।

বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মার্যাদা একেবারে হীন করে দিয়েছিল এবং নারী ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপেই পরিগণিত হত।

জগতের তৎকালীন সভ্যতায় যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তেমন আরবেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; বরং সামর্থ থাকলে যে যত খুশি, বিয়ে করতে পারত।

তখনকার আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকলেও নারী-পুরুষের মধ্যে শর্তাধীন ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্ক অবাধেই স্থাপিত হতে পারত। এছাড়া সমাজে নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে পেশাধারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেলা করত এবং তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলে জনগণ মনে করত।[২২]

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নারী

বিভিন্ন ধর্মে ও সমাজে নারীকে পাপ মূর্তি হিসাবে, পাপের প্রস্রবন, আদম নির্বাসনের কারণ, শয়তানের যন্ত্র, কপট, অজগর, মোক্ষ লাভের অন্তরায়, মানব জাতির বাইরে প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িতা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) এই ৩টি জিনিস পছন্দ করতেন যথা: সুগন্ধি, নারী ও নামায। ইসলামের নবি, সকল নবি-রাসূলদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) নারী জাতিকে 'প্রিয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন; নারীর জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে! পৃথিবীতে নারী পুরুষের সাহায্যকারিণী, স্ত্রী হিসাবে নারী পুরুষের চরিত্রের সংরক্ষক, তাই তারা প্রিয় নবির মুখের এতো বড় সম্মানিত আখ্যা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। প্রেম, ভালোবাসা ও পবিত্রতা রক্ষায় নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করা হয়েছে। সব পুরুষ পুরুষ সব নারীর সমান নয়, বরং কোন কোন নারীর চেয়ে পুরুষ আরো নিম্নমানের আছে।

যে সব ধর্মের পাদ্রী ও বিশপরা 'নারী মানুষ কিনা' এর সমস্যা নিয়ে কাউন্সিলে বসেছেন, তাঁদের উত্তরে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে যে, যখন হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজর থেকে মা হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আদম বা তাঁর ছেলেরা মানুষ হতে পারলে আদমের শরীরের অংশ হাওয়া ও তাঁর মেয়েরা কেন মানুষ হবে না? যে সব ধর্মে হযরত হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.)-এর গন্ধম খাওয়ার ব্যাপারে দোষারোপ করে নারী জাতিকে আদি পাপী বলে আখ্যা দিয়েছে, ইসলাম তার ঘোর বিরোধিতা করে বলে, আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করবেন এই উদ্দেশ্যেই আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। কাজেই আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর গন্ধম খাওয়াটা শয়তানের মাধ্যমে হয়েছে বটে, কিন্তু তাকদীরে তা লেখাই ছিলো, না হয় মানুষ পৃথিবীতে আসবে কি করে? ইসলাম নারীকে কতোটা সম্মানের আসনে আসীন করেছে আমরা এসব আলোচনা থেকেই তা বুঝতে পারি।[২৩]

খ্রীস্টানগণ বলেন, নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাকে যৌন অনুভূতিহীন ভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে হবে। ইসলাম তাদের এই দাবি খণ্ডন করেছে। পবিত্র কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে:

'নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন'।[২৪]

বাইবেলের কথা অনুসারে "নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হয়েছিল। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আ.)-এর পতনের জন্য দায়ী।" তবে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, হযরত আদম (আ.) এবং হযরত হাওয়া (আ.) দুজনেই একইভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সুতরাং দুজনেই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا١ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۳۵ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ١

'আর আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী বেহেশতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর। তবে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান এ হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল, সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করল'।[২৫]

বাইবেলে আরো রয়েছে যে,

"না পুরুষ নারীর জন্য এবং না নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" খ্রীষ্টধর্মের এই ঘোষণার প্রতিবাদে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে: "তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাক" অর্থাৎ পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না; বরং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রুপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, সেটি কেবল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে। ইসলাম শ্রম বিভাগের নীতিতে বিশ্বাস করে। কঠোর শ্রমসাধ্য এবং গৃহের বাইরের রূঢ় ও কর্কশ কর্ম সম্পাদন ও জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। ইসলাম গৃহকেই নারীর সর্বপ্রথম কর্মস্থল বলিয়া মনে করে এবং গৃহের ব্যবস্থাপনা, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিশুদের শিক্ষাদানের কাজ নারীদের উপর অর্পণ করেছে। ইসলাম নারীকে বিদ্যার্জনে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে জাতির উন্নতিমূলক ও জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণেরও অনুমতি প্রদান করে। অফিস ও কল-কারখানার কার্যাবলী ইসলাম নারীর রুচি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে মনে করে এবং নারী ও পুরুষকে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়, সহানুভূতি ও প্রেম-প্রীতির সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

পারিবারিক বিষয়াদি পরিচালনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার উপর ন্যস্ত থাকবে, এই সমস্যা এড়ানো যায় না। এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, কর্ম-পন্থার ঐক্য না থাকলে সুস্থ পরিচালনা সম্ভব নয় এবং একাধিক ব্যক্তির উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকলে কর্ম-পন্থায় ঐক্য থাকতে পারে না। এজন্য একজনের উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মুসলমান পরিবারে মাকে পিতা এর চেয়ে বেশি, বোনকে ভাই এর চেয়ে বেশি এবং কন্যাকে পুত্র এর চেয়ে বেশি মর্যাদা দান করা হয়েছে। কিন্তু পরিচালনার ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নয়; বরং স্বামীর উপরেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে। এই সাথে স্বামীর উপর স্ত্রীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে এবং স্ত্রীর উপর কোন প্রকার অন্যায় সাধনে স্বামীর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। অন্যায় করলে স্বামীকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ١ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ١

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে মর্যাদা।"[২৭]

কোন কোন ধর্মে নারীকে An organ of Satan (শয়তানের অঙ্গ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারী শয়তানের অঙ্গ নয়; বরং ইসলামে তাকে 'মুহ্সানাহ' (সংরক্ষিত দুর্গ) বলে আখ্যায়িত করেছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাতৃজাতিকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি বিদ্যা অর্জনকে নর-নারী উভয়ের জন্যই ফরয (অবশ্য কর্তব্য) বলে ঘোষণা করেছেন।

নারী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধনকে কোন কোন ধর্ম ও সভ্যতায় অগ্রাহ্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং একে ক্ষতিকর ও অপমানজনক মনে করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বিবাহের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার আগে আরব নগরীতে নারী পুরুষ স্বতন্ত্র কোন স্বাধীন সত্তার অধিকারী ছিল না। ইসলাম ধর্মই তার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি দিয়েছে। সে স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারে এবং নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে পারে। মাতা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসেবে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। ইসলামই তাকে স্বীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। এমন অধিকার অন্য কোন ধর্মে দেওয়া হয়নি।

মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়ার অধিকার ইসলাম অনুসারে মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজন কাউকে দেয়নি। আর ইসলামই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নারীকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেছেন,

'পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ'।[২৮]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র জগতব্যাপী নারীজাতির অবস্থা কিরুপ শোচনীয় ছিল, তা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তখনকার কোন ধর্মই মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অধিকার স্বীকার করেনি। নারীকে আপদ, অনভিপ্রেত বোঝা এবং পরিবারের অপমান ও অমর্যাদারূপে গণ্য করা হত। দুনিয়ার সর্বত্র নারী অস্থাবর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল। বিবাহের ব্যাপারে তাদের সম্মতি গ্রহণ

করা হতো না। পুরুষের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী তাদেরকে গ্রহণ ও বর্জন করা হত। তাদের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না।

তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশই তারা পেত না। গোটা দুনিয়ায় যখন নারীজাতি অবহেলিত ও লাঞ্ছিত ছিল, কোন দেশ, জাতি, ধর্ম বা আইনই নারীকে কোন প্রকার অধিকারই প্রদান করেনি, সেই যুগে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নারীজাতির সকল অধিকার প্রদান করেন এবং কঠোরভাবে এদের নিরাপত্তা বিধান করেন। নারীজাতির এই সকল অধিকার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আস্তে আস্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে ও চাপের মুখে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে। বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রথম স্ত্রীকে 'অর্ধাঙ্গিনী' রূপে অভিহিত করেছে।[২৯]

অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় ইসলাম আদম (আ.)-এর জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার শাস্তির জন্য এককভাবে হাওয়াকে দায়ী করেনি, বরং উভয়কে সমানভাবে দায়ী করেছে। আদম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনাকালে আল্লাহ বলেন, "শয়তান তাদের দু'জনেরই সেই বৃক্ষের ব্যাপারে পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যে স্থানে ছিল সেখান থেকে বহিষ্কার করলো।"[৩০]

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "শয়তান তাদের উভয়কে কুপ্ররোচনা দিল যাতে তাদের ঢেকে রাখা লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে দিতে পারে।"[৩১]

তাওবার ব্যাপারেও তাদের উভয়কে সমভাবে অংশীদার করেছে, "তারা উভয়ে বললো, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজদের ওপর অত্যাচার করে বসেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তবে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"[৩২]

পুরুষের মত নারী যদি পূণ্যবতী ও সৎকর্মশীলা হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবদাত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে, পক্ষান্তরে সে অসৎকর্মশীলা হলে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً١ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝۹۷

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, সে যদি মুমিন হয়, তবে তাকে আমি অবশ্য পবিত্র ও নিরাপদ জীবন যাপন করাবো এবং তার কৃত সৎ কর্মের বিনিময়ে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করবো।"[৩৩]

উভয়ের সম-মর্যাদার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় মুসলিম নারী ও পুরুষ, মুমিন নারী ও পুরুষ, প্রার্থনাকারী পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার স্ত্রী, সচ্চরিত্র পুরুষ ও সতী স্ত্রী এবং আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রী এদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।"[৩৪]

ইসলাম নারীকে অপয়া ও অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এই মানসিকতা শুধু যে তৎকালীন আরব সমাজেই ছিল তা নয়, বরং আজও বহু জাতির মধ্যে এটি বিরাজমান, এমনকি কিছু কিছু পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যেও আমি এই মানসিকতা স্বচক্ষে দেখেছি। এই জঘন্য অভ্যাসের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ۝۵۸

"তাদের কেউ যখন মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর শুনতে পায়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে নির্বাক হয়ে যায়। প্রাপ্ত খবরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় সে জনগণের কাছে থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় আর ভাবে, অপমান সত্ত্বেও ঐ সন্তানকে কি সে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? জেনে রাখ, তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"[৩৫]

ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও তীব্র নিন্দা জানায়। আল্লাহ বলেন,

"স্মরণ কর সেই সময়টিকে) যখন মাটিতে প্রোথিত মেয়েশিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি কারণে তাকে হত্যা করা হলো।"[৩৬]

"এবং যারা নিজেদের সন্তানকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[৩৭]

নারীকে স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।"[৩৮]

নারীকে মা হিসাবে মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারেও বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে।"[৩৯]

ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে এবং পুরুষকে পরিবার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি।

আল্লাহ বলেন,

"স্ত্রীদের যেমন দায়দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ন্যায়সংগত অধিকারও রয়েছে। তবে তাদের ওপর পুরুষের কিছু অগ্রাধিকার রয়েছে।"[৪০]

তালাকের সমস্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করেছে, যাতে স্বামী কোন রকমের স্বেচ্ছাচারমূলক বা অত্যাচারমূলক আচরণ করতে না পারে। এ জন্য তালাকের সীমা নির্দ্ধারণ করেছে এভাবে যে, তা সর্বোচ্চ তিনটের বেশি হতে পারবেনা। আরবদের সমাজে তালাকের কোন সীমা সংখ্যা ছিলনা। তাছাড়া তালাক কার্যকর করার জন্য সময় নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এরপর একটা ইদ্দতের মেয়াদ নির্দ্ধারণ করেছে, যা স্বামী স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের প্রতি সমঝোতায় প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ এনে দেয়। এ বিষয়ে আমরা কিছুটা সবিস্তারে অচিরেই আলোচনা করবো।

ইসলাম স্ত্রী সংখ্যা সীমিত করে চারে নামিয়ে এনেছে। অথচ সমকালীন আরবে ও অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে কোন সীমা সংখ্যার বালাই ছিলনা।

নারীকে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় অভিভাবকদের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেছে এবং এই অভিভাবকসূলভ কর্তৃত্ব কেবল তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, তদারকী ও তার কোন সম্পদ থাকলে তার তত্ত্বাবধায়ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অভিভাবকত্বের নামে তার দন্ডমুন্ডের মালিক হতে বা তার ওপর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন চালাতে ইসলাম কাউকে অনুমতি দেয়নি। আর বয়োঃপ্রাপ্তির পর আর্থিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমান অধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামি ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কেউ ক্রয়-বিক্রয়, দান, ওয়াকফ, বন্ধক, ইজারা, শরীকী, ব্যবসায় ইত্যাকার যাবতীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতায় ও অধিকারে আদৌ কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেনা।

উল্লিখিত মূলনীতি গুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে যা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও মানানসই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হলো,

১। মানবিক ক্ষেত্রে

এ ক্ষেত্রে সে নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিকাংশ সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, নতুবা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২। সামাজিক ক্ষেত্রে

ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্দ্ধারণ করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, তার সম্মানও তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষত বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩। আইনগত ক্ষেত্রে

বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের কোন কর্তৃত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি।[৪১]

কিন্তু কারো পাওনা বা অধিকার নিরুপণের জন্য যে সাক্ষ্য দেয়া হয়, তার ক্ষেত্রে ইসলাম দুজন সত্যভাষী পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীর সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করেছে। ঋণ দানের বিধান সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়টি নিম্নরুপ বর্ণনা করেছেন, "তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। দুজন পুরুষ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এমন একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর, যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্বরণ করিয়ে দিতে পারে।"[৪২]

ইসলামে মানসিক, শারিরীক, ধীশক্তি সব ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শারিরীক শক্তির দিক থেকেও ইসলাম নারীকে পার্শবর্তিনী করেছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধেও নারীর অংশগ্রহণ সমতুল্য ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধে নারীগণ অংশ নিয়েছিলেন। "তারিখে তরবারি" গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে নারী সৈন্য এত বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল যে তা পুরুষের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজনীদানের (৬৩৪ খ্রী. ৩০ জুলাই) যুদ্ধে নারী বাহিনী অশ্ব চালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। সিফফিনের যুদ্ধে (২৬ জুলাই ৬৫৭ খ্রী.) হযরত আলী (রা.)ও মাবিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপনে নারীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এস.এম মিত্রের ১৯১১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'The position of women in Indian life'

গ্রন্থের ষষ্ট পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, আব্বাসীয় যুগে বাইজান টাইনের যুদ্ধে খলিফা আল মনসুরের দুই জ্ঞাতি বোন সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খারেজীয়দের সঙ্গে যুদ্ধকালে একজন নারী যোদ্ধা দু'হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু যুদ্ধেই নারীবাহিনী ছিল এবং তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। শিক্ষাঙ্গন থেকে রণাঙ্গন পর্যন্ত ইসলাম নারীর ভূমিকাকে এক বিরল মর্যাদার আসন দান করেছে। পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীদের উপর কোন বিধিনিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। ইবনে জারীর আল তাবারী ও ইমাম আবু হানিফার মত বিখ্যাত ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বিচারক পদে নারীদের নিয়োগ যুক্তিসংগত বলে অভিমত দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কর্মময় জীবন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের সাথে আলোচনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ গুরুত্বও দিয়েছেন। যেমন, পবিত্র হেরা গুহায় যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের বাণী তার উপর অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং এ ব্যাপারে স্ত্রী খাদিজার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবার অপরদিকে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় সন্ধির শর্ত ও মক্কা অভিযানকে কেন্দ্র করে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা তিনি স্ত্রী আয়েশা (রা.) এর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ জাতীয় আরো অনেক উপমা রয়েছে যা রাসূলে করিম (স.) নারীদের সাথে আলোচনা বা নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণ করতেন।[৪৩]

ইসলামে নারীকে তার বিপরীত লিঙ্গের মোকাবেলায় কতটা আনন্দদায়ক ও প্রিয়বস্তু করে সৃষ্টি করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

অর্থাৎ মানবকূলের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে নারী (ইত্যাদির) মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রীর প্রতি আশক্তি।[৪৪]

অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা মানবকূলের উক্ত কোমলজাতির মধ্যে সৃষ্টি ও প্রাকৃতিকভাবে তাদের শারিরীক গঠন প্রক্রিয়া, কীর্তি এবং তাদের চালচলনকে সৌন্দর্যের আঁধার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে তারা তাদের বিপরীত লিঙ্গের জন্য অত্যন্ত প্রিয় হিসেবে গড়ে উঠে। এই বিশেষ মর্যাদার কারণে তারা তাদের বিপরীত

লিঙ্গের নিকট এক মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয় এবং পুরুষজাতি তাদের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়। এছাড়া তাদের পরস্পরের সম্পর্ক গড়া সম্ভব নয় এবং তারা দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক গড়তে ও পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করতে পারবে না। অথচ মানব জীবন টিকে থাকার জন্য এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাদেরকে কেন আনন্দদায়ক ও প্রিয়বস্তু হিসেবে তৈরি করা হয়েছে? কেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই মার্যাদা দান করেছেন? তার একমাত্র কারণ হল, মানবজাতির টিকে থাকার জন্য মূল বস্তু অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক বোঝা ও কষ্ট নারীকে দান করা হয়েছে। মায়ের রক্ত ব্যবহার করেই মানব শিশু বেড়ে ওঠে মাতৃগর্ভে। এ কারণে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কষ্টভোগের প্রতিদান স্বরুপ নারীকে উক্ত মর্যাদা দান করে তাদের মানকে সমুন্নত করেছেন।

তাদেরকে এত বেশি মর্যাদার শিখরে উঠিয়ে দিয়েছেন, যার জন্য পুরুষজাতির ঈর্ষা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে পুরুষ এই মর্যাদা কখনো পাবে না।

মানব জীবনের জন্য শান্তি এমন এক সম্পদ, যদি কেউ তা পেয়ে আর কিছু নাও পায়, তারপরও সে বলতে পারে আমি সব পেয়েছি। পেয়ে গেছি সুখ-সমৃদ্ধি, আরাম-আয়েশ, সুখের নিন্দ্রা, নিরাপত্তাসহ আরো কত কি। শুধু তাই নয়, বরং সাথে সাথে তার অন্তরের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যায়। না পাওয়ার যাতনা বিদায় নেয়। মস্তিষ্কের বিকৃতি ও মনের অশান্তি চলে যায়। প্রেমের অগ্নি নিবৃতিকারী, রক্ত চোষণকারী ও শরীর বিনষ্টকারী চিন্তা দূর হয়। ফলে মনে হয় যেন এই দুঃখ ও পরিশ্রমের দুনিয়া জান্নাতে পরিণত হল।

উক্ত নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা গচ্ছিত রেখেছেন নারীসত্তার মধ্যে। ফলে তাদের সংস্পর্শে বিষন্নতা দূর হয় ও শান্তি পাওয়া যায়। জাহান্নাম তূল্য দুনিয়া জান্নাতে পরিণত হয়।

এভাবেই নারীকে নারী হিসেবে পুরুষের উপর উচ্চমর্যাদা দান করা হয়েছে। যদি নারী কিছু না পেয়ে যায়, তবে তার বিপরীত লিঙ্গের মোকাবেলায় উক্ত সম্পদই তার জন্য যথেষ্ট।" এছাড়াও তাকে আনন্দদায়ক ও প্রিয় বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

"তোমাদের স্ত্রীরা হল, তোমাদের শষ্য ক্ষেত্রস্বরুপ।"[৪৫]

উক্ত উদাহরণের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও বলেছেন যে, মানব বংশ টিকে থাকার জন্য আমি কোমলজাতি নারীকে জমির ন্যায় শক্তি দান করেছি। আর বিপরীত লিঙ্গ পুরুষকে বানিয়েছি কৃষক।

মানব বংশ টিকিয়ে রাখার জন্য তাই কোন কোমলজাতির সাথে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হয়ে নিজের সকল যোগ্যতাকে তার প্রয়োজনে খাটাবে। তার সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পূর্ণ করতে কোন প্রকার অলসতা দেখাবে না ও আনন্দের সাথে তার সঙ্গদান করবে।

জাতিগত দিক থেকে নারীর মর্যাদা হচ্ছে তাকে পুরুষের জীবন সম্পদের সকল সংগৃহীত বস্তুসমূহের মূল লক্ষ্য হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। কার্যত এমনই হয় যে, পুরুষ বাহির থেকে উপার্জন করে অর্ধাঙ্গিনীর নিকট সবকিছু দিয়ে আপন আনন্দ উপভোগ করে। নারী-পুরুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ আর তোমরা তাদের পরিচ্ছেদ।"[৪৬]

অতএব, আমরা বলতে পারি যে, মর্যাদাপূর্ণ নারী জাতির আজকের ইতিহাস এক দিনের নয়। বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী জাতির অবস্থা যখন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিলো তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবতার মুক্তির দূত ও নারী জাতির সম্মানের পূনরুদ্ধারকারী হিসেবে রাসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে পাঠালেন বর্বর আরব জাতির নিকট যার ফলে নারী পেল তার সঠিক সম্মান ও মর্যাদা।[৪৭]

তথ্যসূত্র

১। মমতাজ দৌলতানা, *ধর্ম ও নারীর অধিকার*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৭

২। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল: ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৯-১০
৩। আবদুল খালেক, *নারী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইফাবা প্রকাশনা, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১-২
৪। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৫। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১২
৬। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৭। আলহাজ্ব এস.এম. আখতার হোসেন, *ইসলামে নারীর অধিকার*, বাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল: ১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ৫
৮। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৬
৯। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৪
১০। ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, প্রকাশক: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, নিয়াজ মন্‌জিল জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: আগস্ট ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৯-১৩
১১। আলহাজ্ব এস.এম. আখতার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১২। ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪
১৩। আলহাজ্ব এস.এম. আখতার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৪। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭
১৫। ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬
১৬। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪
১৭। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯
১৮। ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭
১৯। ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯
২০। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬
২১। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫
২২। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৮
২৩। ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
২৪। আল-কুরআন, ২: ৩৩-৩৬
২৫। আল-কুরআন, ২: ৩৩-৩৬
২৬। আল-কুরআন, ২: ১৮৭
২৭। আল-কুরআন, ২: ২২৮
২৮। আল-কুরআন, ৪: ৩২
২৯। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২৬
৩০। আল-কুরআন, ২: ৩৬
৩১। আল-কুরআন, ৭: ২০
৩২। আল-কুরআন, ৭: ২৩
৩৩। আল-কুরআন, ১৬: ৯৭
৩৪। আল-কুরআন, ৩৩: ৩৫
৩৫। আল-কুরআন, ১৬: ৫৮-৫৯
৩৬। আল-কুরআন, ৮১: ৯
৩৭। আল-কুরআন, ৬: ১৪০
৩৮। আল-কুরআন, ৩০: ২১

৩৯। আল-কুরআন, ৪৬: ১৫
৪০। আল-কুরআন, ২: ২২৮
৪১। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-২১
৪২। আল-কুরআন, ২: ২৮২
৪৩। ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৪৪। আল-কুরআন, ৩: ১৪
৪৫। আল-কুরআন, ২: ২২৩
৪৬। আল-কুরআন, ২: ১৮৭
৪৭। আব্দুস সামাদ রাহমানী, অনুবাদ: মুফতী মুঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, *নারী মুক্তি কোন পথে*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০০০ খ্রি. পৃ. ১৫-১৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন যুগের অবহেলিত নারী জাতি বর্তমান সময়ে এসে কিছুটা উন্নতি ও সম্মানের মুখ দেখতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী নেতৃত্ব ও নারীদের অবস্থান দেখে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি। যা কিনা অবহেলিত নারী জাতির কষ্টার্জিত অর্জন। নারী এখন সর্বক্ষেত্রে সফলতা দেখাতে শুরু করেছে। তারা প্রমাণ করেছে সুযোগ দিলে তারাও নিজেকে যোগ্য, দক্ষ ও আদর্শরূপে গড়ে তুলে জাতিকে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তারই উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরুপ।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান

নারীর মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ফরাসী রাজসভার এক নারী সদস্য ক্রিস্টিন দ্য পিজান। ১৪০৫ সালে তিনি একটি বই লেখেন, যার নাম বাংলা করলে দাড়াবে 'নাগরিক নারীদের গ্রন্থ'। তিনিই প্রথম নারীর অবমাননাকর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে লেখেন। [১]

সংগঠিতভাবে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ প্রথম তার অধঃস্তন অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সতেরো শতকে। সেই সময় দাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনে নারী সমাজের উপলব্ধি হল নারীর অধঃস্তনতা দূর করাকে এই আন্দোলন কর্মসূচী করে নেবার।

সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে নারীর মৌলিক অধিকারের দাবি উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে ছিল নারীর রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার, সন্তানের উপর আইনগত দাবি, ভোটাধিকারের দাবি।

বৃটেনে ম্যারি ওয়েলস্টোন ক্রাফট ১৯৭২ সালে 'এ ভিনডিকেশন অব দি রাইটস্ অব উইমেন' নামে একটি বই লেখেন। তাঁর গ্রন্থটিকে নারী আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো হিসেবে দেখা হয়। ইউরোপীয় নারী প্রতিবাদে তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন নারীর রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার দাবি করে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকটায় পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনকারীরা এসব অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। [২]

মূলত উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে শ্রমজীবি নারীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দুইশত বছর আগে শিল্প বিপ্লবের পর নারীদের কারখানা শ্রমিক হিসেবে প্রথম দেখা গিয়েছে। নারী শ্রমিকরা কোন দিক দিয়েই পুরুষ শ্রমিকের সম অধিকার লাভ করেনি। আমেরিকা, ইংল্যান্ডে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন কলকারখানায় অমানবিক কাজের পরিবেশ, বেতনের বৈষম্য এবং নানা ধরণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছিল।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরের সূঁচ কারখানার নারী শ্রমিকরা অমানবিক কাজের পরিবেশ, নিম্ন মজুরী এবং দৈনিক বারো ঘন্টা কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মিছিল বের করে। পুলিশ তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে অনেক নারী শ্রমিক আহত হন এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নারী শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব একটি ইউনিয়ন গঠন করতে সক্ষম হন। তাদের আন্দোলন এতে আরো ব্যাপকতা লাভ করে। সমানাধিকার এবং কাজের পরিবেশ উন্নতির লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের আন্দোলন এরপর থেকে স্বীকৃতি পায়।[৩]

বিশ শতকের প্রথম দিকে নারী শ্রমিকরা আরো সংগঠিত ভাবে আন্দোলন শুরু করে। ১৯০৯ এবং ১৯১২ সালে দুটি বড় নারী শ্রমিক ধর্মঘট তার প্রমাণ। বিশ্ব শিল্প শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে সংগঠিত ধর্মঘটে বিশ হাজারেরও বেশি নারী শ্রমিক অংশ নেয়। এই ধর্মঘটের আয়োজনে পুরুষ শ্রমিকদের সহায়তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নারী শ্রমিকদের হাতে নেতৃত্বের ভার চলে আসে। ১৯১২ সালে ২৩ হাজার গার্মেন্টস শ্রমিকদের ধর্মঘট যুক্তরাষ্ট্রের লরেন্সে তীব্ররূপ ধারণ করে। পঁচিশটি দেশ থেকে আগত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই দুইটি বৃহৎ শ্রমিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত নারী আন্দোলনে রূপ নেয়। কারণ সমাজের সর্বস্তরের মহিলারা এদের সমর্থনে এগিয়ে আসে।[৪]

১৯০৭ সালে জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা সেৎকিন সমগ্র ইউরোপের শ্রমজীবি নারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং জাতি, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে নারী ও পুরুষের ভোটের দাবি তোলেন।[৫]

১৯০৮ সালের ৮ ই মার্চ নিউইয়র্ক শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে নারী শ্রমিকরা। তাদের দাবি ছিল কাজের সময় কমানো, কর্ম পরিবেশের উন্নতি, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন এবং ভোটাধিকার। এই সকল ঘটনার ফলশ্রুতিতে নারীদের বিভিন্নমুখী প্রতিবাদী ভূমিকার প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশ, সমর্থন দান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরীর প্রতীক হিসেবে একটি দিনকে চিহ্নিত করার উপলব্ধি জন্মে। নারী আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে জড়িত ৮ মার্চ। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে ক্লারা সেৎকিনের প্রস্তাব অনুসারে ৮ মার্চ কে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনের রেজ্যুলেশনে নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

১৯৪৯ সালে সিমোন দ্য বোভায়ারের 'দি সেকেন্ড সেক্স নামক গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ষাটের দশকে মার্কিন নারী মুক্তির আন্দোলনে এবং তার এক দশক পর ইউরোপীয় নারীদের আন্দোলনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল।[৬]

মেরী ওলস্টোনকাকট (১৭৫৯-৯৭) তার বিখ্যাত ভিন্ডিকেসান অব দি রাইটস অব উইম্যান (১৯৭২) গ্রন্থে নারীদের জন্য শিক্ষা এবং স্বাধীনতার সমানাধিকারের দাবি তুলেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বললেন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং সম্ভ্রম দেখা দেবে।

ঐ সময় থেকেই নারীদের জন্য প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি সম্পর্কে অনেক বিরোধিতা দেখা গেছে। ১৮৯০ সালে নিউজিল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হল। বিশ্বে নারীদের ভোটাধিকার এটাই প্রথম। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৪ সালে, নরওয়েতে ১৯১৩ সালে, ক্যানাডা এবং সোভিয়েত দেশে ১৯১৭ সালে নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হল। পোল্যান্ড ১৯১৮ সালে, জার্মানী, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ১৯১৯ সালে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯২০ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়। বৃটেনে এই অধিকার দেওয়া হয় ১৯২৮ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই অধিকার আরো ত্বরান্বিত হতে থাকে। তারপর ফ্রান্স, গ্রীস এবং ইতালী এই অধিকার স্বীকার করে নেয়। সুইজারল্যান্ড এবং পর্তূগাল যথাক্রমে ১৯৭১ এবং ১৯৭৬ সালে নারীদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করে নেয়। লাতিন আমেরিকায় প্রথম ইকুয়েডর ১৯২৯ সালে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার দেয়। এরপর ব্রাজিল এ ১৯৩২ সালে এবং কিউবায় ১৯৩৪ সালে এই অধিকার স্বীকৃত হয়। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত।[৭]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপসহ অন্যান্য দেশসমূহে নারী সমাজ ভোটাধিকার অর্জন করে। নারীর ভোটাধিকার নয়, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি যে বেশি গুরুত্বর্পূণ, সে কথা বিখ্যাত ফেমিনিষ্ঠ, ঔপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তার 'এ রুম অব ওয়ানস ওন, গ্রন্থে লিখেছেন। তাঁর লেখনী নারী আন্দোলনের পথকে এগিয়ে দিয়েছে।

নারী আন্দোলন ব্যাপকভাবে এগিয়ে দিয়েছে জাতিসংঘ। ১৯৪৫ সালে স্বাক্ষরিত জাতিসংঘ সনদে প্রথম নারী অধিকার স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪৭ এ গঠিত হয় জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কমিশন। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণা, আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ৮ই মার্চকে স্বীকৃতি প্রদান, ১৯৭৬-১৯৮৫ পর্যন্ত নারী দশক ঘোষণা, ১৯৭৯ সালে 'নারীর প্রতি সকল বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন' গৃহীত হওয়া ছিল নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বৈশ্বিক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার সোপান।

উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকটি জাতীয় আন্তর্জাতিক মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই সব সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার আদায় করা এবং শ্রমজীবি মহিলাদের অধিকার আদায় করা। বিংশ শতাব্দী থেকে ব্যাপক কর্মসূচিভিত্তিক নারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। নারী শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার

দাবী, নারীর ভোটাধিকার দাবীর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্বে নারী সমাজের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ক্রমে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারণ হচ্ছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজসিংহাসনে নারী পুরুষ বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন থেকে রাজা বা রাণীর বড় ছেলেই শুধু নয় প্রথম সন্তান মেয়ে হলেও পরে জন্ম নেওয়া ভাইয়ের বদলে সে-ই রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে। অস্ট্রেলিয়ার শার্সে আয়োজিত Commonwealth সম্মেলনে নেতারা ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের বিধিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন অনুমোদন করেছেন। ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নারী পুরুষের সম অধিকারের পাশাপাশি পূর্বের রাজা বা রাণীর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাউকে বিয়ে করার ওপরও যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।[৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন দেশে নারীর অবস্থান

শ্রীলংকার Srimavo Bandaranaike বিশ্বের প্রথম সরকার প্রধান, রাজনীতিতে তার আগমন স্বামী Soloman Dias Bandaranaike এর মৃত্যুর পর। Solomon Dias Bandaranaike ছিলেন Srilanka এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৯)। পূর্বে Srimavo Bandaranaike এর কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না।

বাবা মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং যার স্বামী ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সেই সূত্র পরিক্রমায় Chandrika Bandaranaike Kumaratunga শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ১৯৯৪ সালে। Benazir Bhutto ১৯৮৮ সনে ও ১৯৯৩ সনে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতির ধারা অনুযায়ী বেনজীর ভূট্টোর রাজনীতিতে আগমন বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পথ ধরে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কন্যা Indira Gandhi ১৯৬৬-১৯৭৭, ১৯৮০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এক্ষেত্রে পিতার ইমেজ কাজ করলেও ইন্দিরাগান্ধীর নিজের ছিলো রাজনৈতিক ব্যক্তি সত্তা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার আগেই তার রাজনৈতিক পরিপক্কতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ এ তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৯-১৯৬০ সাল এ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। তার রাজনীতিতে আগমন পিতার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পিতার শাসনামলে পিতার উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব Benigno S.Aquino ১৯৮৩ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর তার স্ত্রী Corazon Aquino পার্টিপ্রধান হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৮৬ তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে কোরাজনের নেতৃত্বে যে অহিংস আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলশ্রুতিতে মার্কোস ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে কোরাজন ৫ বৎসর ফিলিপাইনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Aung Sun Suukyi বার্মার অবিসংবাদিত নেত্রী। বার্মার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেন। কিন্তু সামরিক শাসক তাকে গৃহবন্দী রাখেন ৬ বছর। সুকীর পিতা ছিলেন বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা Aung Sun. স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার তাগিদে Golda Meir এর রাজনীতিতে আগমন। ১৯৪৯ -১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পদাধিকার বলে তিনি ইসরাইলের শ্রমমন্ত্রী। ১৯৫৬-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত লেবার পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। এবং ১৯৬৯-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Peron Isabelita ১৯৭৪ সালে তার স্বামী জুয়ান ডোমিংগো পেরনের (আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট) মৃত্যুর পর আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হন।

আয়রণ লেডি নামে খ্যাত Margaret Hilda Thatcher নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের গুণে বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে কনজারভেটিভ পার্টি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুদীর্ঘ ১১ বৎসর।

১৯৯০ সালে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী Suleyman Demirel এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে Tansu ciller রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি ১৯৯০ সালেই তুরস্কের Centre right True Path পার্টির সদস্য হন এবং ৯১ সালে ডেমিরিল সরকারে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের পর এই পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। টেনসুসিলার হন প্রধানমন্ত্রী এবং ডেমিরিল হন রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুজনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন উত্তরাধিকার সূত্রে। শেখ হাসিনা ইডেন কলেজে ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে যে ধারা পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পরিস্থিতির কারণে, সময়ের দাবীতে কিংবা পারিবারিক রাজনৈতিক ঐক্যের সূত্র ধরে রাজনীতির

সঙ্গে নারীর যোগসূত্র, সে রকম কোন ধারা উন্নত বিশ্বে দেখা যায় না। উন্নত বিশ্বে রাজনীতিতে নারী আসে গণতান্ত্রিক মত ও পথের প্রতি আস্থা রেখে, নিজস্ব রাজনৈতিক মূল্যবোধ থেকে।
বিশ্বের রাজনীতির ধারা পরিবর্তন হচ্ছে। জনগণ আজ রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত হতে হবে পুরুষের পথ অনুসরণ করে নয়, নিজস্ব রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার গুণে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থান করে নিতে হবে। নারী ও রাজনীতি আলাদা বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়।
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের অংশ গ্রহণ, সম অধিকার, সম দায়-দায়িত্ব ও সম সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করে কর্মক্ষেত্রে বিশ্বের সকল নারীর কাছে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। [৯]
দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্বের শতকরা হার
নেপাল-৩৩.২ % [৫৯৪:১৯৭]
আফগানিস্তান-২৭.৭% এবং ২১.৬% [২৮২:৬৭ এবং ১০২:২২]
পাকিস্তান-২২.৫% এবং ১৭.০% [৩৩৮:৭৬ এবং ১০০:১৭]
বাংলাদেশ-১৮.৬% [৩৪০:৬৪]
ভারত-১১% [৫৪৩:৫৮]
ভুটান-৮.৬% এবং ২৪% [৪৭:৫ এবং ২৬:৬]
মালদ্বীপ-৬.৫% [১৭৭:৫]
শ্রীলঙ্কা-৫.৮% [২২৫: ১৩]

এ ছকটিতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়, যেখানে সংসদে ৩৩% পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে, যেমন, নেপাল। এই দেশটি ১৯৯৫ সালের বেইজিং বিশ্ব সম্মেলনের টার্গেট পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। আফগানিস্তানের মতো দেশে ২৭% নারীর অংশগ্রহণ দেখা যায়। বর্তমানে প্রায় ১৭ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের ভূমিকায় নারীকে দেখা যায়। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে সরকার ও বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে নারীরা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, সামগ্রিকতার বিচারে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক হিসেবে বিবেচিত হলেও এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি এখনও পূরণ হয়নি। দলপ্রধান ও সরকারপ্রধান নারী হওয়ার পরও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতিতে নারীর মূল্যায়ন পদ্ধতিতে তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা সততা এবং সাহসিকতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।
ভারতে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় মোট প্রতিনিধি ৫৪৫ জনের মধ্যে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি ৫৯ জন, যা শতকরা হিসাবে ১১ ভাগ। লোকসভায় স্পিকার নারী। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসনে বিল এখনও পাস হয়নি। প্রতিনিধিদের জন্য ৫০% পর্যন্ত আসন সংরক্ষণের আইন পাস করা হয়েছে।
পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ ন্যাশনাল এসেম্বলিতে ৩৪২ আসনের ৬০ টি সংরক্ষিত নারী আসন, এর মধ্যে ১৩ জন সরাসরি নির্বাচিত হন। উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সিনেটে ১০ জনের মধ্যে ১৭ জন নারী।
নেপালে ৫৯৪ জনের মধ্যে ১৯৭ জন নারী। কিন্তু মালদ্বীপে ৫০ জন পার্লামেন্ট সদস্যের মধ্যে মাত্র চারজন নারী।
আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নারী সদস্য রয়েছেন ৬৭ জন, যেখানে মোট সদস্য ২৪২ জন। আবার উচ্চ কক্ষে রয়েছেন ২২ জন নারী, মোট সদস্য ১০২ জন। অর্থাৎ নারীর সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ প্রায়।

২০০৮ সাল ভুটানের জনগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই প্রথম এখানে রাজতন্ত্রের বাইরে গণতান্ত্রিক ভাবে সরকার নির্বাচিত হন দেশ পরিচালনার জন্য। সেখানে ৪৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে চারজন নারী।

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে তুলনামূলকভাবে নারীর অংশগ্রহণ কম। ২২৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১২ জন নারী। তা সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার সংবিধান নারীর আইনগত, রাজনৈতিক এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে অনেক ইতিবাচক অগ্রসর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[১০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর সমস্যা ও আইনী অধিকার

জাতিসংঘ গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এর অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালে দেশে দেশে নারীর অবস্থান বিবেচনার জন্য ১৫টি দেশের সরকারী নারী প্রতিনিধিদের সভা অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কের লেক সাক্সেসে। এটি CSW 'র প্রথম সভা। জাতি সংঘের যে ইউনিট এই সভায় সহযোগিতা করে পরবর্তী সময়ে সেটি ডিভিশন অব উইমেন অ্যাডভান্সমেন্ট [DAW] হিসেবে সংগঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, যাত্রার শুরু থেকেই ECOSOC সদস্যভুক্ত বেসরকারী নারী সংগঠন সমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে CSW 'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ পর্বে নারী-পুরুষের বৈষ্যমের আইনগত দিকগুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা ও বিশ্বব্যাপী নারীর সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ প্রণয়নে CSW বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই সনদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানব সন্তানকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করার ফলে নারী সমাজ সমগ্র মানব সমাজের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

এই সময়কালে নারী রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিকত্ব, বিবাহের ক্ষেত্রে নারী অধিকার ও শ্রমিক নারীর অধিকার নিয়ে একক এবং যৌথ উদ্যোগে ধারাবাহিক কমিশন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল কমিশনের মাধ্যমে নারীর জীবনের সমস্যা আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। এই সকল সভার আলোচনার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ও ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের অনুরোধে ১৯৬৭ সালে প্রণীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ সিডও [CEADOW]। সংশ্লিষ্ট সকল দেশের জন্য এই সনদ হলো আইনগত দায়বদ্ধতা। ১৯৯৯ সালে CEDOW Optional Porotocal ঘোষণার ফলে বৈষম্যের শিকার নারীর জীবনে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ বিস্তৃত হয়। নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের [CSW] পঁচিশতম বার্ষিকী ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয় ১৯৭২ সালে। নারীবর্ষে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন। নারী দশকে আরও দুটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। সম্মেলনসমূহে নারীর অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব নারী আন্দোলনের শক্তি অর্জনের ফলে জাতিসংঘে নারী আন্দোলনের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়। বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে জাতিসংঘগঠন করে নারী উন্নয়ন তহবিল [UNIFEM] এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত কমিটি [INSTRAW]।

নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তাদের অগ্রগতির লক্ষ্যে জাতিসংঘে সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে নারীর সমস্যা কেবলমাত্র নারীর সমস্যা নয়, জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একই সঙ্গে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই সকল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের ২০ তম অধিবেশনে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৯৯৩-৯৪ বর্ষে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ ও প্রভাব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়।

১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় বেইজিং ঘোষণা। সম্মেলনের পর এই ঘোষণা পরীবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘ CSW কে দায়িত্ব প্রদান করে ও ECOSOC'র পরামর্শক হিসেবে অনুমোদন করে। একই সঙ্গে জাতিসংঘ সচিবালয়ে জেন্ডার সমতার উন্নয়নের জন্য একজন বিশেষ পরামর্শক নিযুক্ত করা হয়। এই দপ্তরটি জেন্ডার ইস্যু আলোচনার জন্য বিশেষ অফিস [OSAGI] হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

নারী বিষয়ক জাতিসংঘের সকল দপ্তরকে [DAW, INSTRAM, OSAGI, UNIFEM] একীভূত করে ২০১১ সালে গঠিত হয় ইউএন উইমেন [UNWOMEN]। বর্তমানে এটি নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের [CSW] দপ্তর হিসেবে কার্য পরিচালনা করে আসছে।

নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন ৬০ তম অধিবেশন

নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের ৬০ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালের ১৪ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত। এবারের অধিবেশনের মূল ধারণাপত্র [Theme] ছিল: নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থায়ী উন্নয়নের সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন। ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'Women's Empowerment and its link to sustainable Development' মূল ধারণাকে কেন্দ্র থেকে আলোচনা হয়েছে তিনটি বিষয়:

* নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকররণ [Elimination of VAWG]
* প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা [Institutional mechanism]
* কাউকে পিছনে ফেলে না রাখা [No one is left behind]

কমিশনের আলোচনার ধারা বিবেচনায় কর্মসূচি সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

* কমিশনের উদ্যোগে কর্মসূচি সমূহ।
* বেসরকারি সংগঠন সমূহের আলোচনা।

কমিশনের উদ্যোগে কর্মসূচি

এই কর্মসূচির অধীনে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

* পরামর্শ সভা।
* বেসরকারি সংগঠন সমূহের সঙ্গে আলোচনা।
* বিশেষ বিষয়ে আলোচনা।
* অ্যাডভোকেসি প্রশিক্ষণ।
* আঞ্চলিক দল গঠন।
* উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশন।
* আঞ্চলিক বেসরকারি সংগঠনসমূহের পরিচালনা কমিটির সভা।

২. বেসরকারি সংগঠন সমূহের কর্মসূচির জন্য ৫৫০ টি আবেদনের মধ্যে ৪৫০ টি বাছাই করা হয়। এগার দিনের অধিবেশনে প্রতিদিন একাধিক বেসরকারি সংগঠনসমূহ একই সময়ে অর্থাৎ অধিবেশনের ১১ দিনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে আলোচনার আয়োজন করে ৪৫০ টি সভা করে। এসব সভায় সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় পর্যায়ের সমস্যাসমূহ উত্থাপিত হয়। এই সকল আলোচনার মূল বিষয়গুলো ছিল:

* নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ
* নারীর প্রতি সহিংসতা
* শান্তি, নিরাপত্তা ও মানব পাচার
* সুশীল সমাজের ভূমিকা
* নারীর মানবাধিকার আন্দোলন
* নারীর স্বাস্থ্য ও যৌন কর্মীর অধিকার
* পরিবেশ
* তরুণী নারীর সংকট ও আন্দোলন

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এবারের অধিবেশনে তরুণী নারীদের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তরুণীদের কাজের পরিবেশ, সংকট এবং সেগুলো সমাধানে তরুণীদের ভাবনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে রক্ষণশীল সমাজের এবং যুদ্ধাক্রান্ত দেশসমূহের তরুণীরা বলিষ্ঠভাবে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের পেশাজীবি সংগঠন, যেমন, আইন পেশার নারী সংগঠন, নারী চিকিৎসক সংগঠন বেশ অনেক গুলো সভার আয়োজন করেন। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধাক্রান্ত দেশসমূহের নারীরা যুদ্ধের সামাজিক প্রভাব এবং সেখানে নারীদের সংগঠিত প্রতিরোধের বিষয়ও বর্ণনা করেন বেশ কয়েকটি অধিবেশনে।

CSW ৬০ তম অধিবেশনে আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায়। এর পাশাপাশি সামাজিক প্রেক্ষাপট, আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি নারী আন্দোলনের অর্জনকে স্থায়ী করতে পারছে না। জাতীয় ক্ষেত্রে সরকারসমূহের দায়বদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। তারপর সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনে যেমন আছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তেমন আছে নারীর সমস্যার সামঞ্জস্য। আর নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনের মান উন্নয়নের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলন একটি সামাজিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। আর নারী আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে সকল স্তরের, বয়সের, পেশার নারী।

আলোচ্য বিষয় দুটি ছিল

* জননী, ভগিনী এবং কন্যা: যে ধরণের সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছে।
* কোনো নারীকে পিছনে ফেলে না রেখে ২০৩০ সালের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও সংকট।

দুটি আলোচনাই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে ২০৩০-এ আমরা এমন এক বিশ্ব গড়তে চাই যেখানে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্ব থাকবে সমান। এক কথায় ৫০:৫০ এর গ্রহ। [Planet of 50:50]।

নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের ৬০ তম অধিবেশনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে এবং সভায় অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সরকারি প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের ঐকমত্যের প্রেক্ষিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকার। বেসরকারি সংগঠনসমূহ অর্থাৎ নারী আন্দোলনের দায়িত্ব হল এই প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন, পরীবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা। নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে।

নারীর মর্যাদা বিষয়ে কমিশনের ৬০ তম সভার কয়েকটি সিদ্ধান্ত

* প্রচলিত নীতি ও আইনের ধারাসমূহ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী করা।
* নারীর সমতা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।
* শক্তিশালী নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সমঅংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থায়ী উন্নয়ন গড়ে তোলা।
* নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সেগুলো ব্যবহারের জন্য পর্যালোচনা পদ্ধতি গড়ে তোলা।
* নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি করা।

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে একটি সমতাপূর্ণ বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর প্রতি মর্যাদা বিষয়ক কমিশন ছয় দশকের অধিক সময় ধরে কাজ করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী আন্দোলন এই প্রচেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করেছে। একই ভাবে নিজেদের দেশের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন তার ভাষণে বলেছেন, খুব নিকট ভবিষ্যতে জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে একজন নারীকে তিনি দেখতে পাবেন বলে বিশ্বাস করেন। তবে সেই নারীকে অবশ্যই হতে হবে নারী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নারীর প্রতি সংবেদনশীল।

সুতরাং ৬০ তম অধিবেশনের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, সকলকে সঙ্গে নিয়ে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্বের বিশ্ব গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ পৃথিবী।[১১]

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত (১৯৯৩-এর ডিসেম্বর) নারী নির্যাতন বিষয়ক ঘোষণার (Declaration on VAW) আলোকে ১৯৭৯-৮১ সালে গৃহীত ও ঘোষিত (UNCEDAW) সিডও সনদের নীতি ও ভাবধারায় ১৯৯৩ তথা বিশ্বমানবাধিকার আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকারের নীতিমালা ও আদর্শগত চেতনা ও ধারার অনুসরণ করে।[১২]

১৯৯৩-এর ২০ শে ডিসেম্বর নারীর প্রতি বিরাজমান নিষ্ঠুর আচরণ ও সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধের ঘোষণা আসে, ৫টি ধারায় সমন্বিত করে সংক্ষেপে নারী নির্যাতন বিষয়ক ঘোষণা-ঘোষণা করা হয়; অত্যন্ত সংক্ষেপে এর সারসংক্ষেপ যুক্ত করা হলো:

ধারা এক (১): এই ঘোষণা মতে নারী নির্যাতন বলতে বুঝাবে সেই ধরণের জেন্ডারভিত্তিক সহিংস আচরণ যাতে নারীর শারীরিক, মানসিক, মনঃস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ও দুঃখ কষ্টের কারণ হবে এবং যাতে কোনো নারীর ব্যক্তিগত ও বাইরের জীবনে নিষ্ঠুরভাবে ও নির্যাতনমূলকভাবে কোনো নারীর স্বাধীনতায় আঘাত ও বাধা সৃষ্টি করে।

ধারা দুই (২): নারী নির্যাতনের ঘটনা, মাত্রা ও ক্ষেত্র বা পরিধি সর্বত্র হবে তবে বিশেষভাবে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে যুক্ত হবে।

২(ক): পরিবারে, সংগঠিত শারীরিক, যৌন ও লিঙ্গীয় ও মনঃস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, নিপীড়ন। যেমন, দৈহিক ভাবে মারধর, পরিবারের মাঝে কন্যাশিশুকে যৌন হয়রানী, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, মেরিটাল ধর্ষণ Female genital mutilation (FGM) যৌনাঙ্গ কর্তন, বিবাহিত নারীর প্রতি বিভিন্ন ক্ষতিকর ঐতিহ্যিক আচরণ, দাম্পত্য জীবন বহিঃর্ভুত নির্যাতন, শোষণের সাথে জড়িত নানামুখি নির্যাতনসমূহ যুক্ত হবে।

ধারা তিন (৩): নারীরা পুরুষের মতো সমভাবে সকল প্রকার মৌলিক সার্বজনীন মানবাধিকার অর্জন ও ভোগ করবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক তথা সকল প্রকার অধিকার ভোগ করবে। এই অধিকারগুলো:

ক) জীবনের অধিকার The Right to live

খ) সমতার অধিকার The Right to Equality

গ) স্বাধীনতার অধিকার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার The Right to liberty and Security of Person.

ঘ) আইনের দৃষ্টিতে সমনিরাপত্তা ও অধিকার পাওয়া The Right to liberty equal protection under the law.

ঙ) সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার The Right to free from all forms of discrimination.

চ) সর্বাধিক সর্বোচ্চ মাত্রায় অর্জনযোগ্য উন্নয়ন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে The Right to highest standard attainable of physical and mental health.

ছ) ন্যায্য ও সহায়ক কর্ম-পরিবেশের অধিকার The Right to just and favorable condition of work.

জ) কোন প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ, সভ্য-ভব্যতাহীন নিম্নরুচির আচরণ না পাওয়ার অধিকার, সকল প্রকার নিষ্ঠুরতামুক্ত আচরণ পাওয়ার অধিকার সকল নারীরই থাকবে The Right not to be subject to torture or other cruel inhuman or degrading treatment and punishment.

ধারা চার (৪): রাষ্ট্র নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংস আচরণের ও নির্যাতনের নিন্দা জানাবে এবং প্রথা, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় কারণে শাস্তি প্রদানের কোনো প্রক্রিয়া যুক্ত হবে না বা ভূমিকা রাখবে না যা নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করবে।

রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিলোপ নীতিমালা গ্রহণ করবে এবং নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখবে। যেমন,

ক) জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদ অনুমোদিত হয়নি অথবা সনদে কোনো ধারায় সংরক্ষণ থাকলে তা প্রত্যাহার করা তথা পূর্ণ অনুমোদন করা।

খ) রাষ্ট্র সকল প্রকার নারী নির্যাতন থেকে বিরত থাকবে।

গ) রাষ্ট্র বা ব্যক্তি, যে বা যার দ্বারাই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটুক না কেন, নারী নির্যাতনের ঘটনার মূল কারণ বা সূত্র বের করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে এবং জাতীয় আইনে তার প্রতিকার প্রতিরোধ করতে হবে, নির্মূল করতে হবে।

ঘ) নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তা প্রদান ও তাদের জীবন ও অধিকার/মানবাধিকার রক্ষায় অর্জনের জন্য পেনাল (Penal Civil; Labour and administration) ফৌজদারী দেওয়ানী নাগরিক আইন প্রশাসনিক নীতিমালা নতুন করে প্রনয়ন করা/করতে হবে। নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তা বিধান করে আইনের সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ ও সহায়ক ব্যবস্থা করা, জাতীয় আইনের সহায়তা করতে হবে। যেমন, ক্ষতির শিকার হয় এমনএকজন নির্যাতনের শিকার নারী তার কার্যকর সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রকে নারীদের তাদের বিদ্যমান অধিকার ও সুযোগ সম্পর্কে অবগত করতে হবে।

ঙ) For to promote and protect-নারীর অধিকার বিশেষ করে মূলত নির্যাতনের শিকার নারীর অধিকার অর্জন ও রক্ষার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্ম কার্য পরিকল্পনা নিতে হবে। ইতিমধ্যেই যেসব জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সেগুলির সঙ্গে বাস্তব চাহিদার নিরীখে আরো নতুন পরিকল্পনা নেওয়া এবং কর্ম-পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবায়ন করা এবং বেসরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সহায়তা শেষে রাষ্ট্র বিশেষ করে যে সংগঠন নারী নির্যাতন প্রতিরোধের কাজ করছে।

চ) সকল প্রকার নারী নির্যাতনের উৎস বা সূত্র বন্ধ করতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য/নির্মূলের জন্য সমন্বিত সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমন্বিত পথ পরিক্রমা প্রক্রিয়া তৈরী করতে হবে/ প্রণয়ন করতে হবে। কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা দরকার যে নির্যাতনের শিকার নারী যেন পুনরায় আইন সহায়তা পাওয়ার, বিচার পাওয়ার সময়ে বা ঐ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে প্রচলিত বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থার কোনো পদ্ধতি বা নীতির জন্য যেন পুনরায় একই অবস্থার শিকার না হয়, ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আইনের প্রয়োগ মানবাধিকার আইন রক্ষায় সকল প্রকার সহায়তাকালীন পর্বে এসব বিষয় লক্ষ রেখে বাস্তবায়ন ও সহায়ক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করতে হবে।

ছ) এই গোটা প্রতিরোধ প্রতিকার সহায়তা কাজে যাতে নির্যাতনের শিকার নারীর ও শিশু সন্তানের যথাসম্ভব সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা, বিশেষ করে শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা, সহায়তা দেওয়া, শিশু সহায়তা দেওয়ার বা পাওয়ার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা, প্রয়োজনে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া (বিশেষ করে আরো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত কেন্দ্রে) বিভিন্নমূখী, বিভিন্নধর্মী সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা, নির্যাতনের শিকার নারীদের নিরাপত্তা এবং শারীরিক, মানসিক পুনর্বাসনের জন্য।

জ) জাতীয় বাজেটে অর্থ সম্পদ বরাদ্দ রাখতে হবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড, নির্যাতন নির্মূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার জন্য, সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য।

ঝ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী (পুলিশ বাহিনী/নিরাপত্তাকর্মী), জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জেন্ডার সংবেদনশীল মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অধিকতর নারীর মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলার রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কর্মসূচি নিতে হবে।

ঞ) সমাজে বিরাজমান নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য এবং নারীর প্রতি যে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিহীন নীচ মনোভাব সম্পন্ন সংস্কৃতি, নিষ্ঠা, ঐতিহ্যিক মনোভাব ও মনঃস্তত্ত্ব যুগ যুগ চর্চা হচ্ছে তা থেকে গোটা সমাজ মনঃস্তত্ত্বকে পরিবর্তন, রাষ্ট্র ও সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা পাঠ্যসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিবর্তন ও সংস্কার করা, যে শিক্ষা লিঙ্গীয় বৈষম্য দূর করতে এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায়

সহায়ক ভূমিকা নেবে এবং যাতে নারী-পুরুষের অধঃস্তন, উর্ধ্বতন ভূমিকার ও সম্পর্কের অবসান ঘটাতে ভূমিকা নেবে।

ট) নারী নির্যাতন বিশেষ করে গৃহে নারী নির্যাতনের বিষয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা, গভীর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা কাজ করা এবং এই কাজে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া এবং কিভাবে নারী নির্যাতন বন্ধ করা যায় সেই সব সুপারিশ সম্বলিত গবেষণা সকলের জন্য প্রকাশ ও তা প্রচার করা।

ঠ) নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য তাদের অধিকার ও নিরাপত্তা সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

ড) জাতিসংঘ ঘোষিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তাতে কি ফলাফল দাঁড়াচ্ছে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ঢ) উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়ন কর্ম-প্রক্রিয়াকে যথাযথ ও পর্যাপ্তভাবে সহায়তা করার জন্য উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়া।

ন) বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারী আন্দোলনের ও নারী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে।

ত) নারী আন্দোলনের ও সহকারী সংগঠনের কাজকে অগ্রসর করা, সহায়তা দেওয়া এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে তাদের সহায়তা দেওয়া।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিশ্বের বরেণ্য কয়েকজন নারী

নোবেল বিজয়ী তিন মহীয়সী নারী

এলেন জনসন সারলিফ, লেমাহ্ গোবি, তাওয়াক্কাল কারমান এবারের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই তিন প্রতিভাময়ী নারী সমগ্র নারী সমাজ তথা সমগ্র বিশ্বকে করেছে গর্বিত। তাদের অসমান্য সাহস, দৃঢ় মনোবল, শান্তির জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার এবং বিশেষ করে শান্তির মাধ্যমে অহিংস প্রতিবাদ মানুষকে দিয়েছে এক নতুন চেতনা, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক নতুন হাতিয়ার।

সারলিফঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত লাইবেরীয়ায় প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার কাছে। সমগ্র লাইবেরীয়াতেই যুদ্ধের করালরূপ। মানুষের খাবারের জন্য চারদিকে হাহাকার। তখন এই সারলিফের নেতৃত্ব আর লেখনীর জোরই এনে দিয়েছে কোটি কোটি ডলার অনুদান আর ঋণ হিসেবে।

শুরু করলেন লাইবেরীয়ার পুনর্গঠন, আমূল সংস্কার। গুরুত্ব দিলেন নারী অধিকার সংরক্ষণের উপর। কঠোর মনোবল নিয়ে শুরু করলেন দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই। তাই তার নাম হলো লৌহমানবি।

সারলিফ কলেজ অব ওয়েস্ট আফ্রিকা থেকে অর্থনীতি ও হিসাব বিজ্ঞানে পড়াশুনা করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন ম্যাডিসন কলেজে হিসাব বিজ্ঞান এবং লোকপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭২-৭৩ সালে লাইবেরীয়ায় ফিরে এসে সহকারী অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। মতবিরোধ হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি লাইবেরীয়ান ব্যাংক ফর ডেভলপমেন্ট এ কাজ করেন। পরবর্তীতে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এই ছিল তার স্লোগান।

লেমাহ্ গোবি-নোবেল বিজেতা লেমাহ্ গোবি এক অনন্য সাধারণ আফ্রিকান নারী। যুদ্ধবিধ্বস্ত লাইবেরীয়া যখন এক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত যার একদিকে প্রেসিডেন্ট চার্লস টেলরের অনুগত সেনাবাহিনী অন্যদিকে বিদ্রোহী দল, তখন তিনি এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। তিনি সমগ্র লাইবেরীয়া থেকে দলেদলে মহিলাদের সংগ্রহ করলেন, তাদের সংঘবদ্ধ করলেন, দীক্ষা দিলেন বল 'আর নয় যুদ্ধ, চাই শান্তি'।

সমগ্র পৃথিবী অবাক হয়ে দেখল নারীদের এই শান্তি আন্দোলন। শান্তির প্রতীক সাদা পোশাক পরিহিত এই নারীদের দিয়ে গোবি শুরু করলেন, প্রার্থনা, অনশন আর পিকেটিং। গোবি-র প্রচেষ্টাই এনে দিল ১৪ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত লাইবেরীয়াতে যুদ্ধবিরতি। এটাই লেমাহ গোবি-র অসাধারণ কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিই নোবেল পুরস্কার। নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে, সেখানে এখন কমে গেছে নারীর প্রতি সহিংসতা আর নির্যাতন। গোবি বর্তমানে ঘানা ভিত্তিক 'উইমেন পীস এন্ড সিকিউরিটি নেটওর্য়াক' এর প্রধান হিসেবে কাজ করছেন। লাইবেরীয়ার মতো দেশে সারলিফ এবং গোবি এই দুই নারীর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি বিশ্বব্যাপী সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হবে।

তাওয়াক্কাল কারমান-তাওয়াক্কাল কারমান আরব বিশ্বের এক অনন্য নারী ব্যক্তিত্ব। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের নারীর প্রতি ধর্মান্ধ, কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও তাওয়াক্কাল একজন সাংবাদিক হতে পেরেছেন। নারীদের প্রতি নির্যাতন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নারীদের সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজের দুঃশাসন এবং নারীর প্রতি নিপীড়ন প্রতিহত করণের জন্য দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের আপন অন্তর্নিহিত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অধিকার আদায়ের কথা বলেছেন, গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছেন এটাই তাঁর অনন্য সাহসের

পরিচয়। তিনি বলেছেন, ইয়েমেনে শান্তির পথ ধরেই বিপ্লব আসবে। "স্বৈরশাসনের পরিবর্তে আসবে গণতান্ত্রিক শাসন আর আসবে শান্তি।"

নারীদের শান্তির এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার একান্ত প্রচেষ্টা। কারমানের এই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র ইয়েমেন থেকে দলে দলে নারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে স্বৈরশাসক গোষ্ঠি জঘন্য প্রচারণা চালিয়েছে। হেয় করার জন্য চরিত্রে কলঙ্কলেপন করেছে, তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। ইয়েমেনের এই নারী জাগরণ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা তারই অসাধারণ কৃতিত্ব। এরই স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি সারলিফ এবং গোবি-র সঙ্গে যৌথভাবে পেলেন শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার।[১৪]

বিভিন্ন দেশে নারীদের ক্ষমতায়ন

হিনা রাব্বানি

সম্প্রতি বেশ কিছু দেশে নারীরা উচ্চপদ লাভ করে দেশ শাসনের এক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। উল্লেখ করতে হয় হিনা রাব্বানির কথা। হিনা রাব্বানি পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্তি পেয়েছেন। গত ২০ জুলাই তিনি পাকিস্তানের পূর্ণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী এক বিবৃতিতে জাতীয় জীবনের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে হিনা রাব্বানিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন। এই নিয়োগ পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ফাতিমাত বিয়ানা সাঈদ

নারীদের জন্য আর একটি হলো সার্কের মহাসচিব হিসাবে মালদ্বীপের ফাতিমাত বিয়ানা সাঈদ নির্বাচিত হয়েছেন। ফাতিমাত বিয়ানা সাঈদ সার্কের প্রথম মহিলা মহাসচিব হিসাবে গত ২০১১ এর মার্চে যোগদান করেন। সার্কের মহাসচিব হিসাবে যোগদান করার আগে তিনি মালদ্বীপ সরকারের দক্ষিণ এশীয় দূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আইনের পুনর্গঠন, মানবাধিকার ও জেন্ডার ইস্যুসহ মালদ্বীপে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সংহত করার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন।[১৫]

২০১১ সালে বিশ্ব পরিমন্ডলে নারীর সাফল্য

* থাইল্যান্ডের মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইংল্যাক সিনাওয়াত্রা;
* ডেনমার্কের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন এ্যালি থর্নিং;
* শান্তিতে নোবেল পেলেন তিন নারী অ্যালেন জনসন সারলিফ, (লাইবেরীয়া) তাওয়াক্কুল কারমান (ইয়ামেন) ও লেইমেহ বোয়ি (লাইবেরীয়া);

* সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান-এ দু'টি দেশের পার্লামেন্টের স্পীকার মনোনীত হয়েছেন দুজন মহিলা। তারা হলেন মীরা কুমার (ভারত), ফাহমিদা মির্জা (পাকিস্তান)।[১৬]

রাহা মোহাররাফ-সৌদি নারীর এভারেস্ট বিজয়

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পবর্তশৃঙ্গ এভারেস্ট চূড়ায় বিজয় কেতন ওড়ালেন সৌদি নারী রাহা মোহাররাফ। রক্ষণশীল সৌদি আরবের নারী ৮৮৫০ ফিট উপরে উঠে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন। তিনি শুধু প্রথম আরব নারীই নন, তিনি সর্বকনিষ্ঠ নারী যিনি এই বিজয়ের অধিকারী।[১৭]

সামিনা বেগ-এভারেস্টে পাকিস্তানি নারী

প্রথম পাকিস্তানি নারী হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন ২১ বছর বয়সী নারী সামিনা বেগ। প্রথম পাকিস্তানি নারী হিসেবে সামিনা এভারেস্টের ৮৮৪৮ মিটার উচ্চতার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করেছেন। সামিনার এভারেস্ট বিজয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সিলিন্ডার ছাড়াই অভিযান শুরুর ৪৮ তম দিনে তার দল চূড়ায় পৌঁছায়।[১৮]

ফাহমিদা মির্জা-পাকিস্তানের প্রথম নারী স্পীকার

পেশায় চিকিৎসক হলেও দাদা-বাবার মতোই রাজনীতির মাঠে হেঁটেছেন ফাহমিদা মির্জা। তার দাদা কাজি আব্দুল কাইয়ুম হায়দারাবাদ সিন্ধু পৌরসভার প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট আর বাবা কাজি আব্দুল মাজিদ আবিদ (কাজি আবিদ) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২০ ডিসেম্বর পাকিস্তানে সিন্দু প্রদেশে জন্ম নেওয়া ফাহমিদা মির্জা রাজনীতিতে প্রবেশের আগে বিজ্ঞাপনী সংস্থা দিয়ে শুরু করেছিলেন কর্মজীবন। ২০০৮ সালের ১৯ মার্চ প্রথম নারী হিসেবে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের স্পীকারের দায়িত্ব নেন। শুধু পাকিস্তানেরই নন, মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশের প্রথম নারী স্পীকারও তিনি। ফাহমিদা মির্জার স্বামী জুলফিকার মির্জা বর্তমানে পাকিস্তানের পিপলস পার্টির কো-চেয়ারম্যান।[১৯]

হাবিবা সারাবি-আফগানিস্তানের প্রথম মহিলার ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রাপ্তি

এশিয়ার নোবেল হিসেবে খ্যাত ফিলিপাইনের র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আফগান নারী হাবিবা সারাবী। আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৫ সালে প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে সমাজে শিক্ষার প্রসার, নারী অধিকার সংরক্ষণের অনবদ্য অবদান রেখেছেন। ইতোপূর্বে তিনি দেশটির মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। শিক্ষাজীবনে তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৃত্তি পেয়ে ভারতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার লাভের পূর্বেও ২০০৫ সালে শিশুদের ওপর বিশেষ কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জেসন পুরস্কার লাভ করেন।[২০]

মালালা ইউসুফজাই-গ্লোবাল লিডারশিপ এওয়ার্ডের জন্য মালালা ইউসুফজাই মনোনীত

নারী শিক্ষার পক্ষে সোচ্চার পাকিস্তানি কিশোরী মালালা ইউসুফজাই (১৫) এ বছরের Global leadership award-এর জন্য মনোনীত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ নভেম্বর ওয়াশিংটনে মালালার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। নারীশিক্ষার পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় মালালা তালেবান জঙ্গীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ১০ নভেম্বরকে মালালা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যও মালালা মনোনীত হয়েছে।[২১]

আসমা-বিকল্প নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

পাকিস্তানের মানবাধিকার সংরক্ষণকারী আইনজীবী আসমা জাহাঙ্গীর ও যুক্তরাষ্ট্রের পলাতক ইনটেলিজেন্স এজেন্ট এডওয়ার্ড স্নোডেনকে যৌথভাবে গত ২৪ শে সেপ্টেম্বর সুইডিস "মানব অধিকার"নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। আসমাকে পাকিস্তানের মানবাধিকার সংরক্ষণে নিরন্তর সংগ্রামের জন্য এবং স্নোডেনকে তার অসীম সাহসের জন্য এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র) মানুষের সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করে তাদের ওপর নজরদারি করছে-এই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন স্নোডেন।[২২]

মেলিন্ডা গেটস-বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী নারীর তালিকায় তৃতীয়

বিশ্বখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস। একদিকে ব্যবসায়ী, অন্যদিকে মানব দরদি হিসেবে পরিচিত। ১৯৯৮ সালে বিল গেটস ও মেলিন্ডা গেটসের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংস্থা বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা ফাউন্ডেশন সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২৬ বিলিয়ন ডলার দান করেছেন। মেলিন্ডা বিশ্বখ্যাত সাময়িকী ফোর্বস এর ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ১০০ প্রভাবশালী নারীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছেন। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে জন্মগ্রহণ করা মেলিন্ডার পুরো নাম মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস।[২৩]

শান্তিতে নোবেল পেলেন পাকিস্তানের মালালা

শান্তির নোবেল এবার ভাগাভাগি হলো চির বৈরী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই এবং ভারতের কৈলাস সত্যার্থী এ বছর যৌথভাবে পেয়েছেন এই পুরস্কার। মালালা নারীশিক্ষা আন্দোলনের কর্মী এবং কৈলাস কাজ করেন শিশু অধিকার নিয়ে।

সম্প্রতি মালালা ও কৈলাসকে যৌথভাবে শান্তিতে এ পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দিয়ে নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি বলেছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, শিক্ষার জন্য ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে একই লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন একজন মুসলিম ও একজন হিন্দু, একজন পাকিস্তানি ও একজন ভারতীয়। মালালার বয়স এখন মাত্র ১৭ বছর। এত অল্প বয়সে এর আগে কেউ নোবেল পুরস্কার পায়নি। চরম কট্টরপন্থি তালেবানের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে নারীশিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য ২০১২ সালের অক্টোবরে তার মাথায় গুলি করেছিল জঙ্গিরা।[২৪]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, নারী জাতির এ অগ্রগতির ইতিহাস বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ, সমাজ ও সভ্যতায় নারীর এ সম্মানজনক অবস্থা বিভিন্ন রকম আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে। কেননা সমাজের লোকেরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে নারীকে সম্মান দিতে রাজী ছিল না। ফলে নারীকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আজকের এ সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে হয়েছে, এখানেই তাদের স্বার্থকতা। বিশ্বের কয়েকজন বরেণ্য নারীর ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এটি উপলব্ধি করতে পারি।

তথ্যসূত্র

১। উর্মি রহমান, *পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ১৭
২। উর্মি রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.২০, ২২
৩। তাহমিনা কবির "আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পূর্ব প্রেক্ষাপট: কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য'' *চিন্তা*, ঢাকা, ৩০ মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ১৭
৪। ফরিদা আখতার "ইতিহাস যেন ভুলে না যাই" *চিন্তা*, ঢাকা, ৩০ মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৫
৫। ফরিদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৬। উর্মি রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৭। ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা ও প্রাপ্তি, *বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ*, ঢাকা-২০০২ খ্রি. পৃ. ৪
৮। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশনী: *উইমেন ফর উইমেন এর নিজউলেটার*, প্রকাশকাল: কার্তিক-অগ্রহায়ণ: ১৪১৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর: ২০১১ খ্রি. পৃ. ০৩
৯। মালেকা বেগম অনুদিত, *চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা*[৪]। রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস। ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ১৫২
১০। লুনা নূর, সদস্য, আন্তর্জাতিক উপ-পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, *মহিলা সমাচার*, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া, Women in Plitics 2012 (IPU), প্রকাশকাল: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ খ্রি. পৃ. ২৭-২৮
১১। ডা.ফওজিয়া মোসলেম, *মহিলা সমাচার*, বিষয়: নারীর ক্ষমতায়ন চাই, সমতাপূর্ণ বিশ্ব চাই, প্রকাশকাল: বৈশাখ-শ্রাবণ: ১৪২৩, এপ্রিল-জুন: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১৭-১৯
১২। আয়েশা খানম, *নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা কার্যক্রম প্রতিবেদন*, ৩য় খণ্ড, প্রকাশকাল: ২০০২-২০০৭ খ্রি. পৃ. ১৫
১৩। আয়েশা খানম, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লংঘন, *নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা কার্যক্রম প্রতিবেদন*, ২০০২-২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৬-১৭
১৪। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-অগ্রহায়ণ: ১৪১৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর: ২০১১ খ্রি. পৃ. ৬-৭।
১৫। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৩
১৬। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ২
১৭। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৯
১৮। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৯
১৯। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৫
২০। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৭
২১। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৭
২২। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৭

২৩। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৮-৫

২৪। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল, পৌষ-চৈত্র: ১৪২১, জানুয়ারী-এপ্রিল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশে নারীর অবস্থা, মর্যাদা ও অধিকার

বাংলাদেশের নারীগণ বর্তমানে উন্নতির চরম পর্যায়ে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের নারীরা এখন আর অবহেলিত নয়। তারা সম্মানের সাথে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সর্বত্র এখন নারী অংশগ্রহণ ও সফলতা দৃশ্যমান। সময় এগিয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। এখন অনেক পুরুষ নেশার জগতে ও খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকছে। অপরদিকে নারীরা শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে যোগ্যরূপে গড়ে তুলে দেশ রক্ষায় ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস

ইতিহাসে দেখা যায়, বাঙালি নারীরাও কখনো কখনো উচ্চশিক্ষা লাভ করে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় আঠারো-উনিশ শতকের এমন তিনজন বিদুষী মহিলার কথা জানা যাচ্ছে।

এঁদের মধ্যে হটু বিদ্যালঙ্কার [মৃত্যু ১৮১০] ও হটু বিদ্যালঙ্কার [১৭৭৫-১৮৭৫] সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। হটু ছিলেন বর্ধমানের এক পণ্ডিতের কন্যা। বিয়ের পরেও তিনি পিতৃগৃহে বাস করতেন, অল্পবয়সে বিধবা হন। প্রথমে পিতার কাছে, পরে কাশীর পন্ডিতদের কাছে, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও নব্যন্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি নিজেই চতুস্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। কাশীতেও তিনি চতুস্পাঠী স্থাপন করে বহু ছাত্রকে পড়িয়েছেন। পুরুষ পণ্ডিতদের মতো তিনিও দক্ষিণা নিতেন এবং পণ্ডিতসভায় প্রকাশ্যে যোগ দিয়ে তর্কবিতর্কে অংশ নিতেন। হটুও বর্ধমানের মেয়ে, তবে চিরকুমারী। তার প্রকৃত নাম রূপমঞ্জরী। ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তিনি গুরুগৃহে বাস করে টোলের ছাত্রদের সঙ্গে পড়াশোনা করতেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল। কাশীতে গিয়ে তিনি দন্ডীদের কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি মূলত চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তিনি পুরুষের মতো বেশভূষা করতেন, উত্তরীয় পরতেন এবং ব্রাহ্মণ পুরুষের মতো মুণ্ডিত মস্তকে শিখা ধারণ করতেন। তৃতীয় জন দ্রবময়ী। তিনি কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত এলাকার সন্তান এবং বাল্যবিধবা। পিতার টোলে তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন শেষ করে কাব্যালঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং পিতার টোলের পুরুষ ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

১৮২৪-এর মধ্যে কলকাতায় পঞ্চাশ টা 'স্ত্রী-পাঠশালা' গড়ে উঠেছিল।

সরকারি সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেশ কিছু বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বিটনের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মিলে ১৮৪৯ সালে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরে তার নাম হয় বেথুন স্কুল। নারীশিক্ষা বিস্তারে এর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

বরিশালের ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভাগলপুর-প্রবাসী ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী বসু [পরে গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬১-১৯২৩] বেথুন স্কুলে পড়াশোনা করে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রার্থী হন, তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে। মেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারবে না, এমন কোনো আইন ছিল না; কিন্তু মেয়েরা পরীক্ষা দেবে, এমনটি কল্পনায়ও ছিল না। এই অস্বস্তির মধ্যে স্বয়ং ভাইস-চান্সেলর তার-এবং সরলা দাস নামে আরেকজনের যোগ্যতা যাচাই করার পর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। ১৯৭৮ সালে কাদম্বিনী এনট্রান্স পাশ করেন, ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ভারতীয় মহিলা তিনিই। এরপর তারই জন্যেই বেথুন স্কুলে এফএ ও পরে বিএ পড়াবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৮৩ সালে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু [১৮৬০-১৯৪৪] বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। বিএ পাশ করার পর কাদম্বিনীর বিয়ে হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন কিন্তু সেখানকার অধ্যাপকদের অনেকেই সন্তুষ্টচিত্তে এই প্রথম ছাত্রীকে গ্রহণ করেন নি। শোনা যায়, এই কারণেই ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সব বিষয়ে কৃতকার্য হয়েও মেডিসিনের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ফলে তার ভাগ্যে এমবিবিএস ডিগ্রি জোটেনি। তবে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তাকে 'গ্রাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ' বলে একটি সনদপত্র দেন-তার জোরে

তিনি বিলেতে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার সুযোগ পান এবং একই সঙ্গে এডিনবরা, গ্লাসগো ও ডাবলিন থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরেন। কিছু কাল লেডি ডাফরিন হাসপাতালে কাজ করার পর তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পরে কংগ্রেসেও যোগ দেন। চন্দ্রমুখী বসু ছিলেন প্রবাসী বাঙালি খ্রিষ্টান পরিবারের সন্তান। লেখাপড়ার জন্যে তাকেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তিনি ১৮৮৪ সালে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন এবং বেথুন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। অল্পকাল পরে তিনি ওই কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তার প্রথম ছাত্রী লীলা নাগকে [১৯০০-১৯৭০] ভর্তি করতে অনিচ্ছুক ছিল। তিনি সিলেটের মেয়ে। ১৯২১ সালে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি বেথুন কলেজ থেকে ডিস্ট্রিংশনসহ বিএ পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই সেখানে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে চান। তার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল হয় এবং ১৯২৩ সালে তিনি এমএ পাশ করেন। তিনি নারীমুক্তির আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেন এবং ঢাকায় নারী-শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তিনি দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। দেশবিভাগের পরেও তিনি ও তার স্বামী অনিল রায় কিছুকাল ঢাকায় ছিলেন। লীলা নাগের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন ও জগন্নাথ হলের প্রোভোষ্ট নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কন্যা সুষমা সেনগুপ্ত ১৯২১ সালে অর্থনীতিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। অর্থনীতিতে ছাত্র সংখ্যা ছিল যথেষ্ট।" তাদের মধ্যে একমাত্র মেয়ে সুষমার অসুবিধে বা সংকোচের কারণ ঘটতে পারে বলে ভাইস-চ্যান্সেলর পি জে হার্টগের স্ত্রী প্রথমে কিছুকাল তাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে যেতেন, পরে তার জন্য একজন সেবিকার ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুষমা কলকাতায় পড়তে চলে যান। ১৯২৩ সালে বাংলায় এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন লতিকা রায়, লীলা রায় ও অরুণবালা সেনগুপ্ত এবং সংস্কৃতে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন শান্তিবালা নাগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুননেছা [১৮৯৯-১৯৭৭]। ১৯২৪ সালে তিনি গণিত বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি বিলেত থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কলকাতার বেথুন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষরূপে ১৯৫৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। তাদের চাহিদা মেটাতে ১৯২৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাংলো চামেলি হাউজে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উইমেনস হাউজ'। শুরুতে 'উইমেনস হাউজ' এ ছিল আবাসিক ছাত্রী তিনজন, একজন হাউজ টিউটর মিসেস পি নাগ। তবে হাউজটি ছিল ঢাকা হলের সঙ্গে যুক্ত, সেই হলের প্রোভোস্টই তার তত্ত্বাবধান করতেন। পরে ছাত্রীদের আবাস স্থলের পরিবর্তন হয় অধিকবার এবং বিদ্যমান তিনটি হলের-সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল ও ঢাকা হলের সঙ্গে এবং আরো পরে ছাত্রদের অন্যান্য আবাসিক হল প্রতিষ্ঠিত হলে সেসবের সঙ্গে ও অনাবাসিক ছাত্র হিসাবে যুক্ত থাকার সুযোগ দেওয়া হয় ছাত্রীদের। ছাত্রীদের প্রথম আবাসিক হল রোকেয়া হল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষিকা নিযুক্ত হন করুণাকণা গুপ্তা [১৯২২-৭৯] ইতিহাস বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার হিসাবে। তিনি ১৯২৩ সালে অনার্সে এবং ১৯৩৩ সালে এমএ তে প্রথম শ্রেণি লাভ করেছিলেন। তার উদ্যোগেই স্বতন্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং ক্রমে তা ছাত্রদের হল সংসদের সমমর্যাদা অর্জন করে। করুনাকণা গুপ্তা অল্পকালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যান। পরে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং পশ্চিবঙ্গের ডি ডি পি আই হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও তাঁর ভূমিকা ছিল। করুণাকণা গুপ্তা চলে গেলে ছাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেখার ভার নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষিকা চারুপমা বোস। ১৯৩৭ সালে তিনি ইংরেজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মেয়েদের উন্নয়নে তাঁরও ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে একথা নিশ্চয় বলা যায় করুনাকণা বা চারুপমার স্বপ্নের আগোচর ছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি আগে ছাত্রী আবাসিক হল হবে পাঁচ এবং হোস্টেল একটি।[১]

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণে নবাব ফয়জুন্নেছার অবদান

যখন নারী শিক্ষার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলছে তখন একজন মহিলা কুমিল্লায় পর্দানশীন মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলার মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এই পথিকৃত নারী নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী। ১৮৭৩ সালে নওয়াব ফয়জুন্নেছা কুমিল্লায় ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭৩ সালে বাংলাদেশ তথা ভারতে মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য হয়ত এটাই প্রাথমিক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কুমিল্লা শহরে মেয়েদের জন্য তিনি পৃথকভাবে দু'টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। একটি কুমিল্লার নানুয়া দীঘির পশ্চিম পাড়ে অন্যটি কান্দির পাড়ে ১৮৭৩ সালে। ১৮৮৯ সালে নবাব খেতাব প্রাপ্তির পর উৎসাহিত হয়ে এটিকে তিনি জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় এ উত্তীর্ণ করেন (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)। ফয়জুন্নেছার মৃত্যুর পর আনুমানিক ১৯৩১ সালে স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই স্কুলের সঙ্গে তিনি হোস্টেলও তৈরি করে দেন এবং মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি বহু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়। এই উপমহাদেশেই নারী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মুসলমান সম্প্রদায়ে নারী জাগরণ ছড়িয়ে পড়ায় মেয়েরা অধিক পরিমাণে স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে স্বনামধন্য হয়েছিলেন এমন বহু মেয়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সৈয়দা জাহানারা হায়দার (১৯১৭-১৯৮৮) এবং মেহেরুন্নেসা ইসলাম (জন্ম-১৯২১) উভয়েই যথাক্রমে ১৯৩৩ এবং ১৯৩৮ সালে ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদল্যায় থেকে উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট থেকে বি.এ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। এ অর্থে তার পথপদর্শক।

যখন এ দেশীয় মুসলমান পুরুষদেরকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানোর জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ, আমীর আলী প্রমুখ নেতৃবর্গ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সময়ে নবাব ফয়জুন্নেছা মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

বেগম রোকেয়ার অবদান

বাংলার নারী শিক্ষার সাথে যাঁর নাম সবার আগে স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যিনি তাঁর জীবনের সকল অর্থবিত্ত, মেধা, মনন, শ্রম ব্যয় করেছিলেন নারী শিক্ষার জন্য। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি সামান্য সম্পদ এবং শক্তি নিয়ে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সৎ কন্যার পীড়নে তাঁর অসংখ্য স্মৃতি বিজাড়িত ভাগলপুর ছেড়ে চিরকালের মত কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন। মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে-১৯১১ সালের ১১ ই মার্চ কলকাতায় ওয়ালিউল্লাহ লেইনে একটি ছোট কক্ষে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। বিদ্যালয় স্থাপনের ১৪ বছর পরও তিনি বাংলা শাখা শুরু করতে অপারগ হন। ওয়ালী উল্লাহ লেনে ছোট বিদ্যালয়টি সামাজিক নিন্দা এবং সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও যথেষ্ট অগ্রসর হয়। ১৯১৩ সালের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৩৯ জনে দাঁড়ায়। ১৯৩১ সালে স্কুলটি হাইস্কুলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একটি করে শ্রেণি যুক্ত হচ্ছিল। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে তাফসির সহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি, হোম নার্সিং, ফাষ্ট-এইড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেছে কিন্তু ১১৪টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল বাঙালি। শিক্ষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে তিনি নানারকম বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তথাপি রোকেয়া সমর্থনকারীও পেয়েছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মহিলা এবং পুরুষরা তাঁকে সদা উৎসাহিত করে গেছেন এবং কখনো তাঁরা সরাসরি বেগম রোকেয়াকে বস্তুগত এবং নৈতিক সমর্থনও দিয়েছিলেন। এছাড়া উদারপন্থী দৈনিকগুলো এবং সাময়িক পত্রিকাগুলো তাঁর স্বপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে।

রোকেয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং সংসদ সদস্য শাসসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) বেগম রোকেয়া তাঁকে সহকর্মী করে নিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া বহু আগেই আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শামসুন নাহার এই সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং এই সমিতির মাধ্যমে বহু নারী শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। শামসুন্নাহার ছিলেন রোকেয়ার সর্বপ্রথম অনুসারী এবং বন্ধু। এছাড়া তিনি বিদ্যালয় পরিচালনায় এবং আঞ্জুমান এর কাজে তাঁর জীবদ্দশায় রোকেয়াকে সাহায্য করেছিলেন।

উনবিশং-বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে যে কয়জন মহিয়সী রমণী জন্মগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া অগ্রগণ্য। তা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্টতায় ঘেরা। বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামি চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদ। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মুসলিম মহিলাদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা। যা ছিল ইসলামের মূল শিক্ষা।

ঢাকায় শিক্ষার প্রসার

১৮৭৬ সালে ডা. আনন্দচরণ খাস্তগীর চট্টগ্রামে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে তার জামাতা এই স্কুলকে ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।

১৮৭৮ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারের নিকট ইডেন স্কুলের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়।

১৮৯৬ সালে বাঙালি মেয়েদের ৬ টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ছিল ইডেন বালিকা বিদ্যালয়। ঢাকায় "অনুশীলন" এবং "যুগান্তর সমিতি" নারী শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ নিবন্ধ করে। সে সময় বাস্তবে মেয়েদের কোন স্কুল ছিল না শুধু ইডেন ছাড়া। ১৯২০-২৮ সালের মধ্যে দীপালী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগ তার সহযোগীদের নিয়ে ঢাকায় ৪টি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

দীপালী-১ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪ এর দিকে। লীলা নাগ সে সময় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এই স্কুলটি কামরুন্নেছা স্কুলে পরিণত করার ক্ষেত্রে নেপথ্যে ভূমিকা রাখেন। এভাবেই ১৯২৪ সালে কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা স্কুল স্থাপনের ৫০ বছর পর এবং রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপনের ১৩ বছর পর কামরুন্নেসা স্কুল স্থাপিত হয়। ইতোমধ্যে সম্ভ্রান্তঘরের মেয়েরা অধিক সংখ্যায় স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। নবাব ফয়জুন্নেছা এবং বেগম রোকেয়া তাঁদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা নমনীয় করে এনেছিলেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

১৯৩৯ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অধীনে ৩৫ জন ছাত্রী নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগের ক্লাস শুরু হয়।

১৯৩৯ সালে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মহিলাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো তৈরি হয়ে যায়।[২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অবিভক্ত বাংলায় সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নারী সমাজের অবদান

পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মুসলমানদের সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস তা কেবল পুরুষ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর এর মধ্যেই পুরো উনবিংশ শতাব্দী ধরে আমরা একজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম পাই তিনি নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী।

ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ও রহিমুন্নেছা

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা গিরিশ মুদ্রাযন্ত্র থেকে শ্রীমতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরীরানী রচিত সাহিত্য গ্রন্থ "রূপজালাল" প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে ফয়জুন্নেছা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলিম মহিলা কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, তিনি রহিমুন্নেছা। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রহিমুন্নেছার আবির্ভার যদিও একটি বিরল ঘটনা, তথাপি রহিমুন্নেছা অন্যের গ্রন্থের অনুলিপি করতে গিয়ে স্থানে স্থানে স্বয়ং কাব্য চর্চা করেছেন। তাঁর নিজস্ব কোন গ্রন্থ ছিল না। রহিমুন্নেছা শুধুমাত্র পদ্যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, ফয়জুন্নেছা কেবল পদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি স্থানে স্থানে গদ্য চর্চাও করেছেন এবং ফয়জুন্নেছার "রূপজালাল" একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।
১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিবি তাহেরন নেসা নামক একজন মুসলমান মহিলার রচিত একটি গদ্য নিবন্ধ বামাবোধিনী পত্রিকার ২৫ তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই মহিলাকে সম্ভবত প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

১৯০২ সালে ফয়জুন্নেছা খাতুন নামে প্রথম মুসলিম মহিলা মুসলমানদের সম্পাদিত 'ইসলাম প্রচারক' প্রত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে 'ইসলাম প্রচারক' তাঁর হামদ, ঈশ্বর প্রশস্তি প্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি Gold Smith এর The Hermit কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮৮৪ সালে।

খায়রুন্নেছা

সিরাজগঞ্জ নিবাসি খায়রুন্নেছা (১৮৭০-১৯১২) ১৯০৪ সালে আমাদের শিক্ষার অন্তরায় নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। খায়রুন্নেসার লেখায় উপযুক্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে বলে মনসুর উদ্দীন মত প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে তিনি নারী সমাজের প্রতি বিদেশী সামগ্রী বর্জনের আহবান করেন। ৬৮ পাতার পুস্তিকা তাঁর 'সতীর পতি ভক্তি' ছিল ভাল স্ত্রী হওয়ার উপদেশমূলক নির্দেশিকা।

সাহিফাবানু

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মোটামুটি প্রতিটি মধ্যবিত্তের ঘরে জার্নাল, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং দৈনিক সংবাদপত্র পৌঁছাতে শুরু করে। সেকালের আরেকজন লেখিকা হচ্ছেন সিলেট নিবাসী সাহিফাবানু (১৮৫০-১৯২৬) তিনি জনবহুল কলরবময় ঢাকা ও কোলকাতা থেকে দূরে ঐ রকম একটি আধা মফস্বল শহরে থেকেও সাহিত্য অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী ছিলেন (১৯০৭-১৯৩৪) একজন সমাজ বিশ্লেষক। রাজিয়া তার স্বল্পকালীন জীবনে প্রবন্ধকার, কবি ও ছোটগল্প লেখিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রাজিয়া খাতুন সেসব সীমিত সংখ্যক মহিলাদের একজন ছিলেন যিনি সে সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন, যথা-স্বদেশী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদির খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের স্বল্পায়ু কিন্তু জনপ্রিয় এবং প্রগতিশীল ধূমকেতু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি মিসেস এম রহমান এই নামে ধূমকেতুর মহিলা বিষয়ক কলাম লিখতেন।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া

নবাব ফয়জুন্নেসার রচনা আবিষ্কার এবং তাঁর সাহিত্য সমালোচকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার পূর্বে, তদানীন্তন আধুনিক কালের প্রথম মহিলা লেখিকা হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম বিবেচিত হত। রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু করেন ১৯০১ সনে নবপ্রভা প্রত্রিকায় "পিপাসা" নামক রচনাটি প্রকাশের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক লেখিকা হিসেবে রোকেয়ার লেখায় হয়তো নান্দনিকতার অভাব ছিল কিন্তু তিনি তা পুষিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লেখার তীক্ষ্মতা, স্পষ্টতা এবং নারীদের বিষয়গুলো সম্পর্কে একাগ্রতার মাধ্যমে।

বেগম রোকেয়া শুধু অইসলামি অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও মুসলিম নারী শিক্ষারই অগ্রদূত ছিলেন না। তিনি বাঙালি মুসলমানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও মজবুত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং অংশ নিয়েছিলেন বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে। ইসলামি মূল্যবোধ সম্পন্ন কল্যাণমূখী সমাজ গঠনই ছিল তাঁর আদর্শ।

এক কক্তব্যে তিনি বলেন, "মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুরআন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। সম্ভবত এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করলে আমাদের সমাজে মেয়েদের কুরআন শিক্ষাও দিবে না। আমরা কুরআনের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না। শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। যদি কেউ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র লয় কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধপত্র ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্র খানাকে মাদুলীরূপে গলায় পুরিয়া থাকে আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে তাহাতে কি সে উপকার পাইবে?

ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতাম, কুরআন ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে। সে কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কুরআন খানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কুরআনের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুরআনের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।

সম্পদের উত্তরাধিকার ও মোহর প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-"হায় পিতা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্তে পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছ। কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে। আহা! "মুহাম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নয়।

আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে আমাদের জঘন্য অবরোধ প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে বোরকা ছাড়িতে বলেন, বলি উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে, জেলেনি, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার ইসলাম প্রদত্ত। নারীদের অবলা বলে গণ্য করা হয়। রোকেয়া বলেন, অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলোর অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করার জন্য নয়। এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে গাটহীন, বাঁধনহারা হয়ে চলা, বলা, খেলা নয়– নর-নারীর উভয়কেই একটি সীমারেখা মেনে চলতে হবে এবং এ সীমারেখা মেনে চলাটা মানব সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও শৃঙ্খলার জন্য অতীব প্রয়োজন।

নূরুন্নেছা খাতুন

প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা উপন্যাসিক নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বপ্রতিষ্ঠ কর্মে আপন পরিচয়ে বাঙালি নারী সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই দেদীপ্যমান। বিয়ের পর সাহিত্যচর্চা করে মাত্র ২৯ বছর বয়সে ১৩২৯ (১৯২৩) সালে তাঁর রচনা প্রথম উপন্যাস "স্বপ্নদ্রষ্টার" জন্য তিনি সে সময়ের সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর কর্মের সূচনা হয় "আহ্বান-গীতি" নামক একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি ১৩১৮ সালে কহিনুর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "সাওগাত" পত্রিকার সপ্তমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় "আমাদের কাজ" নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। কথাশিল্পী হিসাবে নূরুন্নেছা খাতুনের ছয়টি উপন্যাস স্বপ্নদ্রষ্টা, জানকী বাঈ, আত্মদান, ভাগ্যচক্র, বিধিলিপি ও নিয়তি প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছয়টি উপন্যাস ছাড়াও মোসলেম বিক্রম, বাঙ্গালার মুসলিম রাজত্ব নামে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীকে তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি "বিদ্যাবিনোদিনী" উপাধিতে ভূষিত করেন। নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাঁকে সাহিত্য সরস্বতী উপাধি দেন। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে তিনি যোগ দিতেন এবং সে সকল সভায় সমাজ গঠনে সাহিত্যিকের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। ১৯৩৭ সালে মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ঘোড়শ অধিবেশনে "বঙ্গসাহিত্যে মোসলমান" শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রচুর সুনাম অর্জন করে। ১৯২৯ সালে সওগাত মহিলা সংখ্যায় তাঁর ছবি ও গল্প পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। আশি উত্তর বয়সেও জ্ঞানানুশীলনের ব্যাপারে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। ১৯৭৫ সালের ৬ই এপ্রিল এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক পরলোক গমন করেন।

বেগম সারা তৈফুর

১৮৯৩ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা দু'জনেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন কিন্তু সমাজ ও পরিবেশের কারণে কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেননি। ১৯১৪ সনে ঢাকার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থকার সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। জনাব তৈফুর স্ত্রীর মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন তাই স্ত্রীর প্রতিভা বিকাশে তাঁর সুদৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর একমাত্র গ্রন্থ "স্বর্গের জ্যোতি" ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সালাম-এর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোন মহিলা নবি জীবনী লেখেননি। সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য প্রত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় বেগম সারা খাতুনের "ময়না" নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭১ সনের ৭ই ডিসেম্বরে এই সারা তৈফুর ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

মামলুকুল ফাতেমা খানম

তিনি ঘরেই শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে অন্য অনেকেই যা করেনি তিনি তা করেছেন। তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল এবং ঢাকার পোস্তা গার্লস স্কুল-এ শিক্ষাকতা করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর অনেক লেখার মধ্যে এখন শুধু পাওয়া যায় সাতটি ছোটগল্পের একটি চটি সংকলন "সপ্তর্ষী" (১৯৬৪) এবং তৎকালীন ঢাকার তরুণ লেখক এবং একটি স্বল্পায়ূ-সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক আবুল ফজলকে লেখা কিছু চিঠি। মামলুকুল ফাতেমা খানম ১৯৫৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

আকিকুন্নেসা আহমদ

"আধুনিকা স্ত্রী" ও "আধুনিক স্বামী" নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মাত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেও তিনি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন। বেগম

আকিকুন্নেসা নিজে একজন গৃহবধূ হিসেবে স্বামী সন্তানদের দেখাশুনা করা এবং সকল প্রকার সামাজিকতা বজায় রেখেও নারীদের প্রতি তাঁর নিজের কর্তব্যের প্রতি সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে "আধুনিকা স্ত্রী" (১৯৫৩) ও "আধুনিক স্বামী" (১৯৬২) গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন। ১৭ জুন ১৯৮২ সনে বেগম আকিকুন্নেসা আহমদ ইন্তেকাল করেন।

বেগম রোকেয়ার অনুসারী শামসুন্নাহার মাহমুদ

এদেশের নারী শিক্ষা, নারী জাগরণের প্রচার ও প্রসারে অনন্য কীর্তিও অবদান রেখে গিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে শামসুন নাহারের পরিচয় হয় লেখার মধ্য দিয়ে। অল্প বয়সে শামসুন নাহারের প্রথম লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয় তৎকালীন কিশোরদের পত্রিকা "আঙ্গুর" নামক মাসিক পত্রিকায়। এরপর নওরোজ ও অন্যান্য পত্রিকায় শামসুন নাহারের কিছু কিছু লেখা ছাপা হয়। তাঁর প্রথম রচনা "পূণ্যময়ী" লেখা হয় মাত্র দশ বছর বয়সে এবং ১৯২৫ সালে তা প্রকাশিত হয় যখন তাঁর বয়স মাত্র সতের। এই বইকে উপলক্ষ্য করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অশিষ বাণী। কবির স্বহস্তে লিখিত কবিতা খানি ব্লক করে "পূণ্যময়ী" এর প্রথম পাতায় ছাপানো হয়েছিলো। অল্প বয়স থেকেই শামসুন নাহার লেখাপড়ার প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ জন্মেছিলো তাঁর বাল্যকাল থেকেই। এর কারণ তাঁদের বাড়িতে ছিল একটা সুন্দর সাহিত্যিক পরিবেশ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ "পূণ্যময়ী", "ফুল বাগিচা", "বেগম মহল", "রোকেয়া জীবনী", "শিশুর শিক্ষা", "আমার দেখা তুরস্ক", "নজরুলকে যেমন দেখেছি", তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "বুলবুল।"

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক– "সবুজ পাঠ", "কিশোর সাথী", "তাজমহল পাঠ", "নতুন তাজমহল পাঠ", "বিচিত্রপাঠ্য"। ১৯৬৪ সালে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দা মোতাহেরা বানু

১৯০৬ সালে নভেম্বর মাসে বরিশাল জেলার পটুয়াখালীর বাসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মোতাহেরা বানুর কাব্যচর্চা। শুরু হয় তার বিয়ের পর থেকে। তবে লেখা-লেখির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা সৈয়দ সাজ্জাদ মোজাফফরের কাছ থেকেই। "সওগাত" ১৩২৬ সংখ্যায় 'খেলার সাথী' নামে কবিতাটিই হচ্ছে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা। সেই থেকে মোতাহেরা বানুর কবিতা লেখা আর থামেনি। এর মধ্যে "বাল্য বিধবা", "প্রতীক্ষা", "অধীরা", ও "চিরবাঞ্ছিত" অন্যতম।

জেব-উন-নেসা-জামাল

জেব-উন -নেসা-জামাল বাংলাদেশের সাহিত্যে ও সংস্কৃতি অঙ্গনে গীতিকার হিসেবে পরিচিত। জেব -উন -নেসা-জামাল লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন একেবারে ছোট বয়সে। তখন তিনি মাত্র ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়েন। আজাদ পত্রিকার 'মুকলের মাহফিল' কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা জলছবি, শিশু সাথী, রং মশাল প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তিনি কবিতাই বেশি লিখতেন। পঞ্চাশ ষাটের দশক থেকে গদ্য রচনা শুরু করেন। যেসব লেখা মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হতো। তিনি একটি ইংরেজি বই অনুবাদ করেন। কিশোরদের উপযোগী এই বইটির নাম বেল সাহেবের টেলিফোন আবিষ্কার। জেব-উন -নেসা-জামাল একজন সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন। গায়িকা থেকে গীতিকার হওয়ার প্রেরণা আসে তাঁর মেয়ে জিনাত রেহানার জন্য। মেয়ের জন্য ১৯৬৬ সাল থেকে গান লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা দেড় হাজারের মতো। 'আমার যত গান ' জেব-উন-নেসা-জামালের প্রথম গীতি সংকলন। "আর্জি" নামে মরমী গানের একটি সংকলন ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আর একটি গানের বই "গান এলো মোর মনে''। এই প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার, লেখিকা, ও টিভি ব্যক্তিত্ব জেব-উন-নেসা-জামাল ৭০ বছর বয়সে ১৯৯৫ সনে ১ লা এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতুননেছা খাতুন

তিনি ১৯২২ খিস্টাব্দে তার পিতার কর্মস্থান বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ সেবিকা ছাড়া দৌলতুননেছা খাতুন লেখিকা হিসেবেও ছিলেন যথেষ্ট পরিচিত। দৌলতুননেছা খাতুন বার বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা করেছেন। অল্প বয়স থেকেই দৌলতুননেছার রচনা বঙ্গশ্রী, দেশ, নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। রস রচনা, একাংকীকা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে তাঁর বাস্তববাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। দৌলতুননেছা খাতুনের প্রথম উপন্যাস "পথের পরশ'' ১৯৫৭ সালে এবং দ্বিতীয় উপন্যাস "বধূর লাগিয়া'' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে "কোমরপুরের ছোট বউ", "বিবস্ত্র ধরণী'' ও "নাসিমা ক্লিনিক '' নামের তিনটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আরও কয়েকটি উপন্যাস তিনি লেখেন। যার পান্ডুলিপি রয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি ছোট গল্প খুজে পাওয়া যায়। "ঝর্ণা" ও "চন্দন বিষ পাহাড়" নামের দুটি নাটক নিয়ে শিশুদের জন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমাজকল্যাণ বিষয়ক দুটি বইও তিনি লেখেন। দৌলতুন্নেছা ১৯৭৭ সালে নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদনী স্বর্ণ পদক পান উপন্যাসে। এছাড়াও ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার। একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। দৌলতুননেছা খাতুন ৪ঠা আগস্ট ১৯৯৭ সালে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০ জুন। সুফিয়া কামাল কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি। তাঁর সাহিত্য জীবনের লেখালেখির পিছনে মামার বাড়ির নিজস্ব লাইব্রেরী, মায়ের অনুপ্রেরণা এবং নবাব বাড়ির মিলাদের গজলের সুর, পাইক ও পেয়াদাদের জারি, সারি গানের সুর মূর্ছনা তাঁর কচি মনে যে দোলা দিত সেটারও প্রভাব ছিল। তার প্রথম কবিতা "বর্ষা" ও গল্প "সৈনিক বধূ''। ১৯২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় কবিতা বাসন্তী প্রকাশিত হয়। তবে প্রথম গল্প গ্রন্থ "কেয়ার কাঁটা" প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম হল "সাজের মায়া", (কবিতা) "একাত্তরের ডায়রি", "মায়া কাজল", "উদাত্ত পৃথিবী" ইত্যাদি।

রোমেনা আফাজ

রোমেনা আফাজ মহিলাদের সাহিত্য চর্চার ভুবনে রহস্য সিরিজ লেখার একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী এবং বাংলা উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রচনা প্রাচুর্যে ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি সত্যিই একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। বিশেষ করে এদেশের কিশোর যুবক সকলেই তাঁর লেখার একনিষ্ঠ ভক্ত।

রোমেনা আফাজ বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর দুটি রহস্য উপন্যাস সিরিজ "বনহুর" এবং "রক্তে আঁকা ম্যাপ" এর মধ্য দিয়ে। এ যাবৎ তাঁর ১০৬টি উপন্যাস (আনুমানিক) প্রকাশিত হয়েছে। মহিলা সাহিত্যিকদের জগতে এতগুলো উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব শুধু মাত্র তাঁরই। রোমেনা আফাজ বিভিন্ন ধরণের উপন্যাস লিখেছেন। সামাজিক উপন্যাস দেশের মেয়ে, কাগজের নৌকা, শেষ মিলন, আলেয়ার আলো ইত্যাদি। রোমান্টিক উপন্যাস "জানি তুমি আসবে", "প্রিয়ার কণ্ঠস্বর", "ভুলের শেষে" ইত্যাদি। "মান্দীগড়ের বাড়ি", "রঙ্গীয়া"-কিশোর উপন্যাস। তার প্রথম রচনা "বাংলার চাষী" কবিতা অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক "বগুড়ার কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে তিনি আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার পান। নয় সন্তানের জননী রোমেনা আফাজ পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত সুখী ছিলেন। ২০১৮ সালে এ মহিয়সী নারী এ পৃথিবী থেকে চির প্রস্থান লাভ করেছেন।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকে প্রথম দুই দশকের মধ্যে আরও অনেক মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের প্রকাশ ঘটে। যারা গল্প, কবিতা, উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাফরুহা চৌধুরী এদেশের সাহিত্যিক হিসাবে বিশেষ করে

ছোটগল্পের লেখিকারূপে পরিচিত। শিক্ষকতার পাশাপাশি তৎকালীন "দৈনিক পাকিস্তান", "দৈনিক বাংলা" পত্রিকায় তিনি সাংবাদিকতার কাজ করেন। "দৈনিক পাকিস্তান" পত্রিকায় মিশ্রী ছদ্ম নামে সদর অন্দর কলামটি পরবর্তীকালে "দৈনিক বাংলা" পত্রিকায় স্বনামে "স্বর ব্যঞ্জন" কলাম লিখেন। ১৯৪৮ সালে তার প্রথম গল্প "দীনবন্ধু" ছাপা হয়। তিনি বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, নজরুল একাডেমি, বাংলা সাহিত্য পরিষদসহ বহু পদক লাভ করেন।

ড.মালিহা খাতুন

ড. মালিহা খাতুন ১৯২৮ সালের ২২ জুলাই পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও ১৯৫৯ সালে দর্শনে এম.এ পাস করেন। ড. মালিহা খাতুন অনেক বই এর প্রণেতা। মূলত তিনি নাট্যকার, উপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার ও কবি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ১৫টি। ১৯৭৭ সালে সাহিত্য বিনোদিনী পুরস্কার লাভ করেন।

মাহমুদা খাতুন

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১৯০৬ সালে পাবনায় জন্ম গ্রহণ করেন। সওগাত এবং বেগম পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি নিয়মিত লিখেছেন। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম "পসারিনী" ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য লেখা "মন ও মৃত্তিকা" ও "অরণ্যের সূর।" বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত, তাঁর কবিতার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

জেব-উন নেসা আহমদ

জেব-উন-নেসা আহমদ ১১ এপ্রিল ১৯৩৮ সনে সিলেটের লামাবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে বেগম জেব-উন-নেসা আহমদ শিশু কিশোরদের জন্য লেখায় উৎসাহিত হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৮টি। এছাড়া পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে আরও ৩৯টি গ্রন্থ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা পঁচাত্তরের ওপরে। ১৯৩৩ সনের ১২ জানুয়ারী মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে তিনি মারা যান।

মিসেস রাজিয়া মজিদ

মিসেস রাজিয়া মজিদ ১ জানুয়ারী ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ম্যট্রিক পাস করেন। ১৯৪০ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে তার লেখিকা জীবন আরম্ভ হয়। বর্তমানের রোববার, ইত্তেফাক, বেগম, দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক দিনকালে নিয়মিত লিখেছেন। তিনি "পেনশন" ছায়াছবির কাহিনীকার। টেলিভিশন ও রেডিও নাট্যকার। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন।

কবি আজিজা এন মোহাম্মদ

কবি আজিজা এন মোহাম্মদের জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে কবি আজিজা এন মোহাম্মদ কাব্যচর্চা করেছেন। তার বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নয় সন্তানের জননী আজিজা এন মোহাম্মদ ১৯৮৪ সালের ৬ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।

তৎকালীন সময় যে সকল মহিলারা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরাই লেখার জন্য কলমও হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে তো অবশ্যই অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলারা বিভিন্ন পেশায় অংশ গ্রহণ করতে থাকে সংখ্যায় কম হলেও। এদের মধ্যে সাংবাদিকতায় নুরজাহান বেগম "বেগম" পত্রিকায়। নার্সিং এ তুবা খানম, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ রাজিয়া খান।[৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ অবিভক্ত বাংলায় ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা

বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রাজনীতির গতি ধারাকে এগিয়ে নিতে যারা আন্দোলন করেছেন জেল-জুলুম সহ্য করেছেন এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করেছেন, এরা হলেন-সরোজিনী নাইডু, প্রিতীলতা ওয়াদ্দেদার, ইলা মিত্র, কল্পনা দত্ত, মনোরমা বসু, আশালতা বসু প্রমুখ নারী চরিত্র আজও আলোচিত।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয় এবং বিভিন্ন দাবী দাওয়া ও আন্দোলনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের বিরোধী আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন: ভাষা আন্দোলনে লিলি খান, নাদেরা চৌধুরী, ডঃ সাফিয়া খাতুন, ডঃ সুফিয়া ইবরাহীম, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার প্রমুখ। এছাড়াও ছাত্রী সমাজ ও নেতৃস্থানীয় মহিলারা এতে অংশ নেন। পাকিস্তান শাসনামলে দীর্ঘ ২৩ বছরে যে সব আন্দোলন হয়েছে তাতে পুরুষের পাশাপাশি নারী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারী যে কোন সমস্যা মোকাবিলায় নিজেদের জড়িত করতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করেনি। যার ফলশ্রুতিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারী ও অস্ত্র তুলে নেয়।[৪]

নারীর প্রতি চরম বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তারামন বিবি, সেতারা বেগমকে দূরে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের কর্ম প্রচেষ্টা এবং দেশপ্রেম বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি নারী নানান ধরণের সহযোগিতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সহজ করে তোলে।

একশত বছরের রাজনীতি ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনা করলে নারীর বর্তমান অবস্থানে পৌঁছানো যায়। নারীকে কোন যুগেই পুরুষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেনি। প্রয়োজনে ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং সামাজিক কুসংস্কার প্রবর্তন করে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে রেখেছে।[৫]

রাজশাহীর নাচোলে সাওতাল কৃষকদের আন্দোলনে ইলা মিত্র বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। নব্বই এর দশকে সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর পাশাপাশি জাহানারা ইমামকে আহবায়ক করে "ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি" গঠিত হয়।

১৯৯০ সালে গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে খালেদা জিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। খালেদা জিয়ার শাসনামল শেষ হলে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এভাবে ক্ষমতার পালাবদলের ক্রমধারায় এখনও নারী নেতৃত্ব বিরাজমান।

ভারতের জওহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে।

পাকিস্তানের মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোর কন্যা বেনজীর ভূট্টো রাজনৈতিক সফলতা ব্যর্থতার মধ্যে উত্তরাধিকারের ধারায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান তৈরী করে নিয়েছেন। বর্তমানে রওশন এরশাদ বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পর্যায় ক্রমে নারী নেতৃত্বের অবস্থান

১৮৬৩ সালে ভাগলপুর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীদের মুক্তির লক্ষ্যে।
১৮৬৬ সালে নারীরা প্রথম প্রকাশ্যে সভায় যোগদান করেন।
১৮৭৯ সালের ৮ই আগস্ট রাধারানী লাহিড়ী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ ৪১ জন মহিলা সদস্য নিয়ে বঙ্গীয় মহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮৮০ সালে বাংলার নারী আন্দোলনের মূল প্রেরণা হিসেবে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আবির্ভূত হন। তিনি ১৯১৬ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন। ১৯০১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি যোগ দেন।
১৯০২ সালে ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে ৫০ জন নারী যোগ দেন।
১৯০৫ সালে কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে নারীদের আলাদা সভায় যোগ দেন ৬০০ জন মহিলা। এদের অধিকাংশ ছিলেন বাঙালী।
এই বছরই ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির দেবী চৌধুরানীর সভাপতিত্বে বন্দে মাতারাম উচ্চারিত হয়।
১৯০৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থনে নারী কমিটি গঠিত হয়।
১৯০৯ সালে বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। ১৯১৭ সালে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে মন্টেগু চেমসফোর্ড মিশনের কাছে ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা স্মারকলিপি পেশ করেন। মুসলিম নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন বেগম হযরত সোবানী। তাদের দাবী ছিল নারী সমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থাসহ ভোটাধিকার লাভ। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকার ৬০ লক্ষ ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার দেন।
১৯১৯ সালে লেডি অবলা বসু প্রতিষ্ঠা করেন নারী শিক্ষা সমিতি।
১৯২০ সালে জ্যোতির্ময়ী গাঙুলীর নেতৃত্বে কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হয়।
১৯২১ সালে কবি কামিনী রায়, লেডি অবলা রায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় নারী সমাজ। একই সালে উর্মিলা দেবী 'নারী কর্ম মন্দির' গড়ে তোলেন।
১৯২৩ সালে ঢাকায় গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন আশালতা সেন।
১৯২৪ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লীলা নাগ গড়ে তোলেন 'দীপালী সংঘ'। তাদের পত্রিকার নাম ছিল 'জয়শ্রী'।
১৯২৫ সালে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব ভারতীয় নারী সংগঠন 'স্ত্রী ধর্ম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।
১৯২৭ সালে সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন, উইমেন এডুকেশন লীগ, অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্স গঠিত হয়।
১৯২৮ সালে সেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয়।
১৯৩০ সালে জোবেদা খাতুন চৌধুরীর নেতৃত্বে সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ'।
১৯৩২ সালে নারী পাচার সমস্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবীতে অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন গঠিত হয়।
১৯৩৩ সালে নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয়।
১৯৪২ সালে বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চট্টগ্রাম থেকে নেলী সেনগুপ্তা এবং ঢাকা থেকে আশালতা সেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন।
১৯৪৮ সালে কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও নিবেদীকা নাগকে যুগ্ম সম্পাদক করে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি।
১৯৫০ সালে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে ইলা মিত্র কারা বন্দী হন।

১৯৫২ সালের ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করে নারীরা প্রতিবাদ জানান।

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় লায়লা সামাদ এর নেতৃত্বে ও সুফিয়া কামালসহ নেতৃস্থানীয় মহিলাদের অংশগ্রহণে প্রথম প্রভাত ফেরী বের হয়।

১৯৫৪ সালে নারীদের ভোটে পৌরসভা এলাকায় ১৪ জন নারী নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ সালে বেগম দৌলতুননেছা, নুরজাহান মুরশিদ, বেগম রাজিয়া বানু প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯৬০-৬১ সালে জাহানারা আখতার ডাকসুর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬১ সালে পারিবারিক আইন প্রণীত হয় ও ১৯৬৩ সালে আইনটি গৃহীত হয়।

১৯৬৩-৬৪ সালে মতিয়া চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ডাকসুতে নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মতিয়া চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৬৭-৬৮ সালে ডাকসুর সহ সভাপতি হিসেবে মাহফুজা খানম নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনে নারী সমাজ যোগ দেয় ও আন্দোলনের প্রয়োজনে গড়ে তোলে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ।

১৯৭০ সালে কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কাজী রোকেয়া (কবীর), কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মালেকা বেগম, ডাঃ মাকসুদা নার্গিস রত্না, ডাঃ ফৌজিয়া মোসলেম, আয়েশা খানম, সাইদা কামাল টুলু, মনিরা আক্তার, ফরিদা আক্তার মুশতারী শফি, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, কৃষ্ণা রহমান ও মিসেস ফজিলাতুন নেসা ছাড়াও আরো অনেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

২৫ শে মার্চের পর সশস্ত্র যুদ্ধে সাহসী ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য দুজন নারী মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করেন। তারা হলেন ডাঃ সেতারা বেগম বীর প্রতীক এবং তারামন বিবি বীর প্রতীক।

সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী মুক্তিযোদ্ধারা হলেন, পাবনার শিরিন বানু, নরসিংদির ফোরকান বেগম, মিনারা বেগম, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, বরিশালের করুণা বেগম, রুনা দাস, রমা, বিথীকা বিশ্বাস, মিনতি ওঝা, মালতি হালদার ও তপতি মণ্ডল।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (১০অনুচ্ছেদ) এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন (২ অনুচ্ছেদ)।

১৯৭২সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে একজন নারী নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ বছরই বাংলাদেশ নারী পূণর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পূণর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রুপান্তরিত করা হয়।

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে প্রথম নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘ কর্তৃক প্রথম নারী দশক ঘোষণা করা হয়, যার সাথে বাঙ্গালী নারীও একাত্বতা ঘোষণা করে।

১৯৭৬ সালে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারী নিয়োগ অধ্যাদেশ জারী হয়। সরকারী রেজুলেশন বলে জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠিত হয়।

১৯৭৭ সালে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন নারী সদস্য মনোনয়নের বিধান করা হয়।

১৯৭৮ সালে মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

১৯৮০ সালে যৌতুক বিরোধী আইন পাস হয়।

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮২ সালে জাতীয়তাবাদী দলে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে খালেদা জিয়া যোগদান করেন ও ১৯৮৪ সালের ১০ ই মে দলীয় নেতৃত্ব লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সালে স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দিপালী সাহা শহীদ হন ও শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়।
১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বীকৃতি দান।
১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনা সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন।
১৯৮৭ সালে জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি নারী সংগঠন নিয়ে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ গঠিত হয়।
১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা প্রথম কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে।
শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৯ শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর রুপরেখা ঘোষণার ফল শ্রুতিতে ২৭ শে নভেম্বর গ্রেফতার ও গৃহবন্দী হন।
খালেদা জিয়াও ৮ বছর সংগ্রামী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলস্বরুপ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর গণ অভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হয়। ও তার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব বিরাজমান।[৬]
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্রে বলেছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় পুরুষের সমান পর্যায়ে নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার, সরকারী যে কোন দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।[৭]
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের বিগত তিনটি নারী বিষয়ক সম্মেলনের (মেক্সিকো সম্মেলন-১৯৭৫, কোপেন হেগেন সম্মেলন-১৯৮০, নাইরোবী সম্মেলন-১৯৮৫) মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ সমূহের একটি ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৭৫ হতে ১৯৮৫ কে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা। জাতিসংঘের ৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।
এই সম্মেলনে বাংলাদেশ সহ ১৮৭ টি দেশ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়।
সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতা লাভের সুযোগ সহ সমতার ভিত্তিতে সমাজের সার্বিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারীর অধিকার মানবাধিকার ইত্যাদি ঘোষণা ছিল বেইজিং ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত।
বিশ্বব্যাপী কতজন মহিলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং তাদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। বিশ্বের ইতিহাসে [মে ১৯৯১ পর্যন্ত] মাত্র ১৮ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন।[৮]
যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। ১৯৯০ সনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদ সমূহের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩.৫ জন ছিলেন মহিলা মন্ত্রী। ৯৩ টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রীই ছিলেন না। অধিকাংশ মহিলা মন্ত্রীই সফট বা নরম অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে বিবেচিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকেন।[৯]
দুই বাঙালী গৃহবধূ বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দলের তরুণ নেতা ও কর্মীদের বিপুল সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছেন। রাজনৈতিক অতীত পরিচ্ছন্ন থাকার কারণে দলের ভিতরের বিরোধী অংশের পক্ষ থেকে অনভিজ্ঞতার অভিযোগ ছাড়া, অন্য কোন সমালোচনার সম্মুখীন তাদের হতে হয় নাই। প্রথম দিকে তারা জনসভায় ভাষণ দিতেন সংক্ষিপ্ত ও লিখিত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেন দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে। কিন্তু এই দ্বিধা ও সংকোচ বেশিদিন থাকেনি। তারা উত্তরোত্তর এগিয়ে গেছেন প্রবল আত্মবিশ্বাসে।[১০]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারী সরাসরি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরবর্তীকালে আরো ৫০ জন নারী ৫০টি সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হন। ২০০৯ সালে গঠিত সংসদে এ যাবৎ কালে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬৩ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এদের মধ্যে ১৮ জন সরাসরি নির্বাচিত। মন্ত্রীসভায় ৬ জন নারী রয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু, শ্রম এবং জনশক্তি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা।

১৯৯৭ সালে দেশে প্রথম বারের মতো স্থানীয় সরকার পরিষদে সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালুর পর থেকে স্থানীয় সরকারের তৃণমূলের হাজার হাজার নারী সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশীদার হয়েছেন। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ১টি ভাইস চেয়ারম্যান পদ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর ফলে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ৪৮৩ টি উপজেলার মধ্যে ৩৩৫ টি উপজেলায় ৩৩৫ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ২ জন নারী। ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪ হাজার ২ শত ৬৪ জন পুরুষের পাশাপাশি ১৯ জন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দেশে প্রথম নির্বাচিত নারী মেয়র হন ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী।

অগ্রগতি

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো নতুন প্রজন্ম বা তরুণ ভোটার এবং নারী ভোটারের সংখ্যাধিক্য। ভোটকেন্দ্রে তাদের স্বতঃস্ফুর্ত উপস্থিতি গণমাধ্যমসহ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই নির্বাচনের ফলাফলে তারা প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী সারাদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬শত ৯৮ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার ১ শত ৪৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৫ শত ৪৯ জন। অর্থাৎ পুরুষ ভোটারের তুলনায় নারী ভোটাররা ১৪ লাখ ১৩ হাজার ৬ শত জন বেশি, শতকরা হিসেবে যা দাঁড়ায় পৌনে দুই শতাংশ বেশি। বাংলাদেশে এবারই প্রথম নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের চেয়ে বেশি দেখা গেলো। এর আগের প্রতিটি ভোটার তালিকায় নারী ভোটারের সংখ্যা বরাবরই পুরুষের চেয়ে কয়েক শতাংশ কম ছিলো।[১১]

৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন এর প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভী। তিনি দেশের প্রথম নির্বাচিত মহিলা পৌরপিতা অথবা পৌরমাতা। ইতোপূর্বে নারায়ণগঞ্জে বিগত ৮ বছর যাবত পৌরসভার প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন আইভী। তার পিতা ছিলেন নারায়ণগঞ্জ এর এক সময়ের পৌরপিতা মরহুম আলী আহমদ চুনকা। এ নির্বাচনে মোট মেয়র প্রার্থী ছিলেন পাঁচজন। ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.বি.বি.এস। অতএব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ইমেজের আইভীর ব্যক্তিগত সততা, বিনয়, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সবশেষে বিগত দিনে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অভিজ্ঞতাই তাঁকে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী হয়েও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বা সমর্থন থেকে তিনি বঞ্চিত হন।[১২]

২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ২৫ নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের ২১ জন্য আওয়ামী লীগের, জাতীয় পার্টির ১ জন ও স্বতন্ত্র ৩ জন। চেয়ারম্যান পদের নারীদের জয়ের এই সংখ্যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। ২৫ জনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে ৬ জন।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১০২ জন। তাদের মধ্যে জয়ী হয়েছেন ২৩ জন। ২০০৩ সালের নির্বাচনে ২৩২ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাদের মধ্যে ২২ জন জয়ী হন। ২০১১ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ২২৬ জন নারী, তাদের মধ্যে জয়ী হন ২৩ জন। এ সকল নির্বাচন হয়েছিল নির্দলীয়ভাবে। এবারের দলীয়ভাবে সম্পন্ন ইউপি নির্বাচনে সব মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৬৬৭ টিতে, বিএনপি ৩৬৭ টিতে, জাতীয় পার্টি ৫৭ টিতে, জাসদ ৮ টিতে, জাতীয় পার্টি জেপি ৫ টিতে, ওয়ার্কার্স পার্টি ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ ৩ টিতে এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও জাকের পার্টি ১টি করে ইউপিতে জয় পেয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৮৮৮টি ইউপিতে।
কমিশন সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট ৬২ জন নারী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দ্বিতীয় ধাপে তা কমে ১০ জন হয়। নির্বাচিত হন ২৫ জন।[১৩]

নারী উন্নয়নে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪৪ এবং ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

* বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের আলোকে ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা যা নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য একটি মাইলফলক স্বরূপ, সেই দলিলটি ২০১১ সালে সংশোধিত ও পরিমার্জিতরূপে নতুন করে ঘোষণা করা হয়। এতে নারীবান্ধব বেশ কিছু নতুন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সংযোজিত হয়েছে। যেমন, মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, দুর্যোগ কবলিত নারী, অনগ্রসর নারী এবং প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

* নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নারীদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

* নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সব স্তরে ৩৩ % নারী কোটার কারণে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

* জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, উপজেলা পরিষদের ২টি ভাইস চেয়ারম্যান পদের মধ্যে একজন অবশ্যই নারী হতে হবে।

* নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য বেশ কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে; যেমন, নারী নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা দমন আইন, এসিড নিক্ষেপ দমন আইন ইত্যাদি। পাশাপাশি উচ্চ আদালত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছে। যৌন নিপীড়ন ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে এমন রায় কার্যকর করা হয়েছে।

* নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রথা প্রবর্তন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার পদক্ষেপ সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

* সাম্প্রতিক সময়ে সরকার বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং বিধবা ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে।

* উচ্চ আদালত বিভাগ ২০০৯ সালে একটি রুল জারি করে। যার মাধ্যমে সকল শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যেন শিক্ষার্থী ভর্তির ফর্মে মায়ের নাম লেখা হয়, হয় এককভাবে নয়তো বাবার নামের পাশাপাশি।

* নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যে সব বাংলাদেশী নারী বিদেশি নাগরিক বিয়ে করেছেন এখন থেকে তাদের সন্তানেরা বাংলদেশি নাগরিকত্ব অর্জন করবে। আগে শুধুমাত্র বাংলাদেশি পুরুষ যারা বিদেশি নাগরিক বিয়ে করেছেন তাদের সন্তানেরা বাংলাদেশি নাগরিকত্ব অর্জন করতো।[১৪]

জাতীয় বাজেট ও নারী

সকল মন্ত্রণালয়ে নারীর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। আমাদের মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দ খুবই কম থাকে। [২%] জাতীয় রাজস্ব বাজেটে নারীরা সুবিধা পায় খুবই কম। সরকারি ভাতা, সুবিধা, ভর্তুকি বেশির ভাগ পুরুষরাই ভোগ করেন। [কেননা মাত্র ১৫% নারী সরকারি কর্মকর্তা]। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটিং-এর অংশ হিসেবে ২৫ টি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। [২০১১-২০১২-তে যা ছিল ২০টি] এবং জেন্ডার সংবেদনশীল ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্ধ হয় মোট বাজেটের ২৬.২৬% এবং নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের জন্য ছিল ০.৬৮ শতাংশ [২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ০.৭৮% কম]। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের নারী ও শিশু ৮৫.৫০%, প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৫২.৮৩, স্থানীয় সরকার ৫০.৭৪%, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ৮৫.১২%, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ৬০.৮২%, পরিবেশ ও বন ৫৮.১৩%, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৪২.৩৭%, পানি সম্পদ ৬১.৪৮% বরাদ্দ [মোট বাজেটের] রাখা হয়। শিক্ষায় রাখা হয়েছে ৪৩.৩০%।[১৫]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ উন্নয়ন মূলক কাজে নারীগণ

বাংলাদেশের নারী শ্রমশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী আরও জানা যায়, আগামী এক দশকে এই নারী শ্রমশক্তি বর্তমানে ৩৪% থেকে ৪২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের জিডিপিতে ১.৮% যোগ করবে। পেরুতে অনুষ্ঠিত আইএমএফ-এর বৈঠকে এই তথ্য উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিমইয়ঙ্গ কিম লিমা। বাংলাদেশের বিবিএস-এর প্রতিবেদনেও দেখা যায়, আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে এই নারী শ্রমশক্তি মোট শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশে দাড়াবে। ২০০১ থেকে শুরু করে ২০১১ সালে এই শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২.৭ মিলিয়ন থেকে ৫.৫ মিলিয়ন। এই বৃদ্ধি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক।

আমাদের বাণিজ্যমুখী রপ্তানিশিল্প খাতে, বিশেষ করে পোশাক এবং হিমায়িত চিংড়ি খাতে মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য। এ সমস্ত শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৯০%। এতে বোঝা যায় নারীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটা সহায়ক।[১৬]

আমিনা বেগম-২০১১ সালের উদ্যোক্তা পুরস্কার

আমিনা বেগম "আমির টেইলার্স এন্ড বুটিকস" এর মালিক একজন ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি তার স্বামীকে হারান এবং তার পর থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করে যুক্তরাজ্যস্থিত 'ইয়ুথ বিজিনেস ইন্টারন্যাশনাল' (YBI) নামীয় একটি সংগঠন। এই পুরস্কারটি শিল্পমন্ত্রী দিলিপ বড়ুয়া লন্ডন মিউজিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে আমিনা বেগমের হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য (YBI) বিশ্বব্যাপী ৩৮ টি দেশে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।[১৭]

আনোয়ারা বেগম-ন্যাশনাল সার্ভিসের সেবা ট্রেডের কর্মী

যে সব নারীর জীবনের অনেকটা সময় ঘরের কোণে পেরিয়ে গেছে তারাও আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিজ চেষ্টা ও পরিশ্রমের বদৌলতে। সমাজের জন্য কিছু করার ইচ্ছে থেকে বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। ন্যাশনাল সার্ভিস পাল্টে দিয়েছে তাদের জীবনচরিত। তাদের কেউ স্বাস্থ্যকর্মী, কেউবা ন্যাশনাল সার্ভিসের শিক্ষা ট্রেডে কর্মরতা। তাদেরই একজন ন্যাশনাল সার্ভিসের সেবা ট্রেডের কর্মী আনোয়ারা বেগম।

সংসারে অভাব না থাকলেও পরিবারে তার অবহেলিত অবস্থান তাকে পীড়া দিত। সংসারের সব সিদ্ধান্ত তার স্বামীর এক্তিয়ারে থাকায় নিজেকে খুব অসহায় মনে করতেন আনোয়ারা বেগম। কিন্তু মুক্তির স্বাদ মিলল ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে। তিনি নাগেশ্বরী উপজেলার সেটেলমেন্ট অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। কুড়িগ্রামে ন্যাশনাল সার্ভিসে নারী কর্মীদের কাজের মান খুব ভালো। এখানে মোট কর্মীর ৪০ শতাংশই নারী। এ সার্ভিসের কর্মীদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫ বছর বিধায় বেশির ভাগ নারী গৃহিনী হওয়া সত্ত্বেও ট্রেনিং সেশন থেকে প্রত্যেক নারী তাদের নিজ নিজ কাজে চমক দেখিয়ে চলেছেন। এখানে চাকুরিতে কোনো নারী কোটা নেই। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চাকুরিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী এগিয়ে চলেছে জীবনের জায়গান গেয়ে।[১৮]

Progressive award-২০১২ পেলেন ৭ নারী উদ্যোক্তা

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং গ্রীন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি যৌথভাবে ৭ জন নারী উদ্যোক্তা এবং দুজন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করেছে। এই পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন আরফিন ফারুক, মনোয়ারা বেগম, খাদিজা রসুল, মনিরা মতিন, ফরিদা বেগম, বুলবুল চৌধুরী ও নুরুন নাহার। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রচার মাধ্যমে অবদান রাখার জন্য সময় টিভির প্রতিবেদক ফারহা তানম এবং

ইংরেজি দৈনিক The Independent-এর প্রতিবেদক আবু সাজ্জাদকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের প্রত্যেককে ১০, ০০০ টাকা, একটি ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।[১৯]

অনন্যা শীর্ষ দশ-পুরস্কার ২০১৩

বাংলাদেশের নারীরা যে যুগ-যুগান্তের পশ্চাদপদতার বেড়াজাল ভেদ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে, শত প্রতিকূলতার মাঝেও অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ অনন্যা শীর্ষ দশ এর এই পুরস্কার প্রাপ্তরা। এই পুরস্কারপ্রাপ্তরা তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে উজ্জ্বল অবদান রেখে প্রমাণ করেছে-বাংলাদেশের নারীরাও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর নারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সামর্থ্যই শুধু রাখে না, অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদেরকে অতিক্রম করে যেতেও সক্ষম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবারে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বরা হচ্ছেন-মাহফুজা খানম (নেতৃত্ব), লুনা দোহা (প্রযুক্তি উদ্যোক্তা), নুরুন্নাহার বেগম (সংগঠন), ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা (মানবতা), চন্দনা মজুমদার (সংগীত), ফিরদৌস কাদরী (বিজ্ঞান), মিলি বিশ্বাস (প্রশাসক), খোরশেদা বেগম (পরিবেশ), ফারজানা রূপা (সাংবাদিকতা) এবং ড. কাশফিয়া আহমেদ (কৃষি উন্নয়ন)।[২০]

পারভীন ইসলাম -'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' লাভ করেন

'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' কার্যক্রমের আওতায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও রোকেয়া দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে সাভার উপজেলায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সাভার শাখার সভাপতি পারভীন ইসলাম পুরস্কার লাভ করেন। তিনি শিক্ষা ও চাকরি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, পারভীন ইসলাম শিক্ষকতা পেশায় দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই কেবল নয়, নিজ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারেও তিনি আন্তরিক অবদান রেখে চলেছেন। তিনি অত্র এলাকার শিশু, নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। দুঃস্থ শিশুদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি বর্তমানে কাতলাপুর বিদ্যানিকেতন নামে পরিচিত, এটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জন্য তিনি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছেন।

পারভীন ইসলাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ব্যতীত উপজেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দুর্নীতি দমনে কাজ করছেন। তিনি মনে করেন পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সমতা, নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং এ জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তাকে সাভার উপজেলা চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'জয়িতা' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।[২১]

সাবিনা আক্তার -'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' লাভ করেন

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সাভারের সাবিনা আক্তার 'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' কার্যক্রমের আওতায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও রোকেয়া দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাভার জেলা শাখার সদস্য হিসেবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের কাজ করছেন।

সাবিনা আক্তার বুটিক শিল্পী হিসেবে কাজ করেন। বুটিকের কাজে পোশাক নিয়ে তিনি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মেলায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এলাকার মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বুটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত বুটিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক মুক্তিই পারে নারীকে সকল বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে। নারীর অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য তার এই আন্তরিক ও একনিষ্ঠ উদ্যোগের

স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের 'জয়িতা' পুরস্কারে ভূষিত হন। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তাকে সাভার উপজেলা চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'জয়িতা' পুরস্কার প্রদান করা হয়।[২২]

সাহিদা আক্তার খানম-'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' লাভ করেন

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি সাহিদা আক্তার খানম আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ [২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর] এবং বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী পরিচালিত 'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় 'সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান' নারী ক্যাটাগরিতে করিমগঞ্জ উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জ জেলা পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জয়িতার সম্মানে ভূষিত হন। উল্লেখ্য, সাহিদা আক্তার খানম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ করিমগঞ্জ উপজেলা শাখার একনিষ্ঠ কর্মী। তার জন্ম ১৯৪২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। তার পৈতৃক বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বৈবাহিক সূত্রে তিনি করিমগঞ্জের বাসিন্দা। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। করিমগঞ্জে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নারীদের স্বাবলম্বী করা ছিল তার ব্রত। করিমগঞ্জে তিনি 'বেগম রোকেয়া' নামে পরিচিত। তিনি সকলের প্রিয় খালাম্মা। বয়সের ভারে তার কোনো ক্লান্তি নেই। সমাজের কাজ করতেই তিনি বেশি ভালোবাসেন।[২৩]

মাসিংনু মার্মা -'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'-এ স্বর্ণপদক পেয়েছেন

বান্দরবানের মাসিংনু মার্মা বিয়ের গয়না বিক্রি করে শুরু করেছিলেন স্ট্রবেরি চাষ। ২০ শতক জমি বর্গা নিয়ে তাতে স্ট্রবেরি ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দেন এলাকায়। সেই ২০ শতক জমি বেড়ে এখন দাড়িয়েছে ১ একর ২০ শতকে। "হিলি ফ্রুটস অ্যান্ড এগ্রোভ্যালি" নামে একটি খামারও হয়েছে। সেখানে স্ট্রবেরির পাশাপাশি ড্রাগন ফল, টমেটো, কালমেঘ, ধনিয়া চাষ করছেন মাসিংনু মার্মা। সব মৌসুমে সব ফসলের চারা উৎপাদনের জন্য একটি গ্রিন হাউস নির্মাণের কাজও শুরু করেছেন।

পেশায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ। কৃষিতে অবদান রাখায় বাংলা ১৪১৯ সালের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'-এ স্বর্ণপদক পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি তার হাতে তুলে দেন এ পুরস্কার।[২৪]

কবিতা বিশ্বাস-মানবাধিকার ও জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন

সদর উপজেলার শেখহাট ইউনিয়নের বাকলি গ্রামের স্থানীয় মেয়ে কবিতা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের "বাঁচতে শেখা" সংগঠন থেকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করে নির্যাতিত নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ২০০৫ সালে গড়ে তোলেন 'জ্যোতি নারী ও শিশু উন্নয়ন' নামের একটি সমিতি। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ২০১৫ সালে মানবাধিকার ও জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের সংবিধানে ও সংগঠনে নারীর জন্য বিশেষ অধিকার ও উদ্যোগ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর জন্য বিশেষ অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই মূলনীতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে:

১। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে, কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

২। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

৩। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

৪। নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। আবার,

১। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

২। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না। কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৩। যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য, তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়। সে রূপ যে কোন শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[২৬]

এছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ৫ বছর পর বাংলাদেশ সরকার নারীদের সমস্যা সমাধান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৯৬ সালে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার্থে এবং নারী উন্নয়নের স্বার্থে সরকার "বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ সরকার মনোনীত একটি নির্বাহী কমিটি দ্বারা এই সংস্থা পরিচালিত হয়। এই সংস্থার প্রধান কার্যাবলী হচ্ছে আর্থ–সামাজিক। জাতীয় মহিলা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো:

- নারীর অধিকার সংরক্ষণ করা,
- মেয়েদের হাতে কলমে কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া,
- মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা,
- জাতীয় মহিলা সংস্থা ছাড়াও বাংলাদেশে নারী উন্নয়নমূলক আরও কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন:
- Mother's Club of Social Welfare Directorate, Women's Cooperative of the Integrated Rural Development Programmers.
- Bangladesh Handicrafts Cooperatives Federations প্রভৃতি।[২৭]

স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলে প্রধান বেসরকারী সংস্থাগুলো নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। যেমন, 'আপওয়া' এটি 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' নাম নিয়ে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। একই ভাবে Business and Career Women's Association এবং Woman's Voluntary Organization পুনরুজ্জীবিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' শক্তিশালী ও কার্যকরী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৮]

বিশ শতকের আশির দশক থেকে বাংলাদেশে নারী সংগঠনগুলো ব্যাপক হারে গড়ে উঠেছে। ১৯৮১ সালের এক জরীপ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ৩২৬ টি মহিলা সংগঠন আছে। জরীপে ২১৪ টি সংগঠনের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে ৮২.৫% বেসরকারী সংগঠন এবং ১৩.১% সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংগঠন। ১.৪ % সংগঠন বিদেশী সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত। [২৯]

নারী প্রগতিবাদী সংগঠনগুলি একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা সংগঠনভেদে বিভিন্ন রকম হয়। ৫৭ শতাংশ সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ২০ জনের মধ্যে। পক্ষান্তরে ২১.৫ শতাংশ সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১ থেকে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৫% সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩০ অথবা তারও বেশি।[৩০]

সংগঠনগুলির ৩১.৩ অফিস ভাড়া করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ৫০.৫% সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রধান সংগঠকের অথবা সদস্যদের বাড়ীতে কার্য পরিচালনা করে থাকে এবং ৭.৫% সংগঠনের কোন অফিস ঘর নেই বলে জানা যায়। [৩১]

মহিলা সংগঠনগুলি মূলত মহিলাদের অধঃস্তন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনের সংখ্যানুপাত ২৬.৮ শতাংশ। অন্যদিকে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনের সংখ্যানুপাত ১৮.৫ শতাংশ। তারমধ্যে বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্যে ১৭.৩ শতাংশ, মহিলা নেতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৪.৪ শতাংশ, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ১১.৭ শতাংশ এবং সংস্কৃতি কর্মকান্ডের লক্ষ্যে ১১.৩ শতাংশ সংস্থা কাজ করছে।[৩২]

বাংলাদেশে অবস্থিত মহিলা সংগঠনগুলি কোন না কোন ভাবে নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে নারী উন্নয়ন ও প্রগতি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি সংগঠন ও এনজিওর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি নারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত নারীদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়। বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে নারী উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টায় জনগণকে সহযোগিতা ও সম্পৃক্তকরণ এবং নাগরিকের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব দানকারী মন্ত্রণালয় হিসাবে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তদারকীর দায়িত্ব পালন, নারী উন্নয়ন বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, নাগরিক উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ৬৪ টি জেলা ও ৪১২ টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যাবলী

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৭টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। যা নিম্নরূপ:

* নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (MGD) ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
* বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
* দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
* বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্যাভ্যাসসহ সার্বিক দুর্দশা লাঘবে মাসিক ভাতা প্রদান করা।
* দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা।
* বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।
* নারীর প্রতি সহিংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
* নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
* নির্যাতিত, দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
* নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
* মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসা সহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
* কর্মজীবি ও শ্রমজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
* বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা' এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত হস্তশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।
* স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী সহ সংগঠনসমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
* নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের পটভূমিতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল এটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা সংগঠন হিসেবে নতুন করে সংগঠিত হয়ে, 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'। এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভানেত্রী ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। সংগঠনের প্রথম থেকে ২১ বছর পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদিকার

দায়িত্বপালন করেন বিশিষ্ট লেখিকা মালেকা বেগম। ১৯৯১ সাল থেকে সাধারণ সম্পাদিকা হয়েছেন আয়শা খানম। বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৫৪ টি জেলায় এবং ১০টি থানায় এই সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে সক্রিয় জেলা শাখা ৩৯ টি এবং ১৫টি শাখা সাংগঠনিক ভাবে আশানুরূপ সক্রিয় নয়। এছাড়া ৬টি জেলায় সাংগঠনিক যোগাযোগ রয়েছে। ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯৫, ০০০। সদস্যদের ৮০ শতাংশ শিক্ষিত, ৭০ ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য, ৫ ভাগ উচ্চবিত্ত ও উচ্চ শিক্ষিত। বাকী অংশ গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত নারী সমাজ। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোনের জাতীয় ধারা থেকে নারী আন্দোলন যেন বিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে নারী আন্দোলনে অগ্রণী এই সংগঠন সচেতন রয়েছে।[৩৩]

আইন ও শালিস কেন্দ্র

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) একটি আইনী সহায়তা প্রদান ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৬ সালে কয়েকজন সাহসী সমাজকর্মীর সমন্বয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূলত মানবিক অধিকারের উপর কাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনুমোদন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। শ্রেণিবিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, ধর্মীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করাই আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে আইন ও সালিশ কেন্দ্র যে সকল বিষয়ের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত করছে তা হলো:

* সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করণ।
* লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।
* নারী অধিকার ও নারী নির্যাতন বন্ধ।
* শ্রম অধিকার।

এছাড়াও তদন্ত বিভাগ, আইনী সহায়তা কেন্দ্র, প্রকাশনা, সভা সমিতি, বিচার, সালিশ, সমঝোতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও লাইব্রেরী সুবিধা প্রদান করাও তাদের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

নারীপক্ষ

১৯৮৩ সালে নারী আন্দোলনমুখী সংগঠন হিসেবে নারীপক্ষ জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে মহিলা অধিদপ্তর ও এনজিও ব্যুরোর সাথে নিবন্ধন করে। এর সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন। সদস্যরা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের। নারীপক্ষ নারীর অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর অধঃস্তন অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষে গঠিত একটি সদস্যভিত্তিক সংগঠন। নারীর ব্যক্তি অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর প্রতি সহিংসতা ও সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীপক্ষ কাজ করছে। সামাজিকভাবে নারী অংশগ্রহণের উপর বর্তমান সীমাবদ্ধতা দূরীভূত করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব অঙ্গনের সচেতন, স্বাধীন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে নারীর আত্মপ্রকাশ ও অবাধ চলাফেরার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নারীপক্ষ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এনজিও ও নারী উন্নয়ন কর্মসূচি

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, আশা, আরডিআরএস, কারিতাস, বিএনপিএস, আইভিএস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আরো কিছু বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও নারীদের উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন সময়ে এ সকল এনজিও উন্নয়ন কর্মসূচী, যেমন-Women in Development (WID), Women and Development (WAD), Gender and Development (GAD), নীতি অনুসরণ করে থাকে। বিভিন্ন কর্মসূচী অনুসরণ করে বাংলাদেশের প্রায় তিন শতাধিক এনজিও কাজ করছে।[৩৪]

যার কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ব্র্যাক

ব্র্যাক নারীর সামগ্রিক অবস্থানের আলোকে তার কর্মসূচিগুলো নির্ধারণ করছে। যেমন, ঋণদান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এই তিন প্রধান কর্মসূচিতে নারী এবং মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণই উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাক মনে করে সমাজে নারীর নিম্ন অবস্থানের প্রধান কারণ শিক্ষার নিম্নহার, মজুরি স্বল্পতা, গড় আয়ুর নিম্নহার, সম্পদ এবং তথ্যপ্রাপ্তিতে অপর্যাপ্ত সুযোগ। তাদের অধঃস্তন অবস্থার জন্য শুধুমাত্র সরাসরি সম্পদের মালিকানার অভাবই দায়ী নয় বরং সমাজের সকল ক্ষেত্রে অধিকতর পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক আদর্শই কর্মক্ষেত্রে ও গৃহে শ্রমের লিঙ্গীয় বিভাজন সৃষ্টি করে থাকে। বেচে থাকার মৌলিক শর্ত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্র্যাক লক্ষ্য করেছে যে, মহিলাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হলেও নারীর গতিময়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার বেশির ভাগই নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষের দ্বারা। এই কারণেই মনে করা হয় নারী অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা ও সম্পদের সমবন্টন। নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীর অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। এছাড়া কাজের ক্ষেত্রেও কর্মীদের মধ্যে কর্মময় সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমতা অর্থাৎ কর্মময় পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য ব্র্যাক নিম্নোক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[৩৫]

- পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন (Positive Discrimination)-Gi লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োগ;
- সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বৈষম্য দূর করে কর্মময় পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে (Gender Quality Action learning) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু;
- গ্রাম পর্যায়ে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development) প্রশিক্ষণ চালু;
- সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার অনুসরণ করা;
- তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যার সাথে জাতীয় সমস্যা সংযুক্ত করা;
- নারী কর্মীদের প্রতি অসম্মান ও কটুক্তিকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা;
- নারী ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার ও বুলেটিন প্রকাশ করা;
- জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সকল কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য Gender Resource Centre Ges Women Advisory Committee গঠন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে কর্মীদের সুবিধার লক্ষ্যে ব্র্যাক চাইল্ড সেন্টার বা শিশুকেন্দ্র চালু করা।[৩৬]

প্রশিকা

প্রশিকা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। প্রশিকা বিশ্বাস করে যে পুরুষতন্ত্র সমাজের মূল সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ফলে পুরুষতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটাতে হলে নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু থেকেই সমন্বিত বহুমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচির সার্বিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল থেকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক সমন্বয়করণ কাজ শুরু করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রশিকার কর্মী ও দলীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন:

- সংস্থার সর্বস্তরের নারী পুরুষের সম্পর্কের সমতা নিশ্চিত করা;
- সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সম-অধিকার, সম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

- ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট নারীর সামাজিক পশ্চাৎপদতা, বঞ্চনা এবং তাদের বিশেষ চাহিদাসমূহ বিবেচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং
- নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনে অনুকূল শর্ত ও পরিবেশ তৈরি করা; জেন্ডার ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানিকীরণ।[৩৭]

কারিতাস

মূলত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমই এ সংস্থার লক্ষ্য হলেও মানব সম্পদ উন্নয়ন এর প্রধান লক্ষ্য এবং ১৯৭৯ সাল থেকে Development Entension Education Program (DEEDS) বা কর্মসূচি রেখেছে। যাতে ৫০% মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দেখা যায় যে, মহিলা প্রাথমিক গ্রুপ, পুরুষ গ্রুপ অপেক্ষা সঞ্চয় প্রবণতা, শিশু শিক্ষা ও সচেতনতার দিক থেকে দক্ষতা অর্জন করছে। ফলে Integrated Women Development Program (IWDP) কর্মসূচীতে নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি স্থির করা হয় যাতে বলা হয়েছে পুরুষতন্ত্র অথবা পুরুষাধিপত্য মূলক সামাজিক বৈষম্যপূর্ণ নারী অবস্থানের জন্য দায়ী। ব্যক্তি পুরুষ নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধক না হলেও পুরুষাধিপত্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষ সহায়তা করতে পারে।

কারিতাস এর কর্মসূচি নিম্নরূপ:

- অধিকাংশ কর্মী নারী এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নারীদের সচেতনতা ও বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;
- আয় বৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা;
- তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠির সমস্যার সাথে জাতীয় সমস্যা যুক্ত করা;
- নারী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আন্দোলন সংগঠিত করা;
- জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিশোরী ও শিশুদের হার বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা;
- আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহায়তা প্রদান করা, এবং
- নারী ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার, বুলেটিন প্রকাশ করা এবং সংগঠনসমূহকে নিয়ে নেটওয়ার্কিং তৈরি করা।[৩৮]

পরিশেষে বলা যায়, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যুক্ত কয়েক শত সংগঠন গ্রাম বাংলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, মানবাধিকার পরিষদ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, মহিলা আইনজীবি সমিতি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নারী প্রগতি সংস্থা, মহিলা সমিতি, নারীপক্ষ সহ বহু এনজিওর নাম উল্লেখযোগ্য। নারী প্রগতি সংগঠন ও এনজিওগুলি ইস্যুভিত্তিক জোট তৈরী করে ১৯৮৭ সালে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বেইজিং সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় ২২০ টি সংগঠনের ফোরাম। ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিন হত্যা ও অন্যান্য ইস্যুতে 'সম্মিলিত নারী সমাজ' গঠিত হয়েছে। এই ফোরাম থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সমঅধিকারের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন দাবি তোলা অব্যাহত রয়েছে।

উইমেন ফর উইমেন

১৯৯৪ সালের শেষে উইমেন ফর উইমেন শুধুমাত্র সচিবালয় হিসেবে নয়, যেহেতু এই সংগঠনের নেতৃত্বে একদল পেশাদার দক্ষতায় সমৃদ্ধ শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং তার সঙ্গে Activism-এর সংমিশ্রণ এমন সম্পদ সমৃদ্ধ একটি গবেষণা সংগঠন হিসেবে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজের পর সম্মেলনের পর ফিরে এসে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে উইমেন ফর উইমেন। বিশেষ করে নিয়মিত জার্নাল প্রকাশ 'ক্ষমতায়ন' নামে বছরে ২টি জার্নাল প্রকাশ অর্থাৎ গত ২০ বছরে ৪০টি বাংলা জার্নাল প্রকাশ করেছে। এছাড়াও ইস্যুভিত্তিক প্রতিবেদন, বই, পুস্তিকা, পোস্টার মোটামুটি নিয়মিতভাবে বের হয়ে আসছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র

এখানে আইন ও সালিশ কেন্দ্র সম্পর্কে আরো কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো-

মানবাধিকারের মূল চেতনায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রয়াত ব্যারিস্টার সালমা সোবহান এবং তার সহযোগী বন্ধু মানবাধিকার চেতনায় সমৃদ্ধ ড. হামিদা হোসেন তাদের উদ্যোগে সৃষ্ট এই সংগঠন মূলত সামগ্রিক মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে ব্যাপক ও বহুমাত্রিকভাবে কাজ করে। সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও এর উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এ ক্ষেত্রে তৃণমূলে ও সারাদেশে মানবাধিকার চেতনাকে ব্যাপকভাবে বিস্তার ও জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তোলার মূল লক্ষ্যে এই সংগঠনের কাজ পরিচালিত হয়। সেখানে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি জেন্ডার জাস্টিস ইস্যুটি মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সংগঠনের বেশ কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ রয়েছে। এর কর্মপদ্ধতিতেও তা দৃশ্যমান। যেমন, নাটক, গণ নাটক, চলচ্চিত্র, প্রচারপত্র এসবের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মানবাধিকার সচেতন ও অধিকতর মানবাধিকার সংবেদনশীল ও জেন্ডার সংবেদনশীল করার ক্ষেত্রে একক ও মিলিতভাবে বিশেষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকায়ও প্রতিবাদী প্রতিরোধকারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট এদের জাতীয় আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক বিশেষ করে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক অনেক বিস্তৃত ও শক্তিশালী। বৈশ্বিক মানবাধিকার আন্দোলন, যেমন, উইমেন লিভিং আন্ডার মুসলিম ল, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এইসব মানবাধিকার সংগঠনের সাথে এদের রয়েছে সরাসরি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

এই সংগঠনের মূল ও অন্যতম নেতা DON-এর সদস্য। ফলে এইসব বৈশ্বিক চিন্তাধারা ও জাতীয় প্রয়োজনের আলোকে অনেক মানবাধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ২০১৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের মূল উদ্দেশ্য ও কাজ হচ্ছে RALLYING HUMAN RIGHTS ACTIVISM। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০০৯' শীর্ষক প্রবন্ধের তথ্য অনুযায়ী তাদের কাজ:

- জনগণের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় আইন ও নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা;
- বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা ও গণ মাধ্যমের সহায়তায় মানবাধিকার সংক্রান্ত তথ্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া;
- সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি বিশেষ করে নারী, শ্রমিক ও শিশুদের বিনা পয়সায় আইন সহায়তা দেয়া।

নারী পক্ষ

এখানে নারী পক্ষ সম্পর্কে আরো কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো-

নারীর ব্যক্তি অধিকার বিশেষ করে নারী স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে এই সংগঠনটি কাজ শুরু করে এবং ১৯৯৪ এর ICPD এবং ৯৫-এর বেইজিং কর্মপরিকল্পনার আলোকে নারীর প্রজনন অধিকার যে নারীর ব্যক্তি অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই কথাটি এই সংগঠন জাতীয় পরিসরে দৃশ্যমান করে তুলে। নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারভিত্তিক নানামুখী কর্মসূচি এই সংগঠনটির রয়েছে। নারীর প্রজনন অধিকার যে নারীর ব্যক্তি অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই বিষয়টি জাতীয় পরিসরে অন্যান্য সংগঠনের সাথে এই সংগঠনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ সিডও সনদ নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে/ মিলিতভাবে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়। বিশেষ করে শিরিন হকের উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠায় IWRAW-AP এর মূল সংগঠক মালয়েশিয়ার পেশায় শিক্ষাবিদ, সংগঠক, নারী মানবাধিকার নেত্রী শান্তি দারিয়ামের সহযোগিতায় সিডও বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেশের ভিতরে ও বাইরে বাংলাদেশের নারী মানবাধিকারের বিশ্বাসী ও প্রগতিমনা সংগঠকদের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। ১৯৯৫-এর পরবর্তী কালে ২০০৩-০৫ পর্যন্ত এই নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সিডও বিষয়ক বিকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং পরবর্তীতে ২০০৪-এর পরে স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এসব সংগঠনের সাথে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নারী নির্যাতন ইস্যুটি নিয়েও তাদের বেশ কিছু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা আছে। এ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী কাজ ও আছে। যেমন পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও সকলকে জানানো। Domestic Violence Act-এর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করেছে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

পাঠ্যসূচি, কারিকুলাম অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা চালায় বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। সিডও সনদ প্রচার এবং এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা এবং এ ধরণের কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতিসংঘ সিডও সনদকে নারী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সনদ হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সহ যে সব সংগঠন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বাজেট নিয়ে শুরু থেকে যে কয়েকটি সংগঠন কাজ করে সেখানেও বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ অন্যতম।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি

১৯৯৫-এর পর প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইন সংস্কারের কাজে, আইন প্রয়োগের কাজে, নারী ও কন্যাশিশু পাচার প্রতিরোধে, নারী ও মানবাধিকারের পক্ষে রীট পিটিশনের মাধ্যমে অধিকারের আইনি স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বিশেষ উদ্যোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও সামগ্রিক মানবাধিকার ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অ্যাড. সালমা আলী ব্যক্তিগত ও সংগঠনগতভাবে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেন।

স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

স্টেপস ১৯৯৪ সাল থেকে নারী শিক্ষায় তরুণ নারীদের মাঝে সুফিয়া কামাল বৃত্তি প্রদান, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করছে। এই ক্ষেত্রে জাতীয় ও তৃণমূলে সমমনাদের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। স্টেপস সামাজিক প্রতিরোধ কমিটিতে উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়াও সিডও সনদের বেসরকারি বিকল্প

প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সচিবালয়ের ভূমিকা পালন করছে এবং এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় সিডও সনদের প্রচার ও বাস্তাবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ব্লাস্ট

৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের কতক মানবাধিকার সংগঠক এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে কিছু সংগঠন তার মধ্যে ব্লাস্ট অন্যতম। কতকক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগী ভুমিকা রয়েছে যা বাংলাদেশের নারীর আইনি অধিকারের ক্ষেত্রে নারী অবস্থানকে দৃঢ় করা এবং জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনি কাঠামো এবং সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে ও বেইজিং-উত্তর বাংলাদেশে নারী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

দীর্ঘ চার দশক ধরে এদেশের নারীসমাজ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম অধিকার ও সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে চলেছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, রাষ্ট্র ও পরিবার কর্তৃক নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ, নারী অধিকার বিশেষ করে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীকে সম্পৃক্ত করার ধারাবাহিক আন্দোলনের এক পর্যায়ে [২০০২ সালের মে মাসে] দেশের ২৫টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি'। সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক দেশ গঠনের লক্ষ্যে আন্দোলন করে আসছে। বর্তমানে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটিতে নারী, মানবাধিকার উন্নয়ন সংগঠন, প্রতিবন্ধী নারী, আদিবাসী নারী, শ্রমিক সংগঠন সহ ৬৮টি সংগঠন একত্রে একই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি এক সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এছাড়াও নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা ও বাস্তবায়নের দাবিতে, নারী নিযার্তন প্রতিরোধে এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সমতাভিত্তিক দেশ ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে থাকে। শুরু থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই প্ল্যাটফরমের সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্ব পালন করে আসছে। দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সংগঠন গুলোর মধ্যে এক ধরণের ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে যা নারী আন্দোলনকে গতিশীল করছে। [৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের কিছু বরেণ্য নারী ও তাদের কর্ম

শেখ হাসিনার সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত-গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনার পিতা বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাতা ফজিলাতুন্নেসা। তাঁরা পাঁচ ভাইবোন। সকলের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। তাঁর অন্যান্য ভাইবোন হচ্ছেন শেখ কামাল, শেখ রেহানা, শেখ জামাল এবং সর্বকনিষ্ঠ শেখ রাসেল। তাঁদের মধ্যে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালো রাতে পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাতা ফজিলাতুন্নেছাসহ সকলেই সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী কর্মকর্তার হাতে নিহত হন।

পিতাকে খুব একটা না পেলেও মায়ের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়ায় দাদা-দাদীর স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই গ্রামে তাঁর শৈশব ও কৈশোরজীবন অনেকটা আনন্দের মধ্যেই কেটেছে।

শেখ হাসিনার শিক্ষাজীবন শুরু হয় টুঙ্গিপাড়ার এক পাঠশালায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং পুরনো ঢাকার রজনী বোস লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য হলে ৩ নম্বর মিন্টু রোডের বাড়িতে চলে আসেন।

ঢাকায় আসার পর শেখ হাসিনাকে টিকাটুলির 'নারী শিক্ষা মন্দির' বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালে তিনি 'আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়' থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬৭ সালে 'ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ' (বর্তমানে বদরুন্নেসা সরকারি মহাবিদ্যালয়) থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই পিতার সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে তিনি রাজনীতির দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। ফলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) -এ ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্ন না করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই 'ইডেন মহাবিদ্যালয়' থেকে ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং রোকেয়া হলের ছাত্রলীগ শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্রলীগ নেত্রী হিসেবে তিনি আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৬ দফা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে এবং শুরু করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই সময়ে তাঁদের পরিবারে নেমে আসে নিদারুণ ক।" এই কষ্টকর সময়ে ১৯৬৮ সালে পরমাণুবিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার পর শেখ হাসিনাসহ পরিবারের সকল সদস্যকে ঢাকা শহরের অন্য এক বাড়িতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই গৃহবন্দী অবস্থায় শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে তাঁর কন্যা সায়মা পুতুলের জন্ম হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার আগে শেখ হাসিনা সপরিবার ও ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে ইউরোপ যান। পিতা, মাতা ও ভাইসহ পরিবারের সকলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি ও তাঁর বোন শেখ রেহানা জার্মানীতে ছিলেন, সকলের হত্যাকাণ্ডের খবর যখন তাঁর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি বেলজিয়ামের তৎকালীন রাজধানী হেগ-এ অবস্থান করছিলেন। পরিবারের আর সকলের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে শেখ হাসিনার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বিশেষত পিতার মৃত্যুর ফলে তাঁর জীবন এক নতুন মোড় নেয় এবং পিতার স্বপ্ন সুখী, সমৃদ্ধশালী ও গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সামরিক শাসকদের নিষোধাজ্ঞার ফলে দেশে ফিরতে না পারলেও নির্বাসনে থেকে তিনি সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে মিছিল ও জনসভা করতে থাকেন। লন্ডনে

এক বিশাল জনসভায় তাঁর বক্তৃতা তাঁকে পিতার যোগ্য উত্তরসূরী এবং একজন রাজনৈতিক নেতার গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

তখন দেশে ফেরার মত পরিস্থিতি না থাকায় তিনি স্বামী-সন্তানসহ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে সর্বসম্মতভাবে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত করলে। ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত অধ্যায়ের দীর্ঘদিন পর ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং এসেই তখনকার কাণ্ডারীবিহীন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পর তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব নিয়ে তিনি গনমানুষের নেত্রী হিসেবে প্রবলভাবে অবির্ভূত হন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ১৯৯৬-২০০১ সালের মেয়াদকালে দেশে ও বিদেশে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিমণ্ডলেও বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেন। এ জন্য তিনি অচিরেই নিজেকে বিশ্বনেতৃত্বের কাতারে শামিল করতে সক্ষম হন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডক্টরেট ও ডি-লিট উপাধি দেয়া হয়।

এ পর্যন্ত-প্রাপ্ত তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১) ১৯৯৭ সালে বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে এবং ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইভনিভার্সিটি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব ল।

২) ২০১০ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি

৩) পার্বত্য চট্রগ্রামের ২৫ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য শান্তি-চুক্তি করার কারণে ইউনেস্কো Felix Houphouet-Boigny শান্তি-পুরষ্কার, ১৯৯৮

৪) মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক মহাত্মা গান্ধী পুরষ্কার, ১৯৯৮

৫) কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদানের জন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার Ceres Medal, ১৯৯৯

৬) আর্থ সামজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ র‍্যানডল্‌ফ কলেজ, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত পার্ল এস বাক পুরষ্কার, ২০০০

৭) রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অবদানের জন্য মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল এন্ড মিলেনিয়াম এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক মাদার টেরিজা আজীবন সম্মাননা পুরষ্কার, ২০০৬

৮) স্বীয় কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি পুরষ্কার,

৯) ২০০৯ শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরষ্কার

১০) ২০০৯ বাংলাদেশের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) অর্জনে, বিশেষ করে শিশুমৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ পুরষ্কার, ২০১০

১১) নিজ দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও বিশ্বের আর্ত মানবতার কাজে আত্মনিয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ Global Diversity Award, ২০১১

তা ছাড়া তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ২৩ টির মত ডক্টরেট ও ডি-লিট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি লেখালেখির সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এ পর্যন্ত-তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে, ওরা টোকাই কেন, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র: কিছু চিন্তা-ভাবনা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন, আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম, সহে না মানবতার অবমাননা, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন, বিপন্ন গণতন্ত্র, লাঞ্ছিত মানবতা প্রভৃতি। [৪০]

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

খালেদা খানম। ডাক নাম-পুতুল। জন্ম: ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয়। পিতামহ: হাজী সালামত আলী। মাতামহ: তোয়াবুর রহমান। বাবা: এস্কান্দার মজুমদার। মা: বেগম তৈয়বা মজুমদার। বেগম তৈয়বা মজুমদার মীর জুমলার বংশধর। স্থায়ী নিবাস: দিনাজপুর শহরের মুদিপাড়া। জনাব এস্কান্দার মজুমদার ছিলেন ব্যবসায়ী। খালেদা জিয়ার স্কুল জীবন শুরু হয় দিনাজপুর মিশনারি কিন্ডার গার্টেনে। তিনি দিনাজপুর গার্লস স্কুল থেকে এস এস সি ও সুরেন্দ্র নাথ কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করেন। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার শাহবাগ হোটেলে তাঁদের বিবাহত্তোর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হন। খালেদা জিয়াও স্বামীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৬৬ সালের ২০ নভেম্বর তাদের প্রথম সন্তান তারেক রহমান পিনো এবং ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় সন্তান আরাফাত রহমান কোকো জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মেজর জিয়াউর রহমান চট্রগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাট্যালিয়নে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে যোগদান করেন। খালেদা জিয়াও দুই সন্তানসহ স্বামীর সাথে চট্রগ্রামে বসবাস করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ মে খালেদা জিয়া দুই সন্তান নিয়ে চট্রগ্রাম থেকে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ওঠেন বড় বোন খুরশীদ জাহান হকের বাসায়। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই পাক সেনারা তাকে এস কে আবদুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি বাড়িতে অন্য কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দুই শিশুপুত্রসহ বন্দি করে রাখে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনাদের বন্দিশালা থেকে দু সন্তানসহ খালেদা জিয়া মুক্তি পান। ওঠেন চাচা শ্বশুরের পল্টনের বাসায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার ২০ দিন পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারির ১ম সপ্তাহে মেজর জিয়াউর রহমান রণাঙ্গন থেকে ঢাকায় আসেন এবং স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে মিলিত হন। ১৯৭২ সালের জুন মাসে মেজর জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। ৬ নং মইনুল রোডের সরকারি বাসায় জিয়া পরিবার বসবাস শুরু করেন। ১৯৮১ সালের ২৯ মে দিবাগত রাতে ৩০ মে সুবহে সাদিকের আগে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর কুচক্রী অফিসারদের হাতে জননন্দিত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। বাংলা জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র ক্রান্তিলগ্নে ১৯৮২ সালের ৪ জানুয়ারি খালেদা জিয়া বিএনপি'র প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং একই সালের মার্চ মাসে বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ১০ মে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯ মার্চ ১৯৯১ তিনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি তিন-চতুর্থাংশ আসনে জয়ী হয় এবং তিনি দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের ১ অক্টেবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নেতৃত্বে বিএনপি ও চারদলীয় জোট ২১৩ টি আসনে জয়লাভ করে। তিনি তৃতীয় বারের মত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে সংসদ ভবনের সাব-জেলে রাখা হয়। ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ২০০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর বিএনপি'র জাতীয় কাউন্সিলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।[৪১]

ইউনেস্কোর স্মারক "ট্রি অব পিস" অর্জন করেছেন শেখ হাসিনা

অতি সম্প্রতি নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনেস্কোর স্মারক ট্রি অব পিস অর্জন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক এ স্মারকটি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

একই মাসে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার অব অটিজম বিষয়ে যুগান্তকারী অবদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সাউথ-ইস্ট-এশিয়ান রিজিয়ন এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক হেলথ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা হোসেন পুতুলকে। প্রায় একই সময়ে হোটেল সোনার গাঁওয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ্যাওয়ার্ডটি পুতুলের হাতে তুলে দেন সংস্থাটির পরিচালক। সায়মা হোসেন পুতুল এদেশের অটিজম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের প্রবক্তা ও প্রধান। তার উদ্যোগে ২০১১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক অটিজম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বিশ্বসভায় অটিজম ও বাংলাদেশের অটিষ্টিক সংক্রান্ত সমস্যাবলি ও অবস্থান তুলে ধরেছেন। আমরা এই সাফল্যে গর্বিত ও তাদের অভিনন্দিত করি।[৫৫]

সায়মা ওয়াজেদ হোসেন (পুতুল) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন (পুতুল) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান আগামী চার বছরের জন্য পুতুলকে এ দায়িত্ব দেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবুল হক শাকিল। তিনি বলেন, অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সায়মা ওয়াজেদ যে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন, তারই স্বীকৃতি পেলেন তিনি।[৫৪]

টিউলিপ রেজয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের হ্যামস্টেড অ্যান্ড কিবার্ন আসনে লেবার পার্টি থেকে জয় লাভ করেন

যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বাংলাদেশি প্রার্থীদের বিজয়ের সুখবরে মুখর ছিল বিশ্ব মিডিয়া। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি ও শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লেবার পার্টি থেকে লন্ডনের হ্যামস্টেড অ্যান্ড কিবার্ন আসনে এক হাজার ১৩৮ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেন। ৩২ বছর বয়সী টিউলিপ ভোট পেয়েছেন ২৩ হাজার ৯৭৭ টি (৪৪ শতাংশ) আর কনজারভেটিভ দলের প্রার্থী সাইমন মার্কাস পেয়েছেন ২২ হাজার ৮৩৯ টি (৪২ শতাংশ) ভোট। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক মাত্র ১৬ বছর বয়সে লেবার পার্টিতে যোগ দেন।[৬১]

টিউলিপ সিদ্দিকী শ্যাডো মিনিস্টার

টিউলিপ সিদ্দিকী যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টি থেকে "শ্যাডো মিনিস্টার ফর আর্লি এডুকেশন" হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কোনো নারী তো বটেই, কোনো নাগরিকেরও এ সাফল্য অর্জন প্রথম। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। তিনি গত বছর হ্যামপ্স্টেড এবং কিলবান আসন থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, টিউলিপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভগ্নি শেখ রেহানার কন্যা।[৬৫]

ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী -বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী জাতীয় সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন গত ১৩ জুলাই ২০১৩। তিনি জাতীয় সংসদের ১৩ তম স্পীকার। ইতোপূর্বে স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হওয়ায় এ পদটি শূন্য হয়। স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী অত্যন্ত বিরল মেধার অধিকারী। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাক্ষর রেখেছেন। তিনি লন্ডনের Essex বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি এল. এল. এম ও PhD. ডিগ্রী লাভ করেন ২০০০ সালে। সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ছিলেন।

তিনি BRAC, BILIA, ASK, BLAST ও Prip Trust সহ বহু আইন সংক্রান্ত সংস্থা ও আইন প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন একনিষ্ঠ মানবাধিকার কর্মী।[৪৯]

শিরীন শারমিন চৌধুরী-সিপিএ সভাপতি

সম্প্রতি বাংলাদেশের স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী অ্যাসোসিয়েসন এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাঙালী নারী যিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ভারতের বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের পর এই প্রথম একজন নারী এ পদ অলংকৃত করে দেশকে গৌরবান্বিত করলেন। তাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।[৫৬]

আমিরা হক-জাতিসংঘের আন্ডারসেক্রেটারী জেনারেল ও মাঠ সহায়তা বিভাগের প্রধান

জাতিসংঘের আন্ডারসেক্রেটারী জেনারেল ও মাঠ সহায়তা বিভাগের প্রধান হয়েছেন আমিরা হক। ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছেন আমিরা হক। কর্মজীবনের শুরুতে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। এরপর আফগানিস্তান, ইউএনডিপির সদর দপ্তর হয়ে ১৯৮৫-৮৭ পর্যন্ত নারীদের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিলের (ইউনিফেম) দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। এরপর মালয়েশিয়ায় ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ও জাতিসংঘের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনসহ লাওস, পূর্ব-তিমুর ও সুদানে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভূমিকা রাখেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের ভাষায়, 'আমিরা হক একজন অত্যন্ত কর্মঠ ও দক্ষ কর্মচারী। জাতিসংঘ পুলিশ বাহিনীতে প্রায় ২০ হাজার নারী সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা অনবদ্য ও অনন্য।' পূর্ব তিমুর ২০০২ সালে ইন্দোনেশিয়ার যাতাকল থেকে ভঙ্গুর এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছিল। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ছিল ১৩৪ তম। ২০০৬ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে আমীরা শুরু করেন পুনর্গঠন। বর্তমানে দ্রুত জিডিপি উন্নয়নকামী দেশের মধ্যে দেশটি ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। এজন্য আমীরা হক এর বলিষ্ঠ আহ্বান 'যুদ্ধকে বিদায় উন্নয়নকে স্বাগতম' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আমীরা হক এর বর্তমান পদটি অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। বহু জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমিরা হকের বর্তমান কার্যকাল চার বছর। তিনি এ পদে একজন কুটনীতিকের পদমর্যাদাও বহন করেন। জাতিসংঘের এ পদটি একটি দেশের একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর পদমর্যাদার সমান। বিশ্বশান্তির দূত এই বাঙালি-নারীকে নিয়ে বিশ্ব-বাঙালি আজ গর্বিত ও আনন্দিত।[৫২]

কর্নেল নাজমা বেগম-জাতিসংঘ পুরস্কার পেলেন

বাংলাদেশ থেকে আইভরি কোস্টে পাঠানো ৫৬৯ সদস্যের Medical Contingent-এ নারী কমান্ডার হিসেবে দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব দানের জন্য কর্নেল নাজমা বেগমকে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছে জাতিসংঘ। এ ছাড়া তিনি ২০১৬ সালের জাতিসংঘ Military gender advocate of the year পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।[৬৬]

শিপা হাফিজা-হলেন জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল এর উপদেষ্টা

সম্প্রতি ব্র্যাক-এর ডাইরেক্টর জেন্ডার জাষ্টিস এ্যান্ড ডাইভারসিটি শিপা হাফিজা জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন এর ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ এর সদস্য পদ লাভ করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেলেন।[৪৭]

সেলিনা হোসেন-সার্ক সাহিত্য পুরস্কার পেলেন

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ২০১৫ সালের সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সার্ক সম্মেলনে ভারতের আগ্রার একটি হোটেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এ সাহিত্য পুরস্কার তাঁকে অর্পণ করা হয়। এ পুরস্কারের মাধ্যমে তিনি ৫০ হাজার রুপি, একটি বিশেষ উত্তরীয়, মানপত্র এবং ক্রেস্ট লাভ করেন।[৫৮]

স্বপ্নারা খাতুন-ব্রিটেনের সার্কিট জাজ

ব্রিটেনের সার্কিট জাজ হিসেবে নিয়োগ পেয়ে সর্বত্র প্রশংসা কুড়িয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সিলেটের স্বপ্নারা খাতুন। ব্রিটেনে বিচারক পদে তিনিই প্রথম কোনো বাংলাদেশি হিসেবে নিয়োগ পেলেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য ক্রিস গ্রেলিংগ লর্ড চ্যান্সেলরের সুপারিশের ভিত্তিতে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ব্যারিস্টার স্বপ্নারা খাতুনকে ব্রিটেনের সার্কিট জাজ হিসেবে নিয়োগ দেন। ব্যারিস্টার স্বপ্নারা খাতুন সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মোল্লাপুর ইউনিয়নের মোল্লাগ্রামের নিম্বর আলীর কন্যা।[৫৯]

রুশনারা আলি-যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে নির্বাচিতসংসদ সদস্য

রুশনারা আলি যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি। ১৯৭৫ সালে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ গ্রামে তার জন্ম। তিনি ৭ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডের পূর্ব লন্ডনে অভিবাসিত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জনস কলেজে তিনি দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি ধীরে ধীরে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ২০০৭ সনের এপ্রিলে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বাউ এলাকার জন্য নির্বাচিত হন। ৬ মে ২০১০ সনে তিনি ১১ হাজার ৫৭৪ ভোট বেশি পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি ও ২০১০ সনে নির্বাচিত প্রথম তিন জন মুসলিম মহিলা এমপির একজন। তিনিই প্রথম কোনো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হিসেবে টানা দ্বিতীয় বারের মতো ২০১৫ সালেও ব্রিটেনের এমপি নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশি অধ্যুষিত বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বাউ আসন থেকে লেবার পার্টির প্রার্থী রুশনারা আলি ৩২ হাজার ৮৮৭ ভোট পান।[৬০]

ড. রূপা হক-ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি পদে নির্বাচিত হলেন

কিংস্টন ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক রূপা হক ইংরেজি লেখক ও কলামিষ্ট হিসেবেও পরিচিত। তিনি ইলিংয়র লন্ডন বরোর ডেপুটি মেয়র পদে দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তরাজ্যের এ বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মাত্র ২৭৪ ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রূপা হক বাজিমাত করেছেন। ৪৩ বছর বয়সী রূপা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন আসন থেকে এমপি পদে নির্বাচিত হলেন।[৬২]

সারা হোসেন-আন্তর্জাতিক সাহসী নারী' পুরস্কার পেলেন

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার (ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড) পেয়েছেন বাংলাদেশের আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী সারা হোসেন। শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, লৈঙ্গিক সমতা এবং ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে নারীদের সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত করে থাকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। সারা হোসেন দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আইনি লড়াই করেন। এ ছাড়াও তার লড়াই ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং নারীদের প্রতি অসম্মানজনক শাস্তির বিপক্ষে। ২০০৭ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬০১ টি দেশের ১০০ জন সাহসী নারী এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।[৬৭]

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম-দেশের প্রথম নারী উপাচার্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম নারী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম। প্রথম নারী উপাচার্য হয়ে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে কাজ করব। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।[৫৩]

খালেদা একরাম-বুয়েটের প্রথম নারী উপাচার্য

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর উপাচার্য খালেদা একরাম গত ২৩ মে, ২০১৬ বাংলাদেশ সময় ২টা ৫ মিনিটে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ খালেদা একরামকে ১৩ মে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে স্কয়ার হাসপাতাল থেকে ব্যাংকক হাসপাতালে স্থানান্তার করা হয়। খালেদা একরাম ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া শোক জানিয়েছেন-শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ। প্রফেসর খালেদা একরাম প্রায় ৪২ বছর শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।[৬৪]

শারমীন শবনম সাফল্য পেল

পারদানা কলেজের ছাত্রী শারমীন শবনম যুক্তরাজ্যের নর্থ আম্ব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১০-১১ সেশনে একাডেমিক সাফল্য হিসাবে Deans Award পেয়েছে। স্বাধীন গবেষণা, জাতীয় শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ, জাতীয় জার্নালে আর্টিক্যাল প্রকাশ, ক্রিয়েটিভ আর্টসে দক্ষতা, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে তার এ সম্মাননা প্রাপ্তি।[৪৮]

রুমানা মনজুর মাস্টার্স শেষ করেছেন

২০১১ সালে স্বামীর আক্রমণে চোখ হারান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রুমানা মনজুর। তারপর মা ও মেয়ে আনুশেহকে নিয়ে কানাডা যান চিকিৎসা ও পড়াশোনার জন্য। সম্প্রতি ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়ে থিসিস-এর মাধ্যমে মাস্টার্স শেষ করেছেন। শীঘ্রই আইন বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে পি.এইচ.ডি করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেন। দুর্ঘটনায় চক্ষু হারালেও মনোবল হারাননি। এজন্য সকলের দোয়া প্রার্থী তিনি।[৫০]

রোকেয়া আফজাল মেট্রো চেম্বারের সভাপতি পুনরায় নির্বাচিত

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও আরলিংকস লিমিটেডের চেয়ারপারসন রোকেয়া আফজাল রহমান মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এমসিসিআই)-এর সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। এমসিসিআইয়ের সভায় রোকেয়া আফজাল রহমানকে ২০১৪ সালের জন্য পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। দেশের অন্যতম উদ্যোক্তা রোকেয়া আফজাল রহমানের আরলিংকস ছাড়াও আর আর কোল্ডস্টোরেজ লিমিটেড, আরিস হোল্ডিস, ইমান কোল্ডস্টোরেজ, মিডিয়া ওয়ার্ল্ড, মাইডাস ফাইনান্সিং, মিডিয়া স্টার ও রিলায়েন্স ইনস্যুরেন্সে বিনিয়োগ আছে। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইমেন্স এন্ট্রাপ্রেনিউরস, ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।[৫১]

নাজনীন সুলতানা-বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি পদে

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নাজনীন সুলতানা কাজে যোগ দিয়েছেন। নাজনীন সুলতানা নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন শেষে অবসরকালীন ছুটিতে ছিলেন। নাজনীন সুলতানাকে দেওয়া হয়েছে মানবসম্পদ. তথ্যপ্রযুক্তি, ঋণ, তথ্য বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রানীতি, বিনিয়োগ ও অপারেশন বিভাগ।[৪৬]

ওয়াসফিয়া নাজরীন-কিলিমানজারোর চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা

বাংলাদেশের পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন। ২ অক্টোবর ২০১১ তানজানিয়ায় অবস্থিত কিলিমানজারো পর্বতের ১৯ হাজার ৩৪০ ফুট উঁচু দীর্ঘ উহুরু চূড়া জয় করে লাল সবুজ পতাকা উড়ালেন। এর আগে ১২ সেপ্টেম্বর এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইবরাহীম এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়াজ মোরশেদ পাটওয়ারী কিলিমানজারো জয় করেন।

ওয়াসফিয়া নাজরীন বাংলা স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে Bangladesh on Seven Summit শীর্ষক পৃথিবীর সাত মহাদেশের সাত শীর্ষ জয় করার অভিযান ঘোষণা দেন। এই পর্বত বিজয়ের মাধ্যমে Seven Summit-এর একটি ধাপ অতিক্রম করলেন। এই অভিযানের শুরুতে তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগকে বলেন, তিনি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ৪০ তম জন্মদিনসহ এদেশের নারীর অগ্রগতির অবস্থান তুলে ধরতে চান।

পেশায় উন্নয়ন কর্মী চট্টগ্রামের মেয়ে ওয়াসফিয়া নাজরীন চাকুরি ছেড়ে দিয়ে Seven Summit Foundation গঠন করেন। কিলিমানজারোর পর আগামী জানুয়ারিতে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত অ্যাকোনকাগুয়া অভিযানে যাবেন বলে জানা গেছে। এই Summit অভিযানে তাকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘর সহযোগিতা করেছে।[৪২]

ওয়াসফিয়া-বর্ষসেরা অভিযাত্রী

এভারেস্টজয়ী দ্বিতীয় বাংলাদেশি নারী ওয়াসফিয়া নাজরীন ন্যাশনাল জিওগ্রাফির বর্ষসেরা অভিযাত্রীর খেতাব পেয়েছেন। সম্প্রতি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ওয়েবসাইটে বর্ষসেরা অভিযাত্রীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ১০ জনকে বর্ষসেরা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। দুঃসাহসী অভিযানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে নিজের অঙ্গীকার ও কর্মতৎপরতার জন্য ওয়াসফিয়াকে ২০১৪ সালের অন্যতম বর্ষসেরা হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে বলে ওয়েবসাইটে বলা হয়। ২০১২ সালের ৯ জুন দ্বিতীয় বাংলাদেশি নারী হিসেবে এভারেস্ট চূড়ায় ওঠেন ওয়াসফিয়া নাজরীন। এর আগে বাংলাদেশী প্রথম নারী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার।[৫৭]

প্রফেসর সিদ্দিকা কবীর বিশিষ্ট পুষ্টি বিশেষজ্ঞ-এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

রান্নাকে শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ করে ৩১ জানুয়ারি ২০১১ রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হৃদরোগসহ বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় প্রায় দু'মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন।

সিদ্দিকা কবীর ১৯৩৫ সালে পুরান ঢাকার মকিম বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ইডেন কলেজে গণিতের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে খাদ্য, পুষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এম এস ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি ঢাকাস্থ সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।

তিনি রান্না বিষয়ক বিভিন্ন বই লিখে বাঙালি পাঠক সমাজে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত। এই বইগুলো হচ্ছে রান্না খাদ্য পুষ্টি, খাবার দাবার কড়চা..., Bangladeshi Curry Cook Book, পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা। এ ছাড়া বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রান্নার একটি বইও তিনি সম্পাদনা করেছেন। তার রচিত ইংরেজি বইটি শুধু স্বদেশেই নয় বিদেশেও বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত। তিনিই প্রথম টিভি চ্যানেলে রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের প্রবক্তা। সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি অনুষ্ঠানটি টিভিতে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

পুষ্টি ও রান্নায় অবদানের জন্য তিনি Woman of the year (WEB), 'শেলটেক', ও 'অনন্যা' শীর্ষ দশ-এর পুরস্কার লাভ করেন। সিদ্দিকা কবীর নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য।[৪৪]

ড. রাজিয়া খান আমিন-এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

প্রয়াত রাজনীতিবিদ ফরিদপুরের মৌলানা তমিজুদ্দিন খান ও রাবেয়া হায়াত খানম-এর কনিষ্ঠা কন্যা রাজিয়া খান অত্যন্ত মেধাবী ও একজন কুশলী লেখিকা ছিলেন। স্কুলজীবন থেকেই তার লেখালেখি শুরু। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায়ই পারঙ্গম রাজিয়া-কবিতা, উপন্যাস সহ অন্তত ১২ টি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বটতলার উপন্যাস'-এর জন্য ১৯৯৭ সালে একুশে পদক, ১৯৯৮ সালে অনন্যা পুরস্কার ও শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ধনুকল্প', 'প্রতিচিত্র', 'দ্রৌপদী', 'পাদবিক', 'চিত্রকাব্য', 'হে মহাজীবন' ছাড়াও ইংরেজিতে Argus under Anastasia, Cruel April, A different Spring (জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুনের অনুবাদ) সুধীজনের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তার ব্যতিক্রমী ভাষাশৈলী দিয়ে মধ্যবিত্ত, নাগরিক জীবনের মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নার আলেখ্য দিয়ে তার সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি PEN (১৯৫৬) Visa Visitors programme (১৯৭৮), বার্সেলোনা PEN সম্মেলন, জুরি বোর্ডে পর্তুগাল ফিল্ম ফেস্টিভালে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু কালে স্বামী আনওয়ারুল আমিনসহ পুত্র কায়সার তমিজ আমিন ও ডেইলী স্টার এর সাংবাদিক আশা মেহরিন খানসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন।[৪৫]

ভাষাবিজ্ঞানী ড. আফিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন

৯০ বছর বয়সে ১৯ এপ্রিল ২০১৬, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন ড. আফিয়া দিল (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তার জন্ম ১৯২৭ সালে ঢাকায়, পিতার নিবাস নরসিংদীতে। মেধাবী আফিয়া দিল ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করেন। কর্মজীবনে পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। ইডেন কলেজে অধ্যাপনার (১৯৫৪-১৯৬১) মধ্য দিয়ে তার শিক্ষকতা জীবনের শুরু। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

২০০৩ সাল থেকে আফিয়া দিল যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর অ্যালিয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (সাবেক ইউনাইটেড স্ট্রেটস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৫৬ সালে লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ড. আফিয়াই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পান। আফিয়া দিলের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে, Bengali Nursery Rhymes: An International Perspective of the Bengali Language, তার বাংলায় লেখা বইয়ের মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের পত্র, ক্যারোলাইন প্রাটের I learn from Children

(বাংলা অনুবাদ ১৯৫৫), যে দেশ মনে পড়ে (১৯৫৭, ভ্রমণকাহিনী), হেলেন কেলারের লেখা My Teacher (বাংলা অনুবাদঃ হেলেন কেলারঃ আমার শিক্ষক)। এছাড়া স্বামী আনোয়ার দিলের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন Women's Changing Position in Bangladesh: Tribute to Begum Roakeya এবং Developing Secondary Education in West Pakistan। তাদের ৪০ বছরের যৌথ গবেষণার ফসল ইংরেজিতে রচনা করা ৭৭৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থ Bengali language movement and creation of Bangaldesh

(বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ)[৬৩]

এর মাঝেই নারীবার্তা লক্ষ্য করে যে, ব্যাপক পশ্চাৎপদতার মধ্যেও অর্জনগুলো একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়-

- ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের রায় হয়েছে বহু আগেই, কিন্তু এ নিয়ে সুপীমকোর্টের পুনর্বিবেচনায় বলা হয়েছে, ধর্মীয় পন্ডিতরা ফতোয়া দিতে পারলেও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তাদের থাকবে না। ফতোয়ার নামে শাস্তি একটি ফৌজদারি অপরাধ।
- নারী-উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন প্রেক্ষিতে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার (অনুচ্ছেদ ২৫.২) ছাড়াও উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি ও বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে নারীর পূর্ণ অধিকার থাকবে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক আইন পাশ করা প্রয়োজন হবে।
- বাস্তবায়ন হলো ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি। এটি নবজাতকদের জন্য সুখবর হলেও নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে।
- সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আমাদের নারী ক্রিকেটারদের। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে যুক্তরাষ্ট্রকে ১০ উইকেটে হারিয়ে নারী ক্রিকেটারদের ওয়ান-ডে স্টেটাস অর্জন করেছেন। ২০০৭ থেকে খেলে সালমা খাতুন হলেন ক্যাপটেন ও খাদিজাতুল কোবরা ম্যান অব দ্য ম্যাচ খেতাব অর্জন করলেন।
- এদেশের প্রথম নারী মেয়র হলেন ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী। তিনি ১ লাখ ৮০ হাজার ভোটে (প্রায় ১ লাখের উর্ধ্বে) বিশাল ব্যবধানে নিকটতম প্রার্থীকে পরাজিত করেন।
- নারী অপরাধীদের মোকাবেলায় বাংলাদেশে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান গঠিত হলো।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগ পেলেন নাজনীন সুলতানা।
- ওয়াসফিয়া নাজরীন কিলিম্যানজারো শীর্ষে ও সেভেন সামিটের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছেন।
- বেগম রোকেয়া পদক পেলেন বর্ষিয়ান আইনজীবী মেহেরুন্নেসা খাতুন ও অধ্যক্ষ হামিদা খানম (মরনোত্তর)।[৪৩]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের এ অর্জন অনেক চড়াই উৎরাই এর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তারপরও নারী থেমে থাকে নি, এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। বাংলাদেশের সংবিধান ও নারীদেরকে বিভিন্ন অধিকার প্রদান করেছে ও করে যাচ্ছে। তারপরও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত নারী সামাজকে সহায়তার জন্য গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি নারীবাদী সংগঠন, যেগুলো নারীদেরকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। যার ফলে নারীগণ সমাজের বিভিন্ন সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। আনিসুজ্জামান, *মহিলা পরিষদ জার্নাল, বিষয়: উচ্চ শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন*, প্রকাশকাল: দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১২ খ্রি. পৃ. ০৭-১২
২। ফেরদৌস আরা খানম, *ইসলামে নারীর মর্যাদা: বাংলাদেশে তার অবস্থান (১৮০০-১৯৯০)*, পি এইচ ডি থিসিস: অক্টোবর-২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৩৮-৩৪৮
৩। ফেরদৌস আরা খানম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯-৩৬৫
৪। বেবী মওদূদ, *বাংলাদেশের নারী*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ১৯
৫। বেবী মওদূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৬। তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, নিউ এজ পাবলিকেন্স, ঢাকা-১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৪২১
৭। মালেকা বেগম "নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", *সমাজ নিরীক্ষণ/২২*। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৬
৮। ড. নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", *নারী ও রাজনীতি*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা-১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ২৩
৯। ড. নাজমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১০। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রি. ।
১১। শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, *সাক্ষরতা বুলেটিন*, সংখ্যা ২১৫, প্রকাশকাল: মাঘ ১৪১৮, জানুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৩
১২। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-অগ্রহায়ণ: ১৪১৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর: ২০১১ খ্রি. পৃ. ১
১৩। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১০
১৪। শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২
১৫। ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া, পাঠ্য-আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বাংলাদেশের নারীর অবস্থান, *মহিলা সমাচার*, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র ১৪২০, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪ খ্রি. পৃ. ১৫
১৬। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল:কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ২
১৭। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-অগ্রহায়ণ: ১৪১৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর: ২০১১ খ্রি. পৃ. ৯
১৮। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-অগ্রহায়ণ: ১৪১৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর: ২০১১ খ্রি. পৃ. ৯-১০
১৯। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৭-৮
২০। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩-মার্চ ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৮
২১। *মহিলা সমাচার*, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র ১৪২১, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১৩০
২২। *মহিলা সমাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৩। *মহিলা সমাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৪। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২১, জানুয়ারী-এপ্রিল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১১

২৫। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১১

২৬। নাসরিন সুলতানা, *উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী অংশগ্রহণ ও অংশিদারীত্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, এম ফিল থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত, পৃ. ১১৯

২৭। *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা*, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ খ্রি. এর রিপোর্ট দ্রষ্টব্য, পৃ.৩-৪

২৮। *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪

২৯। *UNICEF, Inventory for Women's Organizations in Bangladesh,* S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981, P:11.

৩০। খালেদা নাজনীন, *বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের স্বরূপ*, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ৫ম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৪, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, পৃ. ৯৫

৩১। *UNICEF, Inventory for Women's Organizations in Bangladesh,* S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981, P:12.

৩২। *UNICEF, Inventory for Women's Organizations in Bangladesh,* S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981, P:13.

৩৩। মালেকা বেগম, *বাংলাদেশ নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯

৩৪। ফওজিয়া খন্দকার ইভা, *বাংলাদেশ জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এনজিওসমূহের ভূমিকা*, জেন্ডার এবং উন্নয়ন: নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার গ্রুপ, ঢাকা মার্চ ১৯৯৮ খ্রি. পৃ.২৩

৩৫। ফওজিয়া খন্দকার ইভা, *জেন্ডার এবং উন্নয়ন: নীতিমালা*, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬৩

৩৬। আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮।

৩৭। আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮-২১৯

৩৮। আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯-২২০

৩৯। আয়েশা খানম, *মহিলা সমাচার*, বেইজিং + ২০ বিশেষ সংখ্যা-২০১৫ খ্রি. পৃ. ৬০-৬২

৪০। রুহল আমিন, *বেগম খালেদা জিয়া বি এন পি ও বাংলাদেশ*, ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ৩০ জুন, ২০১২ খ্রি. পৃ. ৭-১০, প্রকাশক: হীরা বুক মার্ট, পরিবেশক: জ্ঞান বিতরণী, ৩৮/২-ক, বাংলাদেশ, ঢাকা-১১০০

৪১। আসলাম সানী সম্পাদিত, *নন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা গর্বিত বাংলাদেশ*, প্রকাশক: মিজান পাবলিকেন্স ৩৮/৪, বাংলাদেশ, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি. পৃ. ৮-১০

৪২। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৬

৪৩। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৪, পৃ. ৫

৪৪। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক: ১৪২১, মে-অক্টোবর: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৯

৪৫। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬, পৃ. ১০
৪৬। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৪
৪৭। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২১, জানুয়ারী-এপ্রিল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১০-১১
৪৮। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩-মার্চ ২০১৪, পৃ. ৫
৪৯। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৮
৫০। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৫।
৫১। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২১, জানুয়ারী-এপ্রিল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১৭
৫২। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক: ১৪২১, মে-অক্টোবর: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৯
৫৩। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক: ১৪২১, মে-অক্টোবর: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৯
৫৪। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক: ১৪২১, মে-অক্টোবর: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৯
৫৫। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৮
৫৬। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩-মার্চ ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৫
৫৭। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১২
৫৮। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৫
৫৯। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: আশ্বিন-কার্তিক: ১৪২০, আগস্ট-অক্টোবর: ২০১৩ খ্রি. পৃ. ১০
৬০। *নারী বার্তা*, নবম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩-মার্চ ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৬
৬১। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৩
৬২। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-অগ্রহায়ণ: ১৪১৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর: ২০১১ খ্রি. পৃ. ৯
৬৩। *নারী বার্তা*, দশম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: পৌষ-চৈত্র: ১৪২১, জানুয়ারী-এপ্রিল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১১
৬৪। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১২

৬৫। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১২

৬৬। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১১

৬৭। *নারী বার্তা*, অষ্টম বর্ষ: বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশকাল: ফাগুন-চৈত্র: ১৪১৮, জানুয়ারি-মার্চ: ২০১২ খ্রি. পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নারী নিয়ে কুসংস্কারঃ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

নারী নিয়ে কুসংস্কারঃ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

কুসংস্কার মানুষকে পিছিয়ে দেয়, আর সংস্কার মানুষকে এগিয়ে দেয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানব জাতি অন্ধকারে পড়ে থাকে। সংস্কার মানুষকে আলোর পথে পরিচালিত করে সঠিক রাস্তা দেখায়। তাই সঠিক জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে কুসংস্কারকে পিছনে ফেলে আমাদেরকে উন্নতি ও ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ কুসংস্কার পরিচিতি

কুসংস্কার শব্দের অর্থ যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস, গোড়ামি।[১]

কুসংস্কার শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো superstitition. শব্দটি latin ভাষার superstitio থেকে উৎপত্তি হয়েছে। latin ভাষায় এর অর্থ a standing over, পুলকিত হওয়া, আনন্দিত হওয়া, বিশেষভাবে, পুরাতন ধর্মীয় প্রথাও আনুষ্ঠানিকতা।[২]

এর আভিধানিক অর্থ হলো, আলৌকিক শক্তির প্রতি অযৌক্তিক বিশ্বাস স্থাপন।[৩]

কুসংস্কারের আরেক প্রতিশব্দ হলো, 'খুরাফাতুন'। এর অর্থ হলো এমন বিশ্বাস যার ভিত্তি হলো ভয় ও অজ্ঞতা, বাস্তবতার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।[৪]

আরবী ভাষায় 'খুরাফাহ' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস হলো উযরা গোত্রের খুরাফা নামক এক ব্যক্তি জিন দ্বারা আক্রান্ত হয়। অতঃপর জিনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সে জিনের কাছে যেসব আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলো মানুষের নিকট বর্ণনা করে। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের লোকজন তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়। পরবর্তীতে তার বানানো মনোমুগ্ধকর গল্প 'হাদিসু খুরাফাহ' নামে পরিচিত হতে থাকে।[৫]

পরিভাষায় কুসংস্কার হলো-যুক্তি সংগত কারণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তু বা কর্মকে নিজের জন্য কল্যাণকারী বা অনিষ্টকারী মনে করা। প্রাচীন অজ্ঞ লোকদের কর্ম ও বিশ্বাসসমূহকেও কুসংস্কার বলা হয়ে থাকে।[৬]

সর্বোপরি সমাজে বিভিন্ন ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর মানুষ যখন প্রকৃত কল্যাণ উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়, তখন নিজেরাই কল্পনা থেকে একটি কারণ আবিস্কার করে কোনো আলৌকিক শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করে সেই শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে অথবা সেই অদৃশ্য শক্তির অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেসব রীতি ও প্রথা আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলোকে মানুষ অজ্ঞতার কারণে গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন করে থাকে।

কুসংস্কারের উৎপত্তি

প্রাচীন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ঘটমান কোন ঘটনার জন্য উৎকণ্ঠা ও আশা আকাঙ্খা থেকেই কুসংস্কারের উৎপত্তি।[৭]

মানব সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই মানুষ তাদের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য ঐশী নির্দেশনার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা চেতনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু করে। তখন তারা কতিপয় রীতি আবিষ্কার করে সেগুলো তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করে তা অনুসরণ করতে থাকে, এতে তারা কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখেনি। এভাবেই সমাজে কুসংস্কার চালু হয়।[৮]

অজ্ঞ লোকদের ভয় ও অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্টি বিধানের প্রবণতা থেকেই যাবতীয় কুসংস্কারের উৎপত্তি।

আমাদের দেশে অনেকে এমন ধারণা ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন থাকে, যা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। এ ধরণের বিশ্বাস ও আচরণকেই কুসংস্কার বলে। কুসংস্কার একটি ব্যাধি। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান। কুসংস্কার আমাদের জীবনে সামনে এগোবার পথে বড় বাধা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অতীতে নারী নিয়ে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার

যে সব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদান করেছে, সেসব অধিকার পূর্বে বাংলার মুসলিম শাসকরা বাংলার নারীদের ভোগ করতে দেন নি। যদিও ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবু দেখা গেল ভারতের মুসলিম শাসকরা শুধু নারীর পর্দা বা আব্রুর উপরই দৃষ্টি দিলেন। বাংলার নারী সমাজ এমনিতেই অন্তঃপুর যামিনী ছিল সমাজের চলতি অনুশাসনেই। তবু মুসলিম শাসকরা নতুন নতুন ঘোষণা দিয়ে নারী সমাজের পায়ে বেড়ি বাঁধতে থাকেন। ফিরোজ শাহ আলম তুঘলক (১৩৫১ খ্রি.) ও সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭ খ্রী.) নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। বোরকা এবং ঢাকা গাড়ী ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা নিষিদ্ধ হলো। বাড়িতে জেনানা[৯]। মহল তৈরি করা হল।[১০]

ইসলামি শরীয়াতের বিধানানুযায়ী নারীদের পর্দা করা ফরজ। তাই পর্দার উদ্দেশ্যে বোরকা পরার নির্দেশ ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ। তাই এ নির্দেশ নারীদের অবরোধের পর্যায়ে পড়ে না। হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা ও হিন্দু ধর্মের নানারকম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসনামলে বাংলার বহু নারী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দু নারীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস বদলাতে পারেনি। সেজন্য বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চালু হল, হিন্দুদের যৌতুক প্রথা দ্বারা মুসলিম পরিবারগুলো নিষ্পেষিত হতে থাকলো, মেয়ের পছন্দ করার অধিকার বাতিল হলো, বিধবারা হিন্দুদের মত বৈধব্য পালন করতে থাকলো। কৌলিন্য প্রথার কারণে মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি হলো। শিক্ষাসহ বিভিন্ন অধিকার অভিজাত নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো। ইসলামের বিধান অনুসারে পাঠান ও মোঘল শাসনামলে বাংলার নারী সমাজের মূল্য কোনভাবেই বৃদ্ধি পায়নি। [১১]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালে অবরুদ্ধ ছিল। শিক্ষাহীন অনগ্রসর সমাজে নানারকম অবমাননাকর ধ্যান-ধারণা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি বদ্ধমূল হয়েছিল। নানা প্রথা, বিধি-নিষেধ জারি করে প্রকারান্তরে নারীকে শোষণ ও নির্যাতন করা হয় এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয় সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে। ভারত বর্ষে হিন্দু যৌথ পরিবার প্রথায় বংশানুক্রমে সম্পত্তির মালিকানা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে বিভক্ত হতে থাকে এবং মেয়েরা ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে বাবার পরিবার থেকে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলিম শাসকরা এ দেশে পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত অধিকার, দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন। প্রচলিত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি, বিধবাদের প্রতি সামাজিক অনুশাসন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন এসব থেকে মুসলিম আইন ছিল ভিন্ন এবং এ আইনে নারীর অধিকার সংরক্ষিত ছিল।[১২]

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ও বুড়ো বয়সেও বালিকা বধূ গ্রহণ সামাজিক প্রথা ছিল। হিন্দু পরিবারগুলোতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে একাধিক নারীকে বিধবা হতে হতো। বিধবা হয়েও নিস্তার ছিল না। সতী হিসেবে তাদের স্বামীর চিতায় জীবন্ত আত্মাহুতি দিতে হতো।[১৩]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজপতি ও পারিবারিক অভিভাবকরা অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রলোভনে সতীদাহ প্রথা চালু রেখেছিল।[১৪]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে।[১৫]

সে সময়ের সরকারি হিসাবে জানা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে। শুধু কলকাতা ও আশপাশের এলাকাগুলোতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২৮ জন।[১৬]

১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫ হাজার ১২৮ টি বালক বালিকা পিতৃমাতৃহীন হয়। বঙ্গদেশে যত সতীদাহ হয় তার সাত অংশের এক অংশই হয়েছে শুধু হুগলীতে। এই হুগলীতেই রাম মোহন রায়ের আবির্ভাব। যিনি স্বয়ং ছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।[১৭]

শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বা কোন রাজপুত রাজার মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীর সম্মান রাখার জন্য সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। শত্রুপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত রাজার স্ত্রী ও মেয়েদের অধিকার পেয়ে যেত স্বাভাবিকভাবেই। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েরা জহরব্রত পালন করত অর্থাৎ নিজেরাই বিষ খেয়ে মারা যেত।[১৮]

কুলীন মেয়েদের সমস্যা সমাজে প্রকট ছিল। কুলীন পুরুষ বহু সংখ্যক বিয়ে করতেন। কুলীন মেয়েরা শিশু বয়সে বা যে কোন বয়সেই হোক না কেন বিয়ের পর কুলীন স্বামীর ঘর করতে পারত না। স্বামীকে চোখে দেখাই সম্ভব হত না। ১৮৫৩ সালের অবিভক্ত বাংলার সরকারি রিপোর্টে জানা যায় যে, সে সময়ের কলকাতার ১০ হাজার পতিতা মেয়ে ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। সুন্দরী কুলীন মেয়েদের বিষ খাইয়ে মারার বহু ঘটনাও সে যুগে ঘটেছে।[১৯]

ঊনিশ শতকের অবিভক্ত বাংলার নারী অধিকার বিষয়ক যে সকল কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে, (ক) সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ (খ) বিধবা বিবাহ আইন (গ) নারী শিক্ষার প্রসার (ঘ) সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি (ঙ) বিভিন্ন নারী কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলা।[২০]

বাল্যবিবাহের দোষ ও বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে বহু লেখালেখি, তর্ক উত্থাপন ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সফল হয়েছেন। মূলত রাজা রামমোহন রায়ের নাম যেমন সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধনের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিধবা ও স্ত্রী শিক্ষা চালু করার সাথে স্মরণীয়।[২১]

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর হিন্দু বিধবার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। রাজা রামমোহনের জীবিতকালে বিধবার সংখ্যা বেশি ছিল না কেননা সতীদাহের ফলে বিধবাদের বেঁচে থাকারই কোন পথ ছিল না। পরবর্তীকালে বিধবাদের সমস্যা সমাধানে রামমোহনের উত্তরসূরীরা এগিয়ে এলেন।[২২]

বিধবা বিবাহ এর বিষয়ে নানা রকম তর্ক-বিতর্ক চলাকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রখর বুদ্ধিমত্তা নিয়েই "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা "এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে) শিরোনামে যুক্তিসম্মত বই লেখেন। এই বইয়ের ক্ষুরধার যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা করতে থাকলে, তিনি অক্টোবর মাসে একই শিরোনামে দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেন।[২৩]

এই আইন পাস হওয়ার পাঁচ মাস পর ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে।[২৪]

তিনি একজন সমাজ কর্মীরূপে, নেতারূপে বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেছিলেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা আন্দোলন করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে বিরুদ্ধ বাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালে জনৈকা বিধবাকে বিবাহের উদ্যোগ নিলে তিনি তা সমর্থন করেন।[২৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের সমাজে ও পরিবারে নারী নিয়ে কুসংস্কার

বাংলাদেশের সমাজে ও পরিবারে দীর্ঘ ধরে কিছু কুসংস্কার প্রচলিত হয়ে আসছে। যা মানুষের মন-মজে বদ্ধমূল হয়ে আছে। যেগুলো নিম্নরূপ:

মঙ্গল অথবা অমঙ্গল যাত্রা

বাংলাদেশের সমাজে কেউ কেউ মনে করেন যে, কোন মেয়ে যদি তার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে বুধবারে যায় বা শ্বশুর বাড়ি থেকে এ দিনে বাপের বাড়িতে আসে তবে লক্ষ্মী (টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদে বরকত) মেয়ের সাথে আসা যাওয়া করে। এমনভাবে শনিবার বা মঙ্গলবারকে অনেকে কুলক্ষণে মনে করেন।

অনেকেই জরুরী কোন কাজে যাত্রা শুরু করে রাস্তায় বের হওয়ার পর যদি সর্বপ্রথম বিধবা দেখে অথবা পেঁচা দেখে অথবা হোচঁট খায় তখন যাত্রাকে অশুভ মনে করে যাত্রা বাতিল করে। এটা একধরণের কুসংস্কার

নারীদের পিতার সম্পত্তি নেওয়াকে অশুভ মনে করা

একমাত্র দীন ইসলামই ধর্মীয় বিধানে সম্পদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। পিতার সম্পদে ছেলের অধিকার যেমন স্বীকৃত, তদ্রুপ মেয়ের অধিকার ও স্বীকৃত। অথচ বাংলাদেশে মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা শরীয়াতের বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। আর যদি কেউ পিতার সম্পত্তি থেকে অংশ নিয়ে নেয়, তাহলে এ সম্পত্তিকে অশুভ বলা হয়। গ্রামে-গঞ্জে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, ওয়ারিসের সম্পত্তি এনে কেউ স্বচ্ছল হয় না, ওয়ারিসের সম্পত্তি টিকে না। এ ধরণের কুসংস্কার কুরআন নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াস মাত্র। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি শরিআতের বক্তব্য সুস্পষ্ট।"

সুতরাং নারীদের পিতার সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব পবিত্র কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত ও সম্পূর্ণ হালাল রিযিক। তাই যদি সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তাহলে তা হবে বরকতময়।

প্রথম বাচ্চা প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে অবস্থান

বাংলাদেশে প্রথম বাচ্চা প্রসবের সময় মেয়েদের পিত্রালয়ে অবস্থান একটি সামাজিক প্রথা। মেয়েরা সাধারণত: বিয়ের পর স্বামীর নিবাসেই অবস্থান করে থাকে। কিন্তু প্রথম বাচ্চা প্রসবের সময় পিতার বাড়ীতে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চা প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলে বাধ্যতামূলকভাবে সন্তানসম্ভবা মহিলাদের পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভ্রমণজনিত কারণে বাচ্চা ও গর্ভবতী মহিলার সমস্যা হতে পারে সে বিষয়টিও বিবেচনা করা হয় না। অনেক সময় দেখা গেছে ভ্রমণের কারণে বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে অথবা বাচ্চার স্থায়ী রোগ সৃষ্টি হয়ে গেছে। কারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মহিলার অসাবধানতাই অধিকাংশ শিশুর রোগাক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। অথচ অনাবশ্যক একটি রীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অসংখ্য শিশুর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করা হয়। ইসলামি শরিআতে সাবধানতা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়। ইচ্ছাকৃত কোন সমস্যা সৃষ্টি করার নাম তাকদীরের উপর বিশ্বাস নয়। নিজ সামর্থ অনুযায়ী প্রচেষ্টার পর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্তান সম্ভবা মহিলা স্বামীর গৃহে অবস্থান করবে এটাই স্বাভাবিক। যুক্তি সঙ্গত কারণে প্রথম বাচ্চা প্রসবের সময় পিত্রালয়ে অবস্থান করা যেতে পারে। তবে একে সামাজিক রীতি বাস্তবায়নের জন্য অথবা প্রথম বাচ্চা প্রসবের সময় স্বামীর গৃহে অবস্থান করলে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় অথবা প্রথম বাচ্চা প্রসবের সময় পিত্রালয়ে অবস্থান না করলে বাচ্চার কোন ক্ষতি হতে পারে বিশ্বাস থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পিত্রালয়ে যদি পাঠিয়েদেওয়া হয় তা হলে তা হবে শরীআত বিরোধী। প্রথমত: সমাজের কোন রীতি যাতে শরিআতের কোন নির্দেশনা নেই বা মানুষের জাগতিক কোন কল্যাণ ও নেই, এমন রীতি বাধ্যতামূলক ভাবে অনুসরণ করা ইসলামি শরিআতে

অনুমোদন করে না। কারণ এতে শরিআতে নেই এমন বিষয়কে শরিআতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (স.) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।
দ্বিতীয়ত, যৌক্তিক কোনো কারণ অথবা জাগতিক কেনো উপকারিতা ছাড়া শুধুমাত্র সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় কোনো কাজ করা শরিআতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে অহংকার প্রকাশ পায়, অহংকার ইসলামি শরিআতে শিরকের পর্যায়ে কবীরা গুনাহ।

শিশু প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায না পড়া

বাংলাদেশে অধিকাংশ মহিলা বাচ্চা প্রসবের পর নিফাস যখনই বন্ধ হোক না কেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকে। এমনকি যেসব মহিলা নিয়মিত নামায আদায় করে থাকেন, তারা পর্যন্ত চল্লিশ দিন নামায পড়েন না। অথচ শরিআতের বিধান হলো, নিফাসের প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করে নামায পড়বে, গোসল ক্ষতি কারক হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। শরী'আতে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া নামায পরিত্যাগ করা মহাপাপ।
বাংলাদেশে সাধারণত চল্লিশদিন নামায না পড়ার কারণ হিসেবে অনেকের এ বিষয়ে শরিআতের বিধান সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে। অনেকেরই বিশ্বাস বাচ্চা প্রসবের পর চল্লিশদিন নামাজ পড়া যায় না। এমনকি স্বামীর সাথে সহবাস ও করা যায় না। এ কারণে মহিলারা এ সময়ে নামায থেকেও বিরত থাকে এবং স্বামীদেরকেও সহবাস থেকে দূরে রাখে। অথচ শরিআতের বিধান হলো, যতক্ষণ নিফাসের রক্ত প্রবাহিত থাকে ততক্ষণই নামায ও সহবাস নিষিদ্ধ, নিফাসের রক্ত প্রবাহ বন্ধ হলেই গোসল করে নামায পড়তে হবে এবং স্বামীর সাথে সহবাস ও করা যাবে।[২৬]
সুতরাং অজ্ঞতাবশত হোক অথবা অলসতার কারণেই হোক বাচ্চা প্রসবের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকা শরী'আতে অনুমোদিত নয়।

বিবাহের সময় বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার

নারী পুরুষের পবিত্র বন্ধন বিয়ে যার মাধ্যমে বৈধ উপায়ে শারিরীক চাহিদা পূরণ ও বংশ বৃদ্ধি হয়।
শরী'আতে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান হলো-পাত্র-পাত্রীর সম্মতিতে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট মহরের বিনিময়ে একপক্ষ প্রস্তাব দেবে, অন্য পক্ষ কবুল করবে। পরবর্তীতে পাত্রের সামর্থ্যানুযায়ী ওয়ালিমা করা সুন্নত। কিন্তু বর্তমানে সমাজে এই বিয়েকে কেন্দ্র করে কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। যেগুলো এখানে তুলে ধরা হল:

১। পান চিনি প্রথা

বিয়ের প্রস্তুতি পর্বে মধ্যস্থতাকারী মেয়ের বাড়িতে গেলে ধার করে হলে ও তাকে উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয় যা ইসলামি শরিয়ত বহির্ভূত। একে পান চিনি প্রথা বলে। পান চিনি প্রথা নামক অনাবশ্যক কুসংস্কার মুসলিম সমাজের বর্জন করা উচিত।

২। কনে দেখার সময়

বাংলাদেশে কনে দেখার সময় পাশের বাড়ির নারী-পুরুষ কনে দেখার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে ও অহেতুক প্রশ্নবানে কনেকে জর্জরিত করে যা ইসলাম বহির্ভূত। ইসলামে শুধু পাত্র ছাড়া অন্য বেগানা পুরুষের পাত্রী দেখা হারাম। সুতরাং বিয়ের মত পূণ্যময় কাজটি একটি হারাম কাজের মাধ্যমে শুরু হওয়া ইসলাম বহির্ভূত আচরণ বা প্রথা।

৩। এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান

পাত্র-পাত্রী পছন্দ হওয়ার পর উভয় পরিবারের লোকেরা এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান করে পাত্রীকে আংটি পরায়। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো মোবাইল ফোনে অথবা সামনা সামনি দেখা-সাক্ষাৎ করে, কথা বলে, পার্কে, রেস্টুরেন্টে ঘুরতে যায়, খেতে যায়। মনে করা হয় তারা এভাবে পরস্পরকে বুঝে নিয়ে থাকে যা উভয় পরিবার দূষণীয় ভাবে না। ইসলামি শরিআতে ইজাব কবুল হওয়ার পূর্বে পাত্র-পাত্রী আজনবি হিসেবে পরিগণিত। তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে শরীর স্পর্শ যিনা হিসেবে পরিগণিত। এ ধরণের কুসংস্কার মুসলিম সমাজকে বর্জন করে ইসলামি রীতি-নীতি পালন করা কর্তব্য।

৪। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান

বিয়ের দু-একদিন আগে কনে ও বরের বাড়িতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা হয়। এতে বরপক্ষের যুবতী মেয়েরা বিভিন্নভাবে সেজে গুজে বিশেষ হলুদ শাড়ি পরে, গায়ে হলুদের সরঞ্জাম, কুলার মধ্যে বাটা হলুদ, দুর্বাঘাস, কয়েক ধরণের ধান, গায়ে হলুদের পাটি এবং কাপড় চোপড় নিয়ে যায়, তাদের সাথে কিছু যুবক-যুবতী একত্রিত হয়। একটি মঞ্চ বানিয়ে তারা সেখানে বিভিন্ন রসালো আলাপ চারিতায় লিপ্ত হয় এবং নেচে-গেয়ে অনুষ্ঠানকে সরগরম করে তোলে। নারী-পুরুষ সবাই পাত্রীর মুখে হলুদ মাখিয়ে দেয়। আবার মেয়ের বাড়ি থেকে যুবক-যুবতীরা বরের বাড়িতে হলুদ কাপড় পরে ও হলুদের সরঞ্জাম নিয়ে সেজেগুঁজে যায়। আশেপাশের যুবক-যুবতীরাও একত্রিত হয়ে অশ্লীল কথাবার্তা বলে। যা পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতায় পূর্ণ থাকে। এগুলো অমুসলিম সংস্কৃতির অংশ হওয়ায় মুসলিমদের এসব বর্জন করা উচিৎ।

৫। বর ও কনের গোসল অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিয়ের দিন বর ও কনের গোসলের অনুষ্ঠান করা হয়। গোসলের পূর্বে মহিলারা বরের গায়ে হলুদ মেখে দেয় ও সাবান মেখে দেয়, পানি ঢেলে দেয়, শরীর ঘষে দেয়, কনেকেও মহিলারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে বিভিন্ন অশ্লীল গান গেয়ে তার শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেন। বর ও কনের গোসল অনুষ্ঠানে এ ধরণের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা উচিৎ।

৬। বর যাত্রার খরচ বহন

প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশে রাতে বিয়ের আয়োজন করা হতো। আর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়ে যেত। বধূ নিয়ে ফেরার পথে ডাকাতের আক্রমণ থেকে জান-মালের হেফাজতের জন্য বরের সাথে প্রতি ঘর থেকে একজন করে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া হতো।[২৭]

পরবর্তীতে এটি একটি বিয়ের সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। এখন অনেক জায়গায় বিয়ের ক্ষেত্রে বরযাত্রীর সংখ্যা নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে, অথবা বিয়ের অনুষ্ঠানে বেশি বরযাত্রী আসায় খাবার সংকটের এক পর্যায়ে বিয়ে ভেঙ্গে যেতেও দেখা যায়। যা ইসলামি রীতি বহির্ভূত। কন্যার বাবাকে বাধ্য করা হয় এ হেন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে। অথচ রাসূল (স.)-এর নিয়ম ছিল কোথাও দাওয়াত পেলে সেখানে যে সংখ্যার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, কোন কারণে সংখ্যা বেড়ে গেলে তখন মেজবানের অনুমতি নিতেন। অনুমতি পাওয়া গেলে সে বাড়িতে মেহমান হয়ে যেতেন, অন্যথায় ফিরে আসতেন।[২৮]

আবার দেখা যায় অহেতুক অর্থ খরচ করে গেইট বানিয়ে যুবতি মেয়েরা বরপক্ষের কাছ থেকে জোর পূর্বক অর্থ নিয়ে থাকে। সুতরাং এ জাতীয় কুসংস্কার বর্জন করা উচিৎ।

৭। সেলামি প্রথা

কনের বাড়িতে হাত ধোয়ানোর পর সেলামি নেওয়ার প্রথাটি সর্বাধিক পরিচিত। সাধারণত কনের ছোট বোন একাজটি করে থাকেন ও বরের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকেন। অথচ প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর

দ্বারা বরের হাত ধোয়ানোর বিষয়টি যিনার সমপর্যায়ের কাজ। সুতরাং বাংলাদেশে প্রচলিত এ জাতীয় কুসংস্কার বর্জন করা আবশ্যক।

৮। অন্দর ভাঙ্গানি অনুষ্ঠান

অন্দর মহলে প্রবেশের জন্য বরকে মোটা অংকের সেলামি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। সেখানে অনেক বেগানা মহিলা বসে থাকে। তাদের মধ্য থেকে বরকে তার নববধূকে খুঁজে নিতে হয়। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বরের সাথে বেগানা মহিলাদের ধাক্কাধাক্কি হয়, যা যিনার সমতূল্য পাপ।

সেখানে অসংখ্য মহিলা ও যুবকরা থাকে এবং তাদের ভীড়ে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ও পর্দার বিধান পুরোপুরি লঙ্ঘিত হয়। এ ধরণের কার্যক্রম ইসলামি শরিআতে হারাম।

৯। কনের বিদায় বেলার অনুষ্ঠান

কনের বিদায় বেলায় বাবা, মা, বড় ভাই বরকে লক্ষ্য করে বলে থাকে 'উপরে আল্লাহ, নিচে তোমার হাতে সপে দিলাম' যা সুস্পষ্ট শিরক। বিদায় বেলায় নারী-পুরুষ মিলে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করে বিদায় দিয়ে থাকে। সেখানেও পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়। উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি করে নারী-পুরুষ সবাই একত্রে দাড়িয়ে বিদায় দেওয়া শরিয়াত বিরোধী কুসংস্কার।

১০। বধূবরণ অনুষ্ঠান

বর ও বধূকে দরজার সামনে একটি পিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘাস ও ধান মাথায় দিয়ে পিতলের থালায় পা ধুয়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এখানেও নারী-পুরুষ একত্রে মিলে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে যা ইসলামি শরিআত বহির্ভূত।

১১। নববধূর মুখ দেখা অনুষ্ঠান

সাধারণত পরিবারের জেষ্ঠ্যতম মহিলা দাদি, নানি বা শাশুড়ি সর্বপ্রথম নব বধূর মুখ দেখা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে অন্যরা এসে নব বধূর মুখ দেখে টাকা ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকেন। এ অনুষ্ঠান দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে ফলে নববধূর ইসতিনজার প্রয়োজন হলেও ঘন্টার পর ঘন্টা এগুলো চেপে থাকতে হয় ও অনেক সময় নামাযী বধূর ও নামায কাযা হয়ে যায় বা যাবার উপক্রম হয়। সেখানে তাকে নামায পড়ার কোন সুযোগ বা পরিবেশ দেওয়া হয় না। এ ধরণের শরিয়ত বিরোধী ও অমানবিক রীতি মুসলিম সমাজের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

১২। বরের জুতা লুকিয়ে রেখে টাকা আদায়

সাধারণত শ্যালিকারা বরের জুতা চুরি করে লুকিয়ে রেখে তাদের দাবিকৃত টাকা বরের কাছ থেকে আদায় করে থাকে। শ্যালিকাদের সাথে দুলাভাইদের হাসি-তামাশা সম্পূর্ণ শরীআত বিরোধী কাজ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ। এটি হিন্দু সংস্কৃতির অংশ বিধায় মুসলিম সমাজে তা বর্জণীয়।

১৩. বিধবাদের দ্বিতীয় বিয়ে অশুভ মনে করা

বিধবা মেয়েকে বিয়ে করলে স্বামীর অকল্যাণ হবে-এ ধরণের একটি কুসংস্কার বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিধবা মহিলারাও বিয়ে করতে ইচ্ছুক থাকেন না। অথচ ইসলামি শরীয়াতের বিধান হলো-বিবাহযোগ্য মহিলা কারো অধীন থাকলে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া তার দায়িত্ব। বিবাহযোগ্য মহিলা স্বাধীনা হোক বা দাসী হোক, তালাকপ্রাপ্তা হোক বা বিধবা হোক বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কন্যা হাফসা (রা.) যখন বিধবা হলেন, তখন তিনি তার বিধবা কন্যা হাফসার বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি হযরত আবুবকর ও ওসমান (রা.)-

এর নিকট প্রস্তাব দেন, পরবর্তীতে রাসূল (স.) নিজেই ওমর (রা.)-এর নিকট হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তাদের বিয়ে হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের উচিৎ হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে বিধবা বিবাহের প্রচলন করা।

১৪। উকিল বাপ প্রথা

সাধারণত বিয়ের মধ্যে বর ও কনে পক্ষের মধ্যস্থতাকারীকে উকিল বাপ বলা হয় যিনি পিতার মর্যাদা পেয়ে থাকেন ও তার সাথে পিতার মতই দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলে থাকে যা ইসলামি শরীয়ত সমর্থন করে না। শরিআতে এর কোন ভিত্তি না থাকায় উকিল বাপ যদি মাহরাম তথা এমন ঘনিষ্ট আত্মীয় না হন, যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম অথবা কামভাবহীন অশীতিপর বৃদ্ধ না হন তাহলে তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা সবই ইসলামি শরিআতে নিষিদ্ধ।

১৫। সফর মাসে বিয়ে শাদীকে অশুভ মনে করা

অনেকেই বলে থাকেন সফর মাসে যে সব বিয়ে শাদী হয়েছে এগুলোর পরিণতি ভালো হয় নি। অথচ কোন কাজে কল্যাণ ও বরকত নির্ভর করে কাজটি ইসলামি শরিআতের বিধান ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তার উপর। সুতরাং কোন সময় বা মাসকে অশুভ বলা শিরকের পর্যায়ের কবীরা গুনাহ।

১৬। বাসর রাতে স্ত্রীর নিকট মহর মাফ চাওয়া

ইসলামি শরিআতে নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহর ধার্যকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর মহর আদায় করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বামীর সামর্থ্যের মধ্যেই মহর ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। স্ত্রীর জন্য যে মহর নির্ধারণ করা হলো তা পুরোপুরি আদায় করে দিতে হবে। স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মহর থেকে স্বামীর কোন অংশ গ্রহণ করা বৈধ নয়। স্ত্রীর নির্ধারিত মহর আদায় করে দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এবং উত্তম হলো-স্ত্রী স্বামীর অধিকারে আসার পূর্বেই তার হক আদায় করে দেওয়া।

যদি তাৎক্ষণিক মহরের টাকা আদায় করতে সমর্থ না হয় তাহলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে কিস্তিতে তা পরিশোধ করতে হবে। কোনো ভাবেই স্ত্রীকে মহর ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে দরিদ্র ও অশিক্ষিত সমাজে বাসর রাতে স্ত্রীর নিকট মহর মাফ চাওয়ার একটি প্রচলণ রয়েছে।

সাধারণত বাসর রাতে স্ত্রীকে বলা হয়, যদি তুমি মহরের টাকা মাফ না কর তাহলে তোমাকে স্পর্শ করা জায়েয হবে না। তখন বাধ্য হয়ে স্ত্রী বলে থাকে, ঠিক আছে আমি মহরের টাকা মাফ করে দিলাম। তখন স্বামী স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে থাকে।

প্রথমত কথা হলো, স্ত্রী যদি মহরের টাকা মাফ না করে, তাহলে স্ত্রীকে স্পর্শ করা জায়েয নয়-এ কথাটি সত্য নয়। স্ত্রী হালাল হওয়ার জন্য মহরের টাকা সম্পূর্ণ আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে স্ত্রী যদি মহরের টাকা আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীকে তার শরীরের উপর অধিকার দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে স্ত্রীকে বাধ্য করা যাবে না। যদি স্ত্রী স্বামীকে বাধা প্রদান না করে, তাহলে শুধু মহর বকেয়া থাকার কারণে স্ত্রী হারাম হবে না। সুতরাং একটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বাসর রাতে মহর মাফ চাওয়াটি একটি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ ধরণের মাফ চাওয়ার পর মাফ করে দিলেও মাফ হবে না। কারণ বাসর রাতের মতো স্পর্শকাতর মূহুর্তে স্ত্রীর জন্য স্বামীর কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ থাকে না। যেহেতু এ পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বেচ্ছায় মাফ করে না, এ কারণে এ সময়ের মাফ করা শরিআতে কার্যকর নয়। তবে মহরের টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়ে দেওয়ার পর সেখান থেকে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কিছু অংশ স্বামীকে দান করে তাহলে তার জন্য তা হালাল হবে।

অতএব বাসর রাতে স্ত্রীর নিকট মহরের টাকা মাফ চাওয়ার যে রীতি বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তা ইসলামি শরিআতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কার্যকরও নয়।

১৭। নারী পুরুষ একত্রে যিকির করা

বাংলাদেশে কোন কোন পীরের আস্তানায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে অথবা পাশাপাশি বসে যিকির করা হয়। কোন কোন পীরের দরবারে যিকিরের এক পর্যায়ে নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে লাফালাফি করে এবং নারী পুরুষ একে অপরের সাথে মিশে যায়। যিকির করা শরিআতের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলেও শরিআতের অন্য বিধান তথা পর্দার বিধান লঙ্ঘন করায় তা সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

১৮। মহিলাদের জন্য বেগানা পীরের সাথে সাক্ষাৎ করা

বেগানা পুরুষের সাথে পর্দা করা শরিআতের একটি বাধ্যতামূলক বিধান। এ বিধান শরিআত নির্ধারিত। শরিআত নির্ধারিত মাহরাম হলো-স্বামী, পিতা, দাদা, স্বামীর পিতা, স্বামীর দাদা, নিজের সন্তান, সন্তানের সন্তান, ভ্রাতা, ভ্রাতার সন্তানগণ, কৃতদাস, অতিশয় বৃদ্ধ যার যৌবন চলে গেছে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর।
অথচ বাংলাদেশে পীরদের সাথে মহিলাদের সাক্ষাৎ করা পূণ্যময় কাজ মনে করা হয়।পীর পুরুষ বিধায় মহিলাদের রূপ দর্শণে কামভাব জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক, প্রকাশ করুক আর না করুক, তাই পীরের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করা ইসলামি শরিআত বহির্ভূত।

১৯। মহিলাদের পুরুষ পীরের শারীরিক খেদমত করা

বাংলাদেশে অনেক পীরকেই মহিলারা হাত-পা টিপে দেওয়া, মাথায় তেল দিয়ে দেওয়া এ জাতীয় খেদমতকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করে থাকেন। অথচ মহিলাদের স্বামীর খেদমত ছাড়া অন্য কারো খেদমত করা বৈধ নয়। একজন নারীর একজন পুরুষের শারীরিক স্পর্শ যিনার শামিল। তাই এ ধরণের খেদমত শরিআতে বৈধ নয়।

২০। পীরের দরবারে নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা

পীরের দরবারে নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা জাহেলিয়াতের সমতূল্য। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগে শয়তান যিনার কুমন্ত্রনা দিয়ে মানুষকে যিনার মত জঘন্য পাপে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়। পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে নামাযের জামা'আতে শরীক হতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। সতরাং পীরের দরবারে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কোনভাবেই শরী'আত সমর্থন করে না।[২৯]

২১। বিয়ের আগে-পরে করণীয় প্রসঙ্গে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার

১। (ক) কিছু কিছু অভিভাবকগণ মনে করেন যে, ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ-গান-গীত, রং-তামাশা করে একটু আনন্দ-ফুর্তি না করলে তাদের ঔরষে বোবা-বোকা সন্তান হবে। এটা সম্পূর্ণ খামখেয়ালি কাজ। অথচ তার সন্তানটিকে মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে পারছে কিনা বা নিজেও মুসলিম কি না কোন সময় পর্যালোচনা করেনি, উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম এটুকুই বলতে পারবে।
(খ) এখন আসি মেয়েদের নাক কান ফোঁড়ানো প্রসঙ্গে, তবে আগে বলে নেই কিভাবে এর প্রচলন হলো একদা হযরত ইসমাইল (আ.)-এর মাকে তার বাবার অন্য স্ত্রী হিংসার কারণে তার মায়ের মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করার লক্ষ্যে কান ও নাক ছিদ্র করে দেয়। ইসমাঈল (আ.)-এর মা পরবর্তীতে ওই ছিদ্রে অলঙ্কার লাগালে সতীনের মুখ চেহারা বিশ্রী হওয়ার পরিবর্তে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। এরপর মেয়েদের কানে ও নাকে ছিদ্র করে তাতে দুল পরানোটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে এটা ইসলামের একটা নির্দেশনা বলে জানে যে, নাক, কান না ফোঁড়ালে নাকি শাস্তি স্বরুপ পরকালে লোহার শিক গরম করে ফুরিয়ে দেয়া

হবে ইত্যাদি। এটা একটা দলিল বিহীন কাজ যা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। জেনে রাখা উচিৎ কুরআন, হাদিস, ইজমা কিংবা কিয়াস কোন সূত্রেই আমাদের নাক-কান ফোঁড়ানোর নির্দেশনা নেই।
(গ) অনেকে মনে করে, বিবাহিত মেয়ের নাকফুল পরা অপরিহার্য। বিয়ের দিন বিসমিল্লাহ্ বলে নাকি সর্বপ্রথমে কনেকে নাকফুল পরাতে হয়। হ্যাঁ পরানো যায়, এতে কোন নিষেধ নেই। পরানোর মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই নেই। তবে এটা ইসলামের নির্দেশনা বলে বিশ্বাস করাটা নেহায়েত অজ্ঞতা।
(ঘ) বিধবাদের অলঙ্কার ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে অনেকেই মনে করেন। না এটা ইসলামের কোন হুকুম নয়। এটা একটা জ্যান্ত কুসংস্কার, স্বামী মারা যাওয়ার পর অলঙ্কার পরা নিষিদ্ধ হলে তার আগে হতে হয় কুমারীর অলঙ্কার পরা নিষিদ্ধ, তাই নয় কি?
২। স্বামী মারা যাওয়ার পর সাদা রঙের শাড়ী পরতে হবে। এমনও দেখা গেছে বাধ্যতামূলকভাবে সর্বাঙ্গে সাদা কাপড় এনে পরিয়ে দিতে। এ বদ্ধমূল ধারণাটাও আস্ত বানোয়াট।
৩। "স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত " এটাকে হাদিসের বাণী বলে মেনে নিয়েছে অনেকে যা একটা অজ্ঞতা ও নিখুঁত ভুল বিশ্বাস। তবে স্বামীর প্রতি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, সেবা-যত্ন যথাযথ হওয়াটা জরুরী বটে।[৩০]

২২। গর্ভবস্থায় ও পরবর্তীতে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার

- গর্ভবতী মায়েদেরকে কম খাবার দেওয়া এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে।এর জন্য আর্থিক সংগতির তুলনায় কুসংস্কারই দায়ী। ভাবা হয় কম খাবার খেলে সন্তান প্রসবে সুবিধা হবে। এর ফলে মা ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, যা অপূরণীয়। অথচ মাতৃগর্ভে ভ্রুনের পুষ্টির প্রয়োজন। মাতৃগর্ভে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। তাই গর্ভবতী মায়ের বাড়তি খাবার প্রয়োজন। বিশেষত গর্ভধারণের শেষের তিন-চার মাস বর্ধিত খাবারের প্রয়োজন খুবই বেশি।
- জন্মের পর শাল দুধ না দেওয়া আমাদের দেশে একটি বহুল প্রচলিত কুসংস্কার। এই সময় বুকের দুধ একটু ঘন এবং হলুদ রঙের হয়ে থাকে। যাকে বলা হয় 'কলস্ট্রাম' বা শালদুধ। অনেকের ধারণা, এটা বিষাক্ত এবং অনেক ক্ষতিকর জিনিষ শালদুধে থাকে। শাল দুধ খেলে নবজাতকের ক্ষতি হয় ভেবে স্তন থেকে চাপ দিয়ে বের করে এটাকে ফেলে দেওয়া হয়। অথচ এই শালদুধে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন উপাদান থাকে এবং তা নবজাতকের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বুকের দুধ যে কয়দিন শিশুকে দেওয়া হয় না, সে কয়দিন শিশুকে শুধু পানি, সামান্য মধু বা চিনি মেশানো পানি খাইয়ে রাখা হয়। এতে শিশুর বলতে গেলে জন্মের প্রথম তিনদিন অনাহারে কাটে, ফলে একদিকে পুষ্টিহীনতা, অন্যদিকে শালদুধ বঞ্চিত হয়ে জন্মলগ্ন থেকে শিশুর যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি হবার কথা, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।
- দেখা যায় গ্রামে এক বছর পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবারই দেওয়া হয় না। তাদের ধারণা এগুলো শিশুর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। অথচ চার-পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশু সব খাবারই খেতে পারে। খাবার নরম হলেই হল। অনেকে শিশুকে শাকসবজি দেবার কথা ভাবতেই পারে না। অথচ এর অভাবে শিশুদের ভিটামিন 'এ' এর অভাব হতে পারে। ফলে কেউ কেউ রাতকানা বা অন্ধও হয়ে যেতে পারে।
- ডায়রিয়া বা ঘন ঘন পায়খানা হলে অনেকেই বিশ্বাস করেন এমন কিছু খাওয়ানো হয়েছে যা শিশুর সহ্য হচ্ছে না। ফলে সামান্য পাতলা পায়খানা হলে অনেকে খাবার বন্ধ করে দেন। এতে শিশুর যা প্রয়োজন তা সে পায় না। এর ফলে শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা পূরণ হয় না। তদুপরি শিশুর যা চাহিদা, তাও মেটানো হয় না। বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী রাসায়নিক পদার্থ, লবণ ও পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় বলে তৎক্ষণাৎ এগুলোর ঘাটতি পূরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

নইলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এখন আমরা জানি শিশুদের ডায়রিয়া খাবারের দোষে বা বদহজমের ফলে নয়, এটি নানা ধরণের ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফল।

- শিশুদের হাম হলে বুকের দুধ, মাছ, মাংস এবং অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অপুষ্টি ও রোগ একসঙ্গে হয়ে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এমনকি মৃত্যুও হয়। ফলে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
- অনেকেই মনে করেন মিষ্টি খেলে কৃমি হয়। কিন্তু মিষ্টি খেলে কৃমি হয় না।
- অনেকেই মনে করেন শিশুর মলে খারাপ কিছু নেই। বয়স্কদের মল বিপদ জনক। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শিশুর মলে অনেক জীবাণু থাকে। এটি রোগ বিস্তারের অন্যতম ক্ষেত্র। মায়েরা অল্প পানি দিয়ে শিশুদেরকে পরিষ্কার করে অন্য বাচ্চাকে খাবার দেন বা আদর করেন। এতে রোগজীবাণুর আক্রমণ ঘটে।
- গর্ভাবস্থায় অনেকে মনে করেন মৃগেল মাছ খেলে বাচ্চার মৃগী রোগ হয়। মাছ, মাংস, ডিম খেলে বাচ্চার ক্ষতি হয়। ডিম খেলে বাচ্চার হাঁপানি হয় এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। এসব কুসংস্কারের ফলে গর্ভবতী মায়েরা অপুষ্টিতে ভোগে। সেই সঙ্গে জন্ম থেকেই অপুষ্ট হয় শিশুরাও।
- সন্তান প্রসবের পর মায়েদের আঁতুরঘরে বন্দি করে রাখা হয়। ভাতের সাথে মরিচবাটা, হলুদবাটা এবং নিরামিষ খাওয়ানো হয়। ফলে তারা অপুষ্টিতে ভোগে, নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এতে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে গেলে শিশু উপযুক্ত পুষ্টি ও পরিবেশ পায় না। এতে মা ও শিশু উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- অসুস্থ হলে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নিয়ে গিয়ে পানি পড়া দেওয়া বা ঝাঁড়ফুঁক করা আমাদের সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত।[৩১]

আমাদের দেশে এরকম অসংখ্য কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কুসংস্কার মানুষের মুক্ত বুদ্ধি বিকাশের বড় অন্তরায়। জীবনে এগিয়ে যাবার পথে বড় বাধা। নারী শিক্ষার বিষয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। জীবনে সফল হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। আর জ্ঞান মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামের আলোকে সমাধান

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমাদের সমাজ, পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণে অথবা ডিশ লাইনের মাধ্যমে অপসংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু কুসংস্কারকে প্রতিপালন করে আসছে অথবা হিন্দুয়ানী প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। অথচ ইসলামি অনুষ্ঠান তারা দেখতেও চায় না অথবা কুরআন, হাদিস, ইসলামি বই-পত্র পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে চায়না। ইসলাম নারী জাতির মুক্তি ও মানোন্নয়নে যে অবদান রেখেছে, নারীরা তা অবহিত নয়। কুরআন ও হাদিসে তাদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল নির্দেশাবলী রয়েছে তা তারা জানে না। নারীদের এ অজ্ঞতা তাদের অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। আবার ইসলামি জ্ঞান না থাকার কারণে কোনটা ফরজ, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা সুন্নাত তাও তারা পার্থক্য করতে পারেনা। তাছাড়া হালাল-হারাম ও শরিয়তের বিভিন্ন হুকুম সম্মন্ধেও তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত দুটি চোখ থাকার পরও এবং অক্ষর জ্ঞান থাকার পরও জ্ঞান চর্চার অভাবে তারা অন্ধের মত জীবন যাপন করতে থাকে। আবার আমাদের আলেম সমাজের মধ্যে কয়েকজন এমনও আছেন তারা নিজেদের স্বল্প জ্ঞান সম্মন্ধে অবহিত থেকেও নিজের অজ্ঞতা ধরা পড়ার ভয়ে তার থেকেও বেশি জ্ঞান সম্পন্ন কাউকে মজলিসে কথা বলতে দিতে চায় না। এমনকি প্রতিনিয়ত জ্ঞান চর্চা করে নিজেদের জ্ঞান ভান্ডারকেও তারা সমৃদ্ধ করে না। আবার আমাদের সমাজের কিছু লোক নিজেদের পদমর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য সেই সমস্ত অল্প জ্ঞান সম্পন্ন আলেম সমাজকে প্রতিপালন করে যাচ্ছে। আবার ঐ সমস্ত আলেমগণ নিজেদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে জনপ্রতিনিধিদের সামনে সত্য কথা বলতে নারাজ, এমনকি ক্ষমতাশীলদের ভুলগুলোও তারা ধরিয়ে দেয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে শরীয়ত বিরোধী ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেও তারা তাদেরকে সমর্থন দেয়। তাদের কর্মকান্ড দেখে মনে হয় তারা পরকালের জীবনের চাইতে ইহকালীন জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলছে।

বর্তমানে দুদিক থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখা হচ্ছে।

প্রথমত: ধর্মের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত মানুষকে প্রকৃত ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অশুভ প্রয়াস।

দ্বিতীয়ত: নফস ও প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটি খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হলেও এটা বেশি ভয়াবহ ও অধিক ক্ষতিকর।

অথচ কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ١ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ١ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ۱۱۰

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।"[৩২]

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

الٓرٰ١ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ١ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ١ۙ

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।"[৩৩]

আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

«مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ»

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে মানুষ তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। (আর এ ক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে সে সরকার পরিচালনা করে)।[৩৪]

পুরুষের মধ্যে এমন কিছু লোক সব সমাজেই আছে, যারা মহিলাদের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার অস্বীকারের মধ্যেই এক ধরণের তৃপ্তি অনুভব করেন। তারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা অন্যায় অবিচারের কারণ হয়ে থাকে। ফলে নারীরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করে ও ক্ষেত্রবিশেষে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ইসলাম নারীকে প্রকৃত মর্যাদা, সম্মান ও অন্যান্য অধিকার দান করেছে। যারা সেটা জানে তারা তাদেরকে সম্মান করে। সেখানেই শান্তি ফিরে আসে।

নারীরা এখন তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাবে মোবাইল অথবা টিভিতে অশ্লীল বিষয়ের চর্চা করতে থাকে ও অতি আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। তারা বেপর্দা হয়ে ঘরের বাইরে চলাফেরা করতে পছন্দ করে ও ঘরের মধ্যেও গাইরে মাহরাম লোকদের সাথে পর্দা রক্ষা করে না। ইসলাম প্রদত্ত পর্দা প্রথার যথাযথ অনুস্মরণ না করার ফলে শয়তানের ধোকায় পড়ে, যৌবনের তাড়নায় ও শরীরের চাহিদা মেটাতে তারা বিভিন্ন রকম অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ করে ও গর্ভপাত করতে বাধ্য হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ١ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ١

"তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে তাদের স্বামীদের নিকট, অথবা তাদের পিতাদের নিকট অথবা তাদের স্বামীদের পিতার নিকট অথবা তাদের সন্তানদের নিকট অথবা নারীদের নিকট অথবা তারা যেসব কৃতদাসের মালিক, অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর যাদের এখনো নারীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি।"[৩৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আবার বলেন,

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ١ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

"হে নবি! আপনি মুমিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। কিন্তু যা এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে যায়। আর তারা যেন তাদের ওড়নাসমূহ তাদের বক্ষের উপর রাখে।"[৩৬]

আবার নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا١ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝۲۷

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রশে করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[৩৭]

বেশিরভাগ লোকই এখন নামাজ পড়ে না। সারাদিন মোবাইল, ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে অথবা আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

"ব্যক্তি এবং কুফরী ও শিরকের মাঝে ব্যবধান হলো নামায ছেড়ে দেওয়া।"[৩৮]

বিভিন্ন মাস, দিন অথবা সময়কে তারা কার্য সম্পাদনের জন্য শুভ অথবা অশুভ মনে করে। অথচ ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "অশুভ, অমঙ্গল, অযাত্রায় বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক। রাসূলুল্লাহ (স.) কথাটি তিনবার বলেছেন।"[৩৯]

আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "অশুভ যাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে ব্যক্তি যাত্রা বাতিল করল, সে শিরক করল। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) যদি কেউ এ রকম করে ফেলে তাহলে এর কাফফারা কী? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ আপনার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, আপনার শুভ-অশুভ ছাড়া কোন শুভ-অশুভ নেই। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"[৪০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদম সন্তান যুগকে গালমন্দ করে অথচ আমিই যুগের নিয়ন্ত্রণ কর্তা, রাত ও দিন আমারই কর্তৃত্বাধীন।"[৪১]

এখন ফাইল আটকে ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি একটি রীতি বা প্রথার পর্যায়ে পড়ে। যেন এটাই নিয়ম যে, কাউকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে গেলে বাড়তি টাকা দিতে হবে যদিও সেই লোক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেতন নিয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারপরও অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার লোভ তারা সামলাতে পারে না।

আবার অনেক হাফিজ, মাওলানা, পীর-দরবেশ নামধারী লোক টাকার বিনিময়ে অমঙ্গল দূর করে মঙ্গল আনয়নের উদ্দেশ্যে তাবিজ দিয়ে থাকেন। আবার তারা ওয়াজ-নসীহত এর মাধ্যমে অনেক টাকা উপার্জন করেন। তারা বক্তৃতা দেন টাকার বিনিময়ে। এভাবে অল্প কয়েক দিনে তারা অনেক টাকার মালিক হয়ে যান।

অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-'ইচ্ছাকৃত দান ছাড়া কোনো মুসলিমের মাল অন্য মুসলিমের জন্য হালাল নয়।'[৪২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۱۷

"আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবার উপরে ক্ষমতাবান।"[৪৩]

এখনকার সময়ে সুন্নতি পোষাক পরা ও দাড়ি রাখাকে অনেকে লজ্জাজনক বিষয় বলে মনে করে থাকে। এবং জন্মদিন, গায়ে হলুদ, বিবাহ বার্ষিকীসহ বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা খুব আগ্রহ নিয়েই করে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কারকে আঁকড়ে পড়ে থাকে।এ ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য ধারণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"[৪৪]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি আমার দীনে এমন কোন বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা মূলত এ দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা-ই প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৪৫]

পুরুষের দ্বিতীয় বিয়েকে সমাজে খারাপ চোখে দেখা হয় অথচ পতিতালয়ে গমনকে অতটা দোষনীয় মনে করা হয় না। সমাজের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি পতিতালয়ে যেতে অভ্যস্থ। ফলে এতে তাদের অর্থের

অপচয়ের সাথে সাথে রোগাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং যেনা ব্যভিচারের গুনাহ অর্জন এর ফলে পরকালের কঠিন শাস্তির উপযোগী হয়।

অথচ সমাজে দ্বিতীয় বিয়ের প্রচলণ থাকলে স্বামী পরিত্যক্তা, তালাক প্রাপ্তা, বিধবা, অসহায় প্রভৃতি মেয়েরা স্বামীর আওতায় থেকে সম্মানের সাথে পাপমুক্ত জীবন অতিবাহিত করতে পারত। সমাজে এখন বেশিরভাগ মেয়ে বিয়ের আগে এক/একাধিক প্রেম করে শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মেটায়।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের জনৈকা মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে নবি (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর নবি। আমি দন্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, তাই আমাকে দণ্ডিত করুন। নবি করিম (স.) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভাল ব্যবহার করো এবং সে সন্তান প্রসব করলে তাকে নিয়ে আমার এখানে এসো। সে তাই করল। মহিলাকে কাপড় দিয়ে ঢেঁকে ফেলা হল। তারপর নবি (স.)-এর আদেশক্রমে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল এবং তার জানাযা পড়া হল। তখন উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবি! আপনি এই যিনাকারী মহিলার জানাযা পড়লেন? তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে, যা মদীনার সত্তর জন লোকের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের ক্ষমার জন্য তা যথেষ্ট হত। সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। এর চেয়ে উত্তম তওবা কি তুমি করেছো।" [৪৬]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ١ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ۚ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۲ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً١ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ١ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ۳

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।"[৪৭]

অথচ বেশির ভাগ মেয়েরই সে সব ছেলেদের সাথে বিয়ে হয় না বিয়ে সংক্রান্ত জটিলতার কারণে। দেখে, শুনে, বুঝে, যাচাই করে একটা বিয়ে করতে হবে বিধায় পছন্দের ছেলেটাকে বাদ দেয় অথবা ছেলেটাই বিয়ে করতে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেয় না। ফলে পরবর্তীতে অন্যের সাথে বিয়ে হওয়াতে তারা নানারকম অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হন। পূর্বের প্রেমের খবর পরিবার জেনে ফেলে। ফলে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে অনেকের সংসারে বাচ্চা হওয়াতে বাচ্চাসহই বিবাহ বিচ্ছেদের মত জটিল পরিস্থিতির সম্মূখীন হয় এবং বাচ্চাগুলো বাবা মায়ের একজনের অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তাদের উভয়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। বাবা-মা নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা বাবা, মা যার সাথেই থাকুক না কেন তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং সমাজে ঐ মহিলা অথবা পুরুষটিকে নানাভাবে হেয় হতে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর অনেকে নতুন সংসার গড়ে আবার অনেকে সারাজীবন একাকী জীবন কাটিয়ে দেয়। ফলে তারা সামাজিকভাবে নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তারা মানসিকভাবে থাকেন কষ্টকর পরিস্থিতিতে। অনেকে নিজের যোগ্যতায় স্বাবলম্বী হয়ে জীবন যাপন করে। আবার অনেকে গোপনে অন্যায় কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সমাজের কিছু মুখোশধারী ভদ্রলোকের খপ্পরে পড়ে। অথচ ইসলাম দ্বিতীয় বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানের সাথে জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। অনেকের স্ত্রী অসুস্থ থাকলেও সমাজের ভয়ে দ্বিতীয় বিয়ে না করে গোপনে পাপ কাজ করে যৌন চাহিদা নিবৃত করে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ﴿۳﴾

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।"[৪৮]

আল্লাহ পরবর্তীতে বলেন,

وَ لَنۡ تَسۡتَطِیۡعُوۡۤا اَنۡ تَعۡدِلُوۡا بَیۡنَ النِّسَآءِ وَ لَوۡ حَرَصۡتُمۡ فَلَا تَمِیۡلُوۡا کُلَّ الۡمَیۡلِ فَتَذَرُوۡهَا کَالۡمُعَلَّقَۃِ ؕ وَ اِنۡ تُصۡلِحُوۡا وَ تَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ کَانَ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۱۲۹﴾

"আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৯]

তৃতীয় হিজরীর সময় ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে পিতৃহারা এতিম সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করে। উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল সেই সময়েই। তাছাড়া ঘরে অসুস্থ অথবা বন্ধ্যা স্ত্রী থাকলে যুক্তিসঙ্গত কারণে মানুষ দ্বিতীয় বিয়ে করে পাপের হাত থেকে ও শারিরীক কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

সাময়িক জৈবিক বাসনা পূরণ কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মুতআ বিবাহ করে নারীকে উপভোগ করে নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারীকে সমাজে অপমানিত, অবহেলিত, অপদস্ত করা ইসলাম পরে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মুতআ বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সংগঠিত হলেও মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (স.) এ ধরণের বিবাহকে হারাম করেছেন।[৫০]

যেসব পুরুষ লোকের স্ত্রী মারা যায় তাদের দ্বিতীয় বিয়েকে সমাজ খারাপ চোখে দেখে না, কিন্তু এ জাতীয় লোকের সংখ্যা মেলানো কষ্টকর অথবা দেখা যায় বয়সের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে তালাকপ্রাপ্তা/ বিধবা অল্পবয়স্কা মেয়েগুলো নিজেদের শারিরীক চাহিদা মেটাতে বিপথগামী হয় ও সামাজিক ভাবে লাঞ্ছনা, গঞ্জনার স্বীকার হয়।

নিচে ইসলাম স্বীকৃত নারী ও পুরুষের বিবাহের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

রাসূলের (স.)-এর সাথে খাদিজার বিয়ের সময় রাসূলের বয়স ছিল ২৫ বছর ও খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। দুজনের অভিভাবকগণের মধ্যস্থতায় বিবাহ কর্ম সম্পাদিত হয়। এর পূর্বে খাদিজার আরও দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং তিনজন সন্তানও ছিল। আবু হালা ইবন হারার সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। আবু হারার ঔরসে হিন্দ নামক এক পুত্র ও যয়নব নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আবু হালার মৃত্যুর পর উতায়্যিক ইবন আবিদ এর সাথে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। উতায়্যিকের ঔরসে হিন্দু নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উতায়্যিকের মৃত্যুর পর রাসূল (স.)-এর সাথে তার তৃতীয় বিবাহ হয়।[৫১]

হযরত আতিকা (রা.)-এর অনেক গুলো বিয়ে হয় ও স্বামীর সংসারে সম্মানের সহিত জীবন অতিবাহিত করেন।

আতিকার বিয়ে হয়েছিল হযরত আবুবকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ এর সাথে। বিশেষ কিছু কারণে আবূবকর (রা.) তালাক দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। পিতার পরামর্শ অনুযায়ী আবদুল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে, কিন্তু এ কাজের জন্য তার যথেষ্ট অনুশোচনা ও দুঃখ ছিল। কারণ তিনি আতিকাকে খুবই ভালবাসতেন। আবদুল্লাহর আগ্রহ দেখে হযরত আবূবকর (রা.) আতিকাকে পূনরায় বিয়ে করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি তাঁকে পুনরায় বিয়ে করলেন। তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ শহীদ হলেন। কোন কোন রিওয়ায়েত অনুসারে এরপর যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতিকাকে বিয়ে করলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে উমর (রা.) এবং তারপর যুবায়র (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয়।

হযরত যুবায়র (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতিকা নিজেই বিয়ে করতে অস্বীকার করেন।[৫২]

সাহল বিনতে সুহাইলের বিয়ে হয়েছিল পর পর চার জনের সঙ্গে অর্থাৎ হযরত হুযাইফা বিন আতাবা (রা.), আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ, শাম্মাখ ইবনে সাইদ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এর সাথে।[৫৩]

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয় হযরত আলী (রা.)-এর ভাই জাফর (রা.)-এর সাথে। অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলাতে অনুষ্ঠিত মুতা'র যুদ্ধে জাফর (রা.) শাহাদাত লাভ করলে আসমা হযরত আবূবকর (রা.)-কে বিয়ে করেন। আবূবকর (রা.)-এর ওফাতের পর তিনি আলী (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৫৪]

হযরত আলী (রা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম আপন চাচাতো ভাই আউন বিন জাফরের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। আউন এর মৃত্যুর পর তারই অপর ভাই মুহাম্মদ বিন জাফরকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ এর ওফাতের পর তাদের অন্য ভাই আবদুল্লাহ বিন জাফরের সাথে উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়।[৫৫]

রাসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রা.) ছাড়া অন্য সবাই বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন। অথচ এখনকার সময়ে পুরুষরা টাকার জোরে অথবা ক্ষমতার জোরে গোপনে ঐ সমস্ত বিপদগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু বাচ্চা নিতে চায়না। অনেক ক্ষেত্রে এই সব বিয়ের কোন প্রমাণপত্র রাখে না। হুজুর ডেকে মুখে মুখে বিয়ে করে ও প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে মেয়েটিকে ত্যাগ করে ও লোক সমাজে মাথা উচু করে চলাফেরা করে। মেয়েটি অসাবধাণতাবশত গর্ভবতী হয়ে গেলে বাচ্চা নষ্ট করতে বাধ্য করে অথবা পিতৃ পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যেহেতু বিয়ের কোন প্রমাণপত্র নেই।

পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহর আইনে মাতৃ উদরে, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর হতেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে মহানবি (স.) গোমেদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন নি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর তার মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা ছিল। সুতরাং ইসলামি আইন বিশারদগণ সন্তান গর্ভধারণের ১২০ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য্য করেছেন। কেননা এই সময়ে গর্ভ সঞ্চার (Fetus) গোশতপিন্ডে রুপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর 'মানুষ' পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। ইসলামের এ অভিমত শত-সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে।[৫৬]

আবার বাবারাও কন্যাদেরকে সম্পত্তির অংশ দিতে চায়না আর দিলে খুব কম অংশ দেয় এবং পুত্রদের জন্য বেশিরভাগ অংশই রেখে দেয়। অথবা আগে থেকেই পুত্রদেরকে বেশি পরিমাণে ও মেয়েদেরকে খুবই কম পরিমাণে সম্পদ লিখে দেয়। অথবা নিজের নামে অল্প কিছু সম্পদ রাখে যা তার মৃত্যুর পর অল্প অংশ মেয়েরা ভাগে পায় ওয়ারিশদের সম্পদ বন্টনের নিয়ম অনুযায়ী। বাবা আগে থেকে সম্পদ ভাগ করে দেয় না ও বুঝিয়ে দেয় না। ভাইয়েরা বাবার মৃত্যুর পর বোনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করতে চায় অথবা সম্পদ ফাঁকি দিতে চায়। বাবা অথবা ভাই না থাকলে চাচারা অথবা অন্যান্য প্রভাবশালী নিকটতম আত্মীয়রা সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করতে চায়।

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্পর্কে আল-কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ١ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ١ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا۝

"কম হোক বেশি হোক, পুরুষ ও নারীদের জন্য পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়ের পরিত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে রয়েছে নির্ধারিত অংশ।"[৫৭]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতাপিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতাপিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতাপিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৫৮]

আমাদের দেশের বেশির ভাগ এলাকায় স্বামী/ শ্বশুর বাড়ির লোকজন কর্তৃক স্ত্রীকে দমন করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যৌতুকের জন্য শারিরীক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করে, মোহরানা তো দেয়ই না বিবাহ বিচ্ছেদের আগ পর্যন্ত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

"তোমরা স্ত্রীদের মহর সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করে দাও।"[৫৯]

এবং স্ত্রীর মোহরের টাকা যেন পরবর্তীতে জোর করে নিয়ে নিতে প্রলুব্ধ না হন সে প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,

وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ

"তোমাদের জন্য হালাল হবে না, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা থেকে কোনো অংশ পূণরায় নিয়ে নেওয়া।"[৬০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রা.) রাসূল (স.)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন,

উকবা ইবন আমের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা বিয়ের যে শর্তসমূহ পূরণ করে থাক, তার মধ্যে অধিক উপযুক্ত হলো স্ত্রীর লজ্জাস্থানের অধিকার আদায়ের পূর্বেই তার হক আদায় করে দেওয়া।"[৬১]

তবে আল্লাহ তাআলা স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীকে খুশি হয়ে কিছু অর্থ দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝

"যদি তারা সেখান থেকে কিছু অংশ স্বেচ্ছায় তোমাদেরকে দান করে তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পার।"[৬২]

অতএব বাসর রাতে স্ত্রীর নিকট মহরের টাকা মাফ চাওয়ার যে রীতি বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তা ইসলামি শরিআতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কার্যকরও নয়।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে খাও।[৬৩]

রাসূল (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন, "যথাযথভাবে তাদের (নারীদের) পানাহার ও পোষাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর অপরিহার্য।"[৬৪]

মানুষ যেন খুশি মনে সন্তুষ্ট চিত্তে তার পরিবারের জন্য উপার্জন করে ও ব্যয় করে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

"সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিয্ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে। আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশি। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন।"[৬৫]

রাসূল (স.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম।[৬৬]

হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, একজন স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, তুমি যখন খাবে, তখন তাকে খাওয়াবে, আর তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তখন তাকেও কাপড় পরিধান করাবে। আর স্ত্রীর মুখমন্ডলে কখনও আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে কখনও ঘর থেকে বের করে দিবে না।"[৬৭]

নবি (স.) আরো বলেছেন, "একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ নারীদের সম্মান করে না। আর কেবলমাত্র নীচাশয় হীনমনা লোক ছাড়া আর কেউ তাদের অবমাননা করে না।"[৬৮]

আবার অবিবাহিত নারী-পুরুষ যেন পাপের পথে না যেতে পারে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও বিয়ে সম্পাদন করে দাও।"[৬৯]

আল্লাহর নির্ধারিত জীবন পদ্ধতি অনুস্বরণ করলে যে সফলতা লাভ করা যাবে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

স্মরণীয় সেদিন যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ এবং নারীদেরকে, তাদের সম্মুখে ও ডানপার্শ্বে তাদের নূর ছুটা ছুটি করবে। (তাদের বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য অনন্ত-অসীম আনন্দময় জান্নাতের সূসংবাদ যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই মহাসাফল্য।[৭০]

নারী জাতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূল (স.)-এর বাণীসমূহ নিম্নরূপ:

হযরত আনাস (রা.) বলেন নবি করীম (সা) বলেন,

"এই পৃথিবী থেকে আমার প্রিয় বানানো হয়েছে নারী সুগন্ধি এবং নামাযের মধ্যে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[৭১]

হযরত ইবনে উমর (রা.) রাসূল (স:)-এর পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন যে, "এ বিশ্ব ভূমণ্ডল পুরোটাই ভোগ সম্ভার ও আনন্দ উল্লাসের সামগ্রী। তার মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রী হল নেক ও সৎ কর্মপরায়ণ নারী।[৭২]

অথচ আমাদের সমাজে বাবার মৃত্যুর পর পুত্রগণ মায়ের দায়িত্ব নিতে চায় না ও বোনদের সম্পদ বুঝিয়ে দিতে মাকে বাধা দেয়। অনেক পিতা মাতা এখন বৃদ্ধাশ্রমে বাস করে এই সকল জটিলতার কারণে।

ভাইয়েরা বোনের খোঁজ খবর নিতে চায়না অথবা বোনের পিছনে টাকা খরচ করে তাকে যথাযথভাবে মানুষ করতে চায়না। মা ও বোন, ভাই-ভাবীর কাছে লাঞ্চনাকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার সাথে করণীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে বলেন,
وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।"[৭৩]

মাতার প্রাধান্য বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত একটি ঘটনা নিম্নরূপঃ

জনৈক সাহাবি যিনি তার স্ত্রীকে নিজ জননীর উপর কিছুটা প্রাধান্য দিয়ে থাকতেন এবং মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠ করতে অপারগ হচ্ছিলেন, এ সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে অবস্থান করছিলাম, এমন সময় জনৈক আগন্তুক এসে বললেন, মৃত্যু পথযাত্রী এক যুবক খুবই কষ্ট করে, শ্বাস গ্রহণ করছে, সে মুহূর্তে তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে বলা হলে সে কালিমা পড়তে পারেনি। রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, সে সালাত আদায় করতো কি? লোকটি উত্তর দিলো সে সালাত আদায় করতো। এরপর রাসূল (স.) উঠে রওয়ানা করলেন আমরা তার সাথে গেলাম। রাসূল (স.) যুবকের কাছে প্রবেশ করে, তাকে কালিমা পাঠ করতে বললেন। যুবকটি বললেন, আমি উচ্চারণ করতে অপারগ। রাসূল (স.) উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম হবার উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে কি? জনৈক ব্যক্তি বলল, সে তার মায়ের অবাধ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তাকে ডেকো আনো। এরপর মহিলা উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ যুবকটি আপনার ছেলে? মহিলা বললেন হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স.) মহিলাকে বললেন, যদি এখানে আগুনের কুন্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়, আর আপনাকে বলা হয়, আপনি তার জন্য সুপারিশ করলে আমরা তাকে মুক্তি দেবো নতুবা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো-তাহলে কি আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন? মহিলা বললেন অবস্থা এমন হলে আমি তার জন্য অবশ্যই সুপারিশ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন। তাহলে আপনি আল্লাহ এবং আমাকে স্বাক্ষী রেখে বলুন। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।" তখন মহিলা বললেন, হে আল্লাহ আমি আপনাকে এবং আপনার রাসূল (স.)-কে স্বাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট।" তখন রাসূল (স.) বললেন এই ছেলে বল, ' লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহেদ লা-শারীকা লাহ-ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তখন সে যুবক তা বলতে সমর্থ হলো। সে সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বললেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন। অতএব উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, মাতার উপর অন্য কোন সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া সন্তানের জন্য সঠিক হবে না। এবং মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মুক্তির পথ সন্তানের জন্য সুগম হবে।[৭৪]

রাসূল (স.) বৃদ্ধাবস্থায় মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক), ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি কে? প্রতি উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতা বা পিতা অথবা উভয়কে বৃদ্ধা অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে

প্রবেশ করল না। অর্থাৎ মাতাপিতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করল না তাদের ধ্বংস হোক।”[৭৫]

বোনের প্রতি দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন,
“যে ব্যক্তি দুই বা তিন বোন প্রতিপালন করলো, আমি এবং সে অত্যন্ত কাছাকাছি থাকবো এবং মধ্যমা ও তর্জনা আঙ্গুলদ্বয় ইঙ্গিত করে দেখালেন।”[৭৬]
মা মানসিকভাবে কষ্টের স্বীকার হয়ে অভিশাপ দেয় ফলে সেই অবাধ্য সন্তান কিছুদিন আনন্দের সাথে জীবন কাটলেও পরবর্তীতে মা-বোনদের অভিশাপে কষ্টকর জীবন-যাপনের সম্মুখীন হয়। ফলে তার জীবন অশান্তিময় হয়ে ওঠে।
ইসলাম মেনে চললে ও কুরআন-হাদিস অনুসরণ করলে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করত। স্ত্রী, বোন, মা, মেয়ে সবাই তাদের প্রাপ্য সম্মান পেত। আল্লাহ রাসূলের ভয়ে মানুষ মেয়ে জাতির সাথে ভাল ব্যবহার করত। রাসূলকে ভালবেসে মানুষ মেয়ে শিশুদের সাথে ভাল ব্যবহার করত। বিয়ে করে বৈধ পন্থায় সন্তান জন্ম দিত। ফলে ধর্ষণ, হত্যা, গুম, নির্যাতন, ডিএনএ টেষ্ট এগুলোর প্রয়োজন হত না। নারী পেত তার যোগ্য সম্মান। সামাজিক ও আর্থিক ভাবে সবাই লাভবান হত। কিছু লোক ইসলামের ত্রুটি ধরে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করলে ও জানলে এত ভন্ডামির প্রয়োজন হত না ও গলা ফাটিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নামতে হতো না।

জ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত আছে,
يُّؤْتِى الحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَ مَنْ يُّؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٢٦٩
“তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে।”[৭৭]

অন্যত্র বর্ণিত আছে,
وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَمَا يَخْشَى اللّٰه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰه عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ٢٨
“বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।”[৭৮]
হাদিসের ভাষায়,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،

“জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ।”[৭৯]

এবং আমরা জানতে পারি যে “হযরত সা’আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা (রা.)-এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ুব সুখতিয়ানী এবং হাকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ ও রয়েছেন।”[৮০]
ইমাম শাফেয়ী (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর নাতনী সাই’য়িদী নাফিসা (রা.)-এর কাছে গিয়ে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[৮১]
আব্দুর রহমান ইবনে শম্মোস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন, ...আমি আমার এই ঘরে বসে রাসূল (স.)-কে যা বলতে শুনেছি তাই তোমাকে বলছি, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো, কিন্তু সে তাদের কষ্টের কারণ সৃষ্টি করলো, তুমি ও

তাকে কষ্ট দিও। আর যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সে তাদের সাথে কোমল আচরণ করলো, তুমি ও তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করো। [৮২]

আমাদের উচিত কুরআন-হাদিসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে সেভাবেই আমাদের জীবনটাকে পরিচালনা করা, কুসংস্কার মুক্ত হয়ে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক চলা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জীবনকে সফল ও স্বার্থক করে তোলা। সমাজের মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে এনে আলোর পথ দেখানো যেন তারা কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক বুঝে সঠিকভাবে চলতে পারেন ও সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারেন। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, সমস্যাগ্রস্ত এ সমাজে নারীদের হেয় করার জন্য ও বিভিন্ন উপায়ে দমনের জন্য অতীতকাল থেকে বিভিন্ন রকম কুসংস্কার সমাজে প্রচালিত ছিল। যার কু প্রভাব থেকে এখনও মানব সমাজ বেরিয়ে আসতে পারে নি। কিছু কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হলেও এখনও সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কারকে মানব সমাজ আঁকড়ে ধরে রয়েছে এবং যার লালন পালন ও করে চলেছে। বিশেষ করে পাক ভারত উপমহাদেশের প্রচলিত কিছু কুসংস্কার খুব শ্রদ্ধার সাথে মানুষ এখনও প্রতিপালন করে যাচ্ছে। আল-কুরআন সুস্পষ্ট ভাবে এ সকল কুসংস্কারের সমালোচনা করে ও তার কুপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে। বাঙালি সমাজেও কিছু কিছু কুসংস্কার এর প্রভাবে নারীগণ তাদের যথার্থ সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আল-কুরআন ও আল-হাদিস এর যথার্থ অনুকরণ ও অনুস্মরণই এ সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

তথ্যসূত্র

১। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ৮ম মুদ্রণ ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১৬১
২। দ্র: *Oxford English Dctionary,* 2nd Edition (Oxford: University Press-1989) P. 10-12.
৩। Edited by Catherine Soanes, *Oxford Reference Dictionary*, [New York: Oxford University Press.] P. 841.
৪। Hasan S. karimi, Al-Mughni, *Active study dictionary of English,* Bairut, Librarie Duliban, 1st Edition, 1994. P. 460.
৫। ইব্ন মনযুর, *লিসানুল আরব*, (কুম: নাশরুল আদাবিল হাওয়াহ, স.বি. ১৪০৫ হি.) পৃ. ৭১।
৬। Stuart A. Vyse, *The Psychology of Superstition,* (New York: Oxford University Press.1997) P. 153.
৭। Welliam Manning, *The Wrongs of Man,* (London: Princeton University Press, 1838), P.4.
৮। D. Morison, *The Religious History of Man,* Tracing Religion and superstition. (Brook Field: Te Mill Book Press, 2000), P. 43.
৯। জেনানা মহল বলতে অন্দর মহলে নারীদের আব্রু ও মর্যাদা সহকারে অবস্থানের আলাদা মহলকে বুঝানো হয়ে থাকে। যা মুসলিম নারীদের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিচায়ক ছিল। সেখানে যে কোন পুরুষের যখন তখন প্রবেশ অধিকার সংরক্ষিত ছিল। এটা নারীদের জন্য অবরোধ নয়। তবে প্রয়োজনে নারীর বাইরে যাওয়ার অধিকার এবং পুরুষের ভিতরে প্রবেশের অধিকার ইসলাম অনুমোদন করে।
১০। ডুব্লু গালিচার, *উইমেন আন্ডার পলিগেমি*, পৃ. ১৯৯। উদ্ধৃতি: ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ১৮
১১। M.M. Siddiqdui, *Women in Islam,* chap-111, উদ্ধৃতি: ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১২। পরিপূর্ণভাবে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন এবং নারীর অধিকার প্রদান কখনও করা হয়নি। বরং পুরুষের কতৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নারীর উপর নির্যাতন ও অধিকার হরণ হয়েছে নানাভাবে।
১৩। স্বামীর চিতায় স্ত্রীর এই জীবন্ত সহমরণকে সতীদাহ বলা হয়। অসহায় বিধবা মেয়েদের সতীদাহের সময় পূর্ণবতী বলা হত। অথচ বেঁচে থাকার সময় কোন মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা, নানাভাবে তাদের লাঞ্ছিত হতে হত। সতীদাহ প্রথার সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পারিবারিক সম্মান ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে সতীদাহ প্রথার মত লোমহর্ষক নারী হত্যাকান্ড সমাজ স্বীকৃত ছিল। (মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি. পৃ. ৮)।
১৪। স্বামীর মৃত্যর পর বিধবাদের কাছে সমাজপতিরা এই প্রস্তাব রাখত যে, দুটো পথ তাদের কাছে খোলা-হয় সহমরণে রাজি হবে, নয়তো সম্পত্তির অধিকার পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে, এমনকি তার সন্তানদের সম্পত্তির কোন অধিকার থাকবে না। সন্তানদের যেন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে এই আকাঙ্ক্ষায় বিধবারা সহমরণে রাজি হত। কিন্তু অসহায় সন্তানদের ফাঁকি দিয়ে সমাজপতি ও পরিবারের অন্যরা সম্পত্তি হস্তগত করত।
(মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৮
১৫। ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২২; উদ্ধৃতি: *এশিয়াটিক জার্নাল*, ১৮২৭ খ্রি. ভলিয়্যম ২৩, পৃ. ৬৮৯
১৬। নির্মল সেনগুপ্ত, *রাজর্ষি রামমোহন*, সাধারণ ব্রাহ্মন সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭২ খ্রি. পৃ. ৫৩

১৭। *এশিয়াটিক জার্নাল*, ১৮২৭ খ্রি. ভলিয়ুম ২৩, পৃ. ৬৮৯

১৮। তৎকালীন রাজপুত মেয়েরা সাহসিকতার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত। এ কারণেই এটা অত্যন্ত সত্য যে অবিভক্ত বাংলায় বা ভারতবর্ষে সে সময় বাঙালি মেয়েদের মরতে হত না। (মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)।

১৯। কুলীন পুরুষের কাছে কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার পর মেয়ের বাবা মা কুলীন জামাইয়ের বাৎসরিক খরচ দিতেন। বিবাহিত কুলীন মেয়েরা বাবা মা মারা গেলে মামা বাড়িতে দাসত্ব করে। ঝি গিরি করে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। এই যন্ত্রনা ও কষ্ট ভোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য অধঃপতিত সমাজের প্রলোভনের হাতছানিতে বহু কুলীন মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। (চিত্রাদেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খ্রি. পৃ. ১০)।

২০। মাহমুদ কবীর, *বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা:সূচিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-২০০৩ খ্রি. পৃ. ১২

২১। এর শুরু তাঁর মায়ের প্রেরণায়। এর পিছনে কারণ ছিল। সংস্কৃত কলেজের নানাবিধ কাজের মধ্যে তীব্র সমাজ সংগ্রামে ব্যাপৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর মা কাঁদতে কাঁদতে এসে ছোট এক বালিকার বৈধব্যের কথা বলে বললেন-এত শাস্ত্র পড়িলি তাহাতে বিধবার কি কোন উপায় নাই? তখন থেকে মা ও ছেলে বিধবা সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হলেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চরিত্র পূজা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, ভাদ্র ১৩০২, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬৫ খ্রি. পৃ. ৪৯২, বিশ্বভারতী, কলকাতা)।

২২। প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব*. কলকাতা:বুক ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারি-১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৮৩

২৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর লেখনীতে সমাজ-পতিদের বিবেকের কাছে তীব্র প্রশ্ন তোলেন যে, বিধবাদের ওপর পুরুষের শারীরিক বলপ্রয়োগের ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা দেখা দিলে ভ্রুণ হত্যার মতো সামাজিক অত্যাচার প্রশ্রয় দিতে যারা দ্বিধা করেন না তারা কেন বিধবা বিয়ের প্রশ্নে এত বিতর্ক তুলছেন? (মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১)।

২৪। এই বিধবা মেয়েটির নাম কালীমতি, মাত্র চার বছর বয়সে বিয়ে ও ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়ে কালীমতি তখন ১০ বছরের বালিকা মাত্র। কিন্তু বৈধব্য জীবনের নানাবিধ বিধি-নিষেধের ফলে ওই বালিকা বয়সেই তার জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালীমতির বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের বজ্রপন্ডিত সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীশ চন্দ্র (বন্দোপাধ্যায়) বিদ্যারত্নের সঙ্গে। এই বিয়ের খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকার ব্যয়ভার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন। সে সময়ের বহু গুণীজন, সংস্কৃত, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। (মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৫। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে তার বিরোধ বাঁধে। তখন তিনি বলেন-আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমি উদ্যোগ করে অনেকের বিবাহ দিয়েছি। এমতাবস্থায় আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করে কুমারী বিবাহ করলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাতে পারতাম না। (প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২)।

২৬। তাবয়ীনুল হাকাইক, *শরহু কানযিদ দাকাইক*, ১ম খণ্ড, পৃ.৩২২

২৭। মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (র.), *ইসলাহুর রুসূম*, অনুবাদ: মাওলানা সিরাজুল হক, ঢাকা: দারুল কুরআন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৮. পৃ. ৬৯

২৮। বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৫০৪০

২৯। মো: ইউসুফ, *বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ইসলামি শরিআতের দৃষ্টিভঙ্গি-একটি পর্যালোচনা*, পি. এইচ. ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত, পৃ.৯৪-৩০২ দ্রষ্টব্য।

৩০। ব্যতিক্রমধর্মী মাসিক পত্রিকা, *সংস্কার*, সংখ্যা ১৮১, এপ্রিল ২০১৩ খ্রি. পৃ. ১০, মুদ্রণ বাকো অফসেট প্রেস, ১৮ ঋষিকেশ দাস রোড, একরামপুর, সুত্রাপুর, ঢাকা-১০০০

৩১। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, ব্র্যাক প্রিন্টার্স, ৪১ টংগী শিল্প এলাকা, ব্লক-সি টংগী গাজীপুর-১৭১০, পৃ. ৩৫-৩৬
৩২। আল-কুরআন, ৩: ১১০
৩৩। আল-কুরআন, ১৪: ১
৩৪। তিরমিযী, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুয যুহদ অধ্যায় এর বরাতে জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২; মাওলানা আব্দুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৩৫। আল-কুরআন, ২৪:৩
৩৬। আল-কুরআন, ২৪:৩১
৩৭। আল-কুরআন, ২৪:২৭
৩৮। মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১১৬
৩৯। আবূ দাউদ, সুলাইমান বিন আস'আস বিন ইসহাক (মৃ. ২৮৫ হি.); *আস-সুনান;* দামেশ্‌ক, দারুর রিসালাতুল 'আলামিয়্যাহ; প্রথম প্রকাশ ২০০৯ খ্রি. হাদিস নং ৩৪১১
৪০। আহমাদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬৭৪৮
৪১। বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৫৭১৩
৪২। আবু বক্কর আহমাদ ইবন হুসাইন, *বায়হাকী*, আস সুনানুল কুবরা, "মক্কা" মাকতাবাতু দারিল বায, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৪ খ্রি. খ. ৬, পৃ. ১০০
৪৩। আল-কুরআন, ৬: ১৭
৪৪। আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু ফী লুবসি শাহরাতি, হাদিস নং ৬৫১২
৪৫। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১২
৪৬। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২০
৪৭। আল-কুরআন, ২৪: ২-৩
৪৮। আল-কুরআন, ৪:৩
৪৯। আল-কুরআন, ৪:১২৯
৫০। নারীর প্রকৃত মর্যাদা, একটি প্রামাণ্য আলোচনা, হাফেজ মাসউদ আহমাদ (মাসুম), *মাসিক মদীনা*, জুন ২০০২ খ্রি. সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা, পৃ. ৪৯-৫০
৫১। শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি. / ১৪১৯ হি. ঢাকা ইসলামিক রিচার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৯৬১
৫২। মুহাম্মদ বিন সাদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, দারুল ইয়াহিয়াত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, লেবানন: ১৯৯৬ খ্রি. ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮২, দ্রষ্টব্য, মাঃ সাইয়িদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৪৫৬
৫৩। মুহাম্মদ বিন সাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪
৫৪। মুহাম্মদ বিন সাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯১
৫৫। মুহাম্মদ বিন সাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩
৫৬। মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০১, পৃ. ২২৫
৫৭। আল-কুরআন, ৪:৭
৫৮। আল-কুরআন, ৪:১১
৫৯। আল-কুরআন, ৪:৪
৬০। আল-কুরআন, ২:২২৯
৬১। বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৭৫৪
৬২। আল-কুরআন, ৪:৪

৬৩। আল-কুরআন, ১৬: ৯৭
৬৪। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৮০
৬৫। আল-কুরআন, ৬৫:৭
৬৬। ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, বিবাহ অধ্যায়, স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ, ১৯৭৭ নং হাদিস এবং সহীহ জামে আস সগীর, হাদিস নং ৩৩০৯
৬৭। আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪
৬৮। আব্দুর রউফ আল মানাভী, *ফায়যুল কাদীর*, খ.৩, মিশর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হি.পৃ. ৪৯৬
৬৯। আল-কুরআন, ২৪: ৩২
৭০। আল-কুরআন, ৫৭: ১২
৭১। আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব (মৃ. ৩০৩ হি.); *আস-সুনানুস সুগরা*, বৈরূত: মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬ খ্রি. খ.৩, পৃ. ৯৩
৭২। মিশকাত ২: ২৬৭
৭৩। আল-কুরআন, ১৭: ২৩-২৪
৭৪। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি. পৃ. ৭৬-৭৭
৭৫। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব আত তীরমিযী। *মেশকাতুল মাসাবিহ*, আদব অধ্যায়, খ. ৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ১৩৭৬
৭৬। আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৪৭-১৪৮
৭৭। আল-কুরআন, ২: ২৬৯
৭৮। *আল-কুরআন*, ৩৫: ২৮
৭৯। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতীব আত তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*: কিতাবুল ইলম, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, পৃ. ৭৬
৮০। ইবনে হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহ্যীব*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৪ খ্রি. .পৃ. ৪৩৬
৮১। ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান ইরান*, মিশর: আল মাতবা আতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হি. খ. ২, পৃ. ১২৯
৮২। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়: নারী সহিংসতা প্রতিরোধ ও অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

নারী সহিংসতা প্রতিরোধ ও অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

যুগ যুগ ধরে নারী লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, গঞ্জনা ও অবহেলার স্বীকার হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আশাব্যঞ্জক হলেও সত্য যে, বাঙালি নারীরা এখন উন্নতি, অগ্রগতি ও সম্মানের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের প্রধান মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও স্পীকার নারী। তাই নির্যাতিত নারীদের উন্নতি কল্পে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। বাঙালি নারীদের মাঝে আজ উন্নতির ছোয়া লাগতে শরু করেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতনের ধরণ

পরিবারে বা সমাজে একজন নারীর প্রতি যেসব আচরণের ফলে তার শারীরিক, মানসিক বা অন্য যে কোন ধরণের ক্ষতি হয় বা হতে পারে, সেই আচরণ গুলোকেই নারী নির্যাতন বলে। কোন নারীকে এই ধরণের ক্ষতির হুমকি দেওয়াও নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। এখানে নারী বলতে মেয়ে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা পর্যন্ত সকল বয়সী নারীকে বোঝানো হয়েছে।

নারীরা সাধারণত ৪ ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়। এগুলো হল-

১. শারীরিক নির্যাতন

যে নির্যাতনের ফলে নারীর শারীরিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে তাই হল শারীরিক নির্যাতন। যেমন: কিলঘুষি বা চড়থাপ্পড় দেওয়া, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া, লাঠি বা চাকু বা অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করা, গলা টিপে ধরা, এসিড নিক্ষেপ, গরম কিছু দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, কামড় দেওয়া, গর্ভপাতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

২. মানসিক নির্যাতন

নারীকে শারীরিক আঘাত না করেও কোন কথা, আচরণ বা ব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক কষ্ট, ক্ষতি বা চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নির্যাতন করাকে বলে মানসিক নির্যাতন। যেমন: কটুকথা বলা, গালমন্দ করা, নির্যাতনের হুমকি দেওয়া বা ভয়ভীতি দেখানো, অবহেলা করা, হেয় করা বা অপমান করা, শিক্ষার সুযোগ না দেওয়া, তালাকের ভয় দেখানো, স্ত্রীকে তার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া, ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়া ইত্যাদি।

৩. যৌন নির্যাতন

যৌন উদ্দেশ্য নিয়ে করা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনই হল যৌন নির্যাতন। যেমন: ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে যৌন কাজ করা, জোর করে যৌন কাজ করা, অন্যের সঙ্গে যৌন কাজ বা পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করা, যৌন হয়রানি করা, ধর্ষণ, জন্ম নিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করতে না দেওয়া, খারাপ ছবি বা ভিডিও দেখতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

৪. অর্থনৈতিক নির্যাতন

এ ধরণের নির্যাতনের মধ্যে আছে নারীকে তার সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ না দেওয়া, নারীর আয় করা টাকা তার ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করতে না দেওয়া বা কেড়ে নেওয়া, নারীকে উপার্জন করতে না দেওয়া, তার গয়নাগাটি বা মূল্যবান সামগ্রী কেড়ে নেওয়া বা বিক্রি করে দেওয়া, নারীকে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না দেওয়া ইত্যাদি।

নারী নির্যাতনের কুফল বা ক্ষতি

- শারীরিক নির্যাতনের ফলে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক আঘাত, জখম ইত্যাদি হয়ে নির্যাতিত নারীর স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি বা পঙ্গুত্বের কারণ হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।
- গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব এবং প্রসবজনিত বিভিন্ন ধরণের জটিলতা হতে পারে।
- অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ, প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ, যৌনবাহিত রোগ ইত্যাদি হতে পারে।

- নির্যাতিত নারী মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তার মধ্যে বিষন্নতা, হতাশা, হীনমন্যতাসহ বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তৈরী হয়, যার ফলে সে আত্নহত্যাও করতে পারে।
- পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট হয়।
- নির্যাতিত নারীর চিকিৎসার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা দরিদ্র পরিবারের জন্য বাড়তি খরচের বোঝা তৈরি করে।
- পরিবারের ভিতরে নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময় তারা নানা রকম অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে।[১]

পারিবারিক নির্যাতন কী?

কোন নারী বা শিশু নিজ বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে আপনজন বা পরিবারের কোন সদস্য দ্বারা নির্যাতনের শিকার হলে তাকে পারিবারিক নির্যাতন বলা হয়। আমাদের দেশে নারীরা সবচেয়ে বেশি শিকার হয় পারিবারিক নির্যাতনের। অর্থাৎ পরিবারের বিভিন্ন সদস্য, যেমন-স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, এমনকি কখনও কখনও নিজের বাবা-মা বা ভাইয়ের দ্বারাও তারা নির্যাতিত হয়। নারী ও শিশুর প্রতি যে চার ধরণের নির্যাতন হয় (অর্থাৎ শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক নির্যাতন) তার সবগুলোই পারিবারিক নির্যাতনের মধ্যে দেখা যায়।

পারিবারিক নির্যাতনের কুফল বা ক্ষতি

- পারিবারিক নির্যাতনের ফলে নারীর বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ক্ষতি হয়। আঘাতের মাত্রা বেশি হলে অনেক সময় তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। গর্ভবতী অবস্থায় নির্যাতনের কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক নারী মারা যায়।

- পারিবারিক নির্যাতনের ফলে নারীর মানসিক ক্ষতি হয়। তাদের মধ্যে হতাশা, বিষন্নতা, হীনমন্যতা বোধ ও ভয় তৈরি হয়। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় তারা আত্নহত্যার পথ বেছে নেয়।

- পারিবারিক নির্যাতনের ফলে পরিবারে নারীর মর্যাদা খর্ব হয় এবং পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়।

- ছেলেমেয়েদের ভালভাবে বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়। অনেক সময় তারা অসামাজিক হয়ে ওঠে এবং অন্যদের প্রতি সহিংস আচরণ করে। পরিবারের ছেলেরা বড় হয়ে নিজেরাও পারিবারিক নির্যাতন করে।

আইনের চোখে পারিবারিক নির্যাতন

- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন অনুযায়ী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারী বা শিশু নিজে অথবা তার পক্ষে কোন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা (যেমন-মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা), সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা অন্য কোন ব্যক্তি উকিলের মাধ্যমে প্রতিকার চেয়ে আদালতে আবেদন করতে পারবেন।
- অভিযোগ গ্রহণের পর আদালত বা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নির্যাতনের শিকার নারী বা শিশুকে প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবা, আইন সহায়তা ও নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন।
- পারিবারিক নির্যাতনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারী বা শিশু আদালতে আবেদন করে সুরক্ষা আদেশ, বসবাস আদেশ, ক্ষতিপূরণ আদেশ ও নিরাপদ হেফাজত আদেশ পেতে পারেন।

পারিবারিক নির্যাতনের শাস্তি

- ✓ পারিবারিক নির্যাতনকারী সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গ করলে তার সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল অথবা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা কিংবা একই সঙ্গে দুই শাস্তিই হতে পারে।
- ✓ কোন ব্যক্তি পূনরায় একই অপরাধ করলে তার সর্বোচ্চ ২ বছরের জেল অথবা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা জরিমানা কিংবা একসঙ্গে দুই শাস্তিই হতে পারে।
- ✓ নির্যাতনের শিকার নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি, চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করে আদালত নির্যাতনকারীর কাছ থেকে ভূক্তভোগীর জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দিতে পারেন।[২]

যৌন হয়রানি কী?

মেয়েদের উত্ত্যক্ত (টিজিং) করা, তাদের দেখে শিস দেওয়া বা সিটি বাজানো, ওড়না টেনে ধরা, পথ আটকে দাঁড়ানো, বাজে অঙ্গভঙ্গি করা, গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা, ঢিল ছোড়া, নোংরা বা অশালীন কথা বলা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ঠাট্টা-তামাশা করা, যৌন কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখানো, কোন মেয়ে বা নারীর অনুমতি ছাড়া মোবাইল ফোনে তার ছবি ওঠানো বা ভিডিও ধারণ করা ইত্যাদি আচরণকে যৌন হয়রানি বলে।

আমরা প্রায়ই মনে করি যে, যৌন হয়রানি শুধু রাস্তাঘাটেই হয় এবং তা করে বখাটে, কম বয়সী ছেলেরা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে অনেক সময় ঘরের ভেতরেই পরিবারের বিভিন্ন বয়সী পুরুষ আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত জনও মেয়েদের বা নারীদের প্রতি এই ধরণের আচরণ অর্থাৎ যৌন হয়রানি করে থাকে।

যৌন হয়রানির কুফল বা ক্ষতি

- যৌন হয়রানির ফলে মেয়েরা মানসিকভাবে বড় ধরণের ক্ষতির শিকার হয়। এই ধরণের ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গে চোখে দেখা না গেলেও এর ফলে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক মানসিক চাপ, বিষন্নতা, হতাশা, হীনমন্যতাসহ বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তৈরি হয় যা তাদের ভালভাবে বেড়ে ওঠাকে বাধাগ্রস্ত করে। এতে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি তারা পড়ালেখাসহ অন্যান্য কাজও করতে পারে না।যৌন হয়রানির ফলে অনেক সময় তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।
- উত্ত্যক্তকারীদের অত্যাচারে, ভয়ে মেয়েরা স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়।
- মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেক মা-বাবা তাদের মেয়ের ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে মেয়েদের ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হয় যা তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।
- কোন কোন মা-বাবা তাদের মেয়ের নিরাপত্তার আশায় মেয়েকে বাল্যবিয়ে দিয়ে দেয়, যা মেয়েটির জন্য আরও ক্ষতিকর হয়।

আইনের চোখে যৌন হয়রানি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী কোন নারী বা শিশুকে যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যৌন হয়রানির শাস্তি

- o কোন মেয়েকে বা নারীকে যৌন হয়রানি করলে অপরাধীর কমপক্ষে ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত জেল হবে এবং সঙ্গে জরিমানাও হবে।
- o বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা অনুযায়ী, যৌন হয়রানি করলে অপরাধীর ১ বছরের জেল বা জরিমানা অথবা একই সঙ্গে জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে।
- o যৌন হয়রানির কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করলে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অপরাধীর কমপক্ষে ৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত জেল এবং সঙ্গে জরিমানাও হবে।
- o মোবাইল কোর্ট যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে।[৩]

বিভিন্ন সময়কালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ধরণ[৪]

ভ্রুণকাল	শৈশবকাল	বাল্যকাল	প্রজননকাল	বৃদ্ধকাল
* লিঙ্গ নির্ধারিত ভ্রুণ হত্যা; *গর্ভবতী নারীকে নির্যাতন।	* কন্যাশিশুকে খেতে পরতে ও চিকিৎসা না দেয়া; * অবহেলা করা; * যৌনাঙ্গ কর্তন; * যৌন নিপীড়ন; * Incest.	* আত্মীয় কর্তৃক যৌন নির্যাতন; * যৌন নির্যাতন; * খেতে পরতে ও চিকিৎসার সুযোগ কম; * শিশুশ্রম; *কন্যাশিশু পাচারধ *বাল্যবিবাহ।	* আত্মীয় কর্তৃক যৌন নির্যাতন; * যৌন নিযার্তন; * ভালোবাসা সম্পর্ক কালে বা বিবাহপূর্ব সহিংসতা; * অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ; * বাধ্যতামূলক যৌন সম্পর্ক স্থাপন; * জোরপূর্বক বিয়ে; * ধর্ষণ; * দাম্পত্য সম্পর্কে ধর্ষণ; * কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি; * যৌন সম্পর্কে ধর্ষণ; * যৌন সম্পর্ক স্থাপনে নারীর ইচ্ছা মত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে বাধা; * নারী পাচার, পতিতা বৃত্তি; * মনঃস্তাত্ত্বিক চাপ; * শারীরিক নির্যাতন; * নিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধা; * যৌতুক; * পরিবারের সম্মানার্থে হত্যা; * জোরপূর্বক ভ্রুণ হত্যা; * প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণ; * বিধবা নারীকে প্রতারণা, হয়রানি ও সম্পদচ্যুত করা; * পুলিশি হেনস্তা ও হয়রানি;	* বাস্তুচ্যুতি; *জোরপূর্বক আত্মহত্যায় বাধ্য করা; * সম্পদ কেড়ে নেওয়া; *অবহেলা; *মানসিক নির্যাতন; *শারীরিক নির্যাতন; * ধর্ষণ; *যৌন নিপীড়ন।

নারী নির্যাতনের ঘটনা আমাদের দেশে অহরহই হয়ে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। ঘরের বাইরে কোথাও নিরাপদ নয় নারী। এসব নির্যাতনের প্রতিকার খুব কমই হয়। আইনি ব্যবস্থা থাকলেও তার বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত। সম্প্রতি ব্র্যাক পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারী নির্যাতন ৭৪% শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার ৬৮% শতাংশই নথিভূক্ত হয় না। ব্র্যাক ছাড়াও কয়েকটি সংস্থা নিজস্ব পরিসংখ্যান এবং থানায় মামলার হিসাব অনুযায়ী নারী নির্যাতন বৃদ্ধির কথা বললেও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, গণমাধ্যমের প্রচার এসব বিভিন্ন কারণে আগে মানুষ যে বিষয়গুলোকে নির্যাতন বলেই মনে করতো না, এখন তা যে নির্যাতন সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও লোকলজ্জার কারণে আগে যেখানে নির্যাতনের কথা স্বীকার করতো না, সেখানে বর্তমানে মানুষ মুখ খুলতে শুরু করেছে। ফলে নারী নির্যাতনের সংখ্যাটি বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে। ব্র্যাক দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থাটি তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অধীনে দেশের ৫৫ টি জেলা থেকে বিভিন্ন নির্যাতনের ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সালে যেখানে ২৮৭৩ টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেখানে ২০১৫ সালে তা উন্নীত হয়েছে ৫০০৮ টিতে।[৫]

অন্যান্য নির্যাতন

এসিড নিক্ষেপ কী?

এসিড একটি ক্ষয়কারী তরল রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরে লাগালে শরীর পুড়ে যায় এবং জ্বলতে শুরু করে। এটি শরীরের চামড়া ও মাংস ভেদ করে, এমনকি হাড় পর্যন্ত ক্ষতি করে। এসিড নিক্ষেপ করা

বলতে বোঝায়-হত্যা করা, শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করে দেওয়া বা শারীরিক বিকৃতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে কারও শরীরে এসিড ছুড়ে দেওয়া বা ঢেলে দেওয়া।

এসিড নিক্ষেপের কুফল বা ক্ষতি

- ❖ শরীরের কোন অংশে এসিড লাগলে তা খুব দ্রুত চামড়া ও মাংস পুড়ে ঝলসে ফেলে। এর ফলে ভুক্তভোগীর তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা হয় এবং দীর্ঘদিন এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।
- ❖ শরীরের যেখানে এসিড লাগে সে জায়গাটি বিকৃত হয়ে যায়, এমনকি অকেজো হয়ে যায়। এতে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং পাশাপাশি স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও নষ্ট হয়।
- ❖ শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি প্রচণ্ড মানসিক ক্ষতিও হয়। বেশির ভাগ সময়ই নির্যাতন কারীরা মুখে এসিড ছুড়ে মারে যাতে মুখ বিকৃত হয়ে যায়। ফলে ভুক্তভোগী আত্মবিশ্বাস ও মনোবল হারিয়ে ফেলে, হীনমন্যতায় ভোগে, নিজেকে ছোট মনে করে, সমাজে মিশতে পারে না, অনেক সময় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।
- ❖ শারীরিক বিকৃতির ফলে ভুক্তভোগীকে অনেক সময় সামাজিকভাবে হেয় হতে হয়।
- ❖ এসিড সহিংসতার কারণে ভুক্তভোগী অর্থনৈতিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার ফলে তার আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। কেউ সহজে কাজে কর্মে নিতে চায় না।

আইনের চোখে এসিড নিক্ষেপ

- এসিড অপরাধ দমন আইন অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- এসিড নিক্ষেপের মামলায় জামিন হয় না।
- লাইসেন্স ছাড়া এসিড কেনা-বেচা করা বা ব্যবহার করা, এমনকি নিজের কাছে রাখাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এসিড নিক্ষেপের শাস্তি

- ➢ এসিড নিক্ষেপের ফলে কোন ব্যক্তি মারা গেলে এসিড নিক্ষেপকারীর বা নিক্ষেপ কারীদের মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) অথবা যাবজ্জীবন জেল ও এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।
- ➢ এসিড দ্বারা মারাত্মক আহত করলে অপরাধীর বা অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম জেল ও এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।
- ➢ এসিড নিক্ষেপের ফলে শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে অপরাধীর বা অপরাধীদের কমপক্ষে ৭ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত জেল হবে এবং সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।
- ➢ এসিড নিক্ষেপের চেষ্টা করার শাস্তি কমপক্ষে ৩ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত জেল এবং সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।[৬]

নারী ও শিশু পাচার কী?

নারী ও শিশু পাচার বলতে বোঝায় কোন নারী বা শিশুকে কাজ দেওয়া বা অন্য কোন কিছুর লোভ দেখিয়ে, মিথ্যা বলে, জোর করে বা অজ্ঞান করে অপহরণ করে নিজ এলাকার বাইরে অথবা দেশের বাইরে কোথাও নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া বা কোন অবৈধ কাজে লাগানোর জন্য নিয়ে যাওয়া।

নারী ও শিশু পাচারের কুফল বা ক্ষতি

- ✓ পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। পাচারকারীরা নারী ও কিশোরী মেয়েদেরকে টাকার বিনিময়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়, যেখানে তাদেরকে জোর করে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।
- ✓ অনেক হোটেল বা পর্যটন কেন্দ্রে পাচার হওয়া নারী ও কিশোরী মেয়েদেরকে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

- ✓ পাচার হওয়া নারী ও শিশুদেরকে খুব কম মজুরিতে এমনকি প্রায় সময় কোন মজুরি না দিয়ে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয়। অনেক সময় তাদেরকে কেনা দাসের মতো খাটানো হয়।
- ✓ পাচার হওয়া শিশুদেরকে বিভিন্ন কলকারখানায় বা অন্যান্য স্থানে নানা ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগানো হয়, যার ফলে অনেক সময় তারা মারাত্মকভাবে আহত হয় এমনকি মারাও যায়।
- ✓ অনেক সময় পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন-কিডনি, কলিজা কেটে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়।
- ✓ পাচার করার সময় পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষীদের চোখ এড়ানোর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর রাস্তায় নারী ও শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় তাদের অনেকে পথেই মারা যায়।
- ✓ বেশির ভাগ সময়ই পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের সঙ্গে পরিবারের কোন যোগাযোগ থাকে না বলে তাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে তা পরিবারের কেউ আর কখনও জানতে ও পারে না।

আইনের চোখে নারী ও শিশুপাচার

- ❖ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন অনুযায়ী কোন মানব অর্থাৎ নারী, পুরুষ বা শিশুকে পাচার করা বা পাচার করার চেষ্টা করা, অপহরণ করা বা আটকে রাখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নারী ও শিশু পাচারের শাস্তি

- ✓ কোন ব্যক্তি নারী বা শিশু পাচার করলে তার কমপক্ষে ৫ বছর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন জেল এবং কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হবে।
- ✓ কোন সংঘবদ্ধ দল মানব পাচার করলে ঐ দলের প্রত্যেক সদস্যের মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) বা যাবজ্জীবন জেল হবে অথবা কমপক্ষে ৭ বছর জেল কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে।
- ✓ কোন ব্যক্তি মানব পাচারের চেষ্টা করলে তার কমপক্ষে ৩ বছর থেকে শুরু করে ৭ বছর জেল হবে এবং সঙ্গে জরিমানা হবে।
- ✓ মানব পাচারের উদ্দেশ্যে বা যৌন নির্যাতনের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করলে বা আটকে রাখলে কমপক্ষে ৫ বছর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০ বছর জেল এবং সঙ্গে জরিমানা হবে।[৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নারীদের পক্ষে আইন

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স হতে হবে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলের বয়স হতে হবে কমপক্ষে ২১ বছর।
- যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সী কোন মেয়েকে বা ছেলেকে বিয়ে করে, তাহলে তার ১ মাসের জেল বা ১,০০০ (এক হাজার) টাকা জরিমানা অথবা একসঙ্গে উভয় শাস্তিই হতে পারে। তবে দোষী ব্যক্তি নারী হলে তার জেল না হয়ে শুধু জরিমানা হবে।
- বাল্য বিয়ের আয়োজনকারী বাবা-মা বা অভিভাবক, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং সেই সঙ্গে কাজী, ইমাম, বা অন্য যারা এর সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের সবারই একই শাস্তি হতে পারে (অর্থাৎ এক মাসের জেল বা ১,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি)। তবে দোষী ব্যক্তি নারী হলে তার জেল হবে না।

যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০

যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ করার জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী -

- ✓ বিয়ের সময় অথবা বিয়ের আগে বা পরে যে কোন সময় যৌতুক দেওয়া ও যৌতুক নেওয়া দুটোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- ✓ কেউ যদি যৌতুক দেয় বা যৌতুক নেয় অথবা যৌতুক দেওয়া নেওয়ায় সহায়তা করে, তাহলে তার কমপক্ষে ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর জেল হবে বা জরিমানা হবে অথবা জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে।
- ✓ যৌতুক লেনদেনের অপরাধ ঘটার দিন থেকে ১ বছরের মধ্যে মামলা করতে হবে।
- ✓ কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন যৌতুক দাবি করে, তাহলে তার কমপক্ষে ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা হবে অথবা জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

মুসলিম পরিবারের বিয়ে, মোহরানা, তালাক, স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

বিয়ের মতামত

- বিয়ের জন্য ছেলে ও মেয়ে দুইজনেরই মত বা সম্মতি থাকা বাধ্যতামূলক। কোন ছেলে বা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে করা বা জোর করে বিয়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বহুবিবাহ

- স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রী ও সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া আরেকটি বিয়ে করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন পুরুষ বেআইনিভাবে বহুবিবাহ করলে তার ১ বছরের জেল অথবা ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা একসঙ্গে দুই শাস্তিই হতে পারে।[৮]

ভরণপোষণ ও দেনমোহরের অধিকার

- বিয়ের সম্পর্কের কারণে থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও অন্যান্য জীবনধারণের উপকরণ স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পাবার অধিকারী। বিয়ের সম্পর্ক থাকা কালীন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ভরণপোষণ দেবার ক্ষমতা নির্ভর করে। তবে স্ত্রী যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করেন, তবে স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নন। তবে স্বামী নিযার্তনমূলক

আচরণ করলে, স্বামী আরেকটি বিয়ে করলে বা স্বামী তাৎক্ষণিক দেনমোহরের দাবি অস্বীকার করলে স্ত্রী আলাদা বসবাস করেও ভরণপোষণ পাবার অধিকারী হবেন।

- মুসলিম বিয়ে-বিচ্ছেদের পরে যেদিন থেকে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে সেদিন থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত স্ত্রী ভরণপোষণ পাবার অধিকারী হবেন। একজন পুরুষ যেমন তার স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, তেমনি তার সন্তানদেরও ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। ভরণপোষণ আদায়ের জন্য স্ত্রী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।
  - স্ত্রী আদালতে মামলা করতে পারবেন;
  - আদালত স্বামীকে ভরণপোষণ দিতে নির্দেশ দিতে পারে। স্বামী এই নির্দেশ না মানলে স্ত্রীর পুনঃঅভিযোগের ভিত্তিতে আদালত একমাস পর্যন্ত স্বামীকে কারাদণ্ড দিতে পারে;
  - এই মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও পারিবারিক আদালত উভয় আদালতেই করা যায়;
  - ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে স্ত্রী স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে এ বিষয়ে আবেদন করবেন। চেয়ারম্যান সালিশ পরিষদ গঠন করে ভরণপোষণ এর পরিমাণ ঠিক করবেন এবং একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।

দেনমোহরের অধিকার

মুসলিম বিয়েতে দেনমোহর হলো স্বামীর কাছে স্ত্রীর এক প্রকার অধিকার। দেনমোহর বিয়ের অন্যতম শর্ত। বিয়ের সময়েই দেনমোহর ধার্য করা হয়। দেনমোহর অবশ্যই পরিশোধযোগ্য।

দেনমোহর দুরকম হয় যথা;

- তাৎক্ষণিক দেনমোহর ;
- বিলম্বিত দেনমোহর

দেনমোহর প্রদানের শর্তাবলি

- তাৎক্ষনিক দেনমোহর চাওয়ামাত্র পরিশোধ করতে হয়।
- বিলম্বিত দেনমোহর বিয়ের পরে যে কোন সময় পরিশোধ করলে চলে। তবে মৃত্যু বা বিয়ে বিচ্ছেদের পরে অবশ্যই শোধ করতে হবে।
- তালাকের সঙ্গে দেনমোহরের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে মনে করে তালাকের কারণে দেনমোহর দিতে হবে। এটি ভুল ধারণা। দেনমোহর বিয়ের শর্ত।

দেনমোহর আদায়

- দেনমোহর আদায়ের ক্ষেত্রে স্বামী দেনমোহর দিতে অস্বীকার করার তিন বছরের মধ্যে আদালতে মামলা করতে হবে।
- চাওয়া সত্ত্বেও স্বামী দেনমোহর দিতে অস্বীকার করলে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে বা দাম্পত্য মিলনে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, দূরে বসবাস করতে পারে।
- স্বামীর মৃত্যু হলে অন্যান্য ঋণের মতোই এই ঋণ উত্তরাধিকারীদের শোধ করতে হবে।
- স্ত্রী স্বামীর আগে মারা গেলে স্ত্রীর উত্তরাধিকারীরা দেনমোহরের জন্য আদালতে মামলা করতে পারে।[৯]
-

দেনমোহর ও ভরণপোষণ

- একজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোন পুরুষ যদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে গঠিত সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া আবার বিয়ে করে, তাহলে অবিলম্বে তার বর্তমান স্ত্রীর

দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। দেনমোহরের টাকা পরিশোধ না করলে তা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায়যোগ্য হবে এবং ঐ পুরুষের ১ বছরের জেল বা জরিমানা উভয় শাস্তিই হতে পারে।

- দেনমোহর স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার যা পরিশোধ করতে স্বামী বাধ্য। নিকাহনামা বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহরের সব টাকা স্ত্রী চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে পরিশোধ করতে হবে।
- স্বামী দেনমোহর পরিশোধ না করলে স্ত্রী তা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে।
- কোন স্বামী তার স্ত্রীর পর্যাপ্ত ভরণপোষণ বা বৈধ ভাবে বিয়ে করা একাধিক স্ত্রীর সমান ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে তার স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন অথবা চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত করতে পারেন। চেয়ারম্যানের মাধ্যমে গঠিত সালিশি পরিষদ স্বামী কতটুকু ভরণপোষণ দেবে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে একটি সার্টিফিকেট জারি করতে পারবেন।[১০]

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কী?

বিবাহ নারী-পুরুষের মিলিত জীবনের জন্য একটি আইনগত, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা। আর এই বিবাহ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সরকারি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন। বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের দলিলই হচ্ছে বিবাহের একমাত্র আইন সম্মত ও বৈধ প্রমাণপত্র।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সুফল

- কেউ বিবাহের সত্যতা অস্বীকার করতে পারে না;
- স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী পুনরায় বিবাহ করলে অথবা এরকম বিবাহ বন্ধ করার জন্য স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন;
- স্ত্রীর নিকাহনামায় উল্লিখিত দেনমোহর আদায় করতে পারেন। যে ক্ষেত্রে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা নাই সে ক্ষেত্রে স্ত্রী ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ দেনমোহর আদায় করতে পারেন;
- স্বামীর বা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে দুইজনের মধ্যে যিনি বেঁচে থাকবেন তিনি মৃতের সম্পত্তি থেকে নিজেদের বৈধ অংশ আদায় করতে পাবেন;
- স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী ভরণপোষণ আদায় করতে পারেন;
- স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করার কুফল

- বিবাহ রেজিস্ট্রি না হলে বিয়ের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না।
- বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হলে যে কোনো সময় বিবাহের সত্যতা অস্বীকার করা সহজ হয়ে যায়।
- বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হলে বহু বিবাহের সুযোগ থেকে যায় এবং এরকম বিয়ে বন্ধ করার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।
- বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হলে স্ত্রী অনেক আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন-বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হলে স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করতে কঠিন হয়।
- কোনো কারণে স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী ভরণ-পোষণ আদায় করতে ব্যর্থ হন।
- স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যেকোনো একজন মারা গেলে অপরজন মৃতের সম্পত্তি থেকে তার যা বৈধ বা প্রাপ্য আদায় করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

কী ভাবে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে?

- মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি হলেন কাজি। তিনি সর্বোচ্চ তিনটি পূর্বতন ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের সকল বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত;
- যদি বিয়ের দিন রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে বিয়ের ৩০ দিনের মধ্যে কাজি অফিসে গিয়ে অথবা কাজি ডেকে এনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
- বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় কাজি বা বিবাহ রেজিস্ট্রার বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন বিয়েতে ছেলে মেয়ে রাজি আছে কি না, স্বাক্ষী উপস্থিত ছিল কি না এবং বর-কনের বয়স আইনসম্মত কি না। এক্ষেত্রে তিনি বর-কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদ বা জেএসসি সার্টিফিকেট বা এসএসসি সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সনদ পরীক্ষা করে বিয়ের আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। আর কাগজ পত্র না থাকলে মাতাপিতা বা আইনগত অভিভাবক প্রদত্ত বয়স সংক্রান্ত হলফনামা দ্বারা বর-কনের বয়স নির্ধারণ পূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করতে পারবেন।
- যদি নিকাহ রেজিস্ট্রার নিজেই বিবাহ সম্পাদন করেন তাহলে অবশ্যই তিনি বিবাহ রেজিস্ট্রার পূরণ করবেন, তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন এবং নিজে স্বাক্ষর করে সিলমোহর দেবেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি যে উপস্থিত ছিলেন তা অবশ্যই রেজিস্ট্রারে উল্লেখ করবেন।
- বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কোনো আইন নেই। তবে কেউ যদি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাহলে নোটারাইজেশনের মাধ্যমে করতে পারেন।
- খ্রিষ্টানদের প্রতিটি বিয়ে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। প্রটেস্টান্টরা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে ও ক্যাথলিকগণ চার্চের ধর্মযাজকের কাছে তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের খরচ

- মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফি (অর্থ) বিয়ের দেনমোহরের উপর নির্ভরশীল;
- একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেনমোহরের ক্ষেত্রে প্রতি ১ হাজার টাকা দেনমোহর বা তার অংশ বিশেষের জন্য ১২.৫০ টাকা হারে নিবন্ধন ফি আদায় করতে পারবেন। দেনমোহরের টাকা ৪ লাখ টাকার বেশি হলে তৎপরবর্তী প্রতি ১ লক্ষ টাকা দেনমোহর বা তার অংশ বিশেষের জন্য ১০০ টাকা নিবন্ধন ফি আদায় করতে পারবেন। তবে দেনমোহর যাই হোক না কেন সর্বনিম্ন ফি ২০০ টাকার কম হবে না। নিকাহ রেজিস্ট্রার নকল প্রাপ্তি ফি ৫০ টাকা, যাতায়াত বাবদ প্রতি কিলোমিটার ফি ১০ টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।
- ছেলেপক্ষ রেজিস্ট্রেশনের সকল ফি বহন করবেন।
- রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়া হলে কাজি একটি রশিদ দেবেন।

বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পল্লী সমাজের করণীয়

- বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির থাকা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজির তথ্য বর ও কনে পক্ষকে দেওয়া;
- বিয়ের দিন সঠিক কাজি এসেছে কিনা তা দেখা;
- লুজ শিটে যাতে রেজিস্ট্রেশন না হয় তা নিশ্চিত করা;
- নকলের কপি সঙ্গে সঙ্গে নিতে উৎসাহিত করা;
- রশিদ নিতে উভয় পক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা;

- বরপক্ষ যাতে ফি দেয় সেজন্য উৎসাহিত করা;
- কাবিননামার কপি সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করা। [১১]

তালাক

তালাক কী?

'তালাক' একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ কোনো কিছু ভেঙে ফেলা বা ছিন্ন করা। স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ককে আইনসিদ্ধ উপায়ে ছিন্ন করাকে তালাক বলে। বাংলায় একে বিবাহ বিচ্ছেদ বলে। মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি বৈধ ও স্বীকৃত অধিকার। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, একত্রে বসবাস করা উভয়ের পক্ষেই বা যেকোনো এক পক্ষের সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক, ধারা ৭: তালাক

১। কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তাকে যেকোনো পদ্ধতিতে তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করতে হবে।

২। যে ব্যক্তি (১) উপধারায় ব্যবস্থাবলি লঙ্ঘন করবে, তাকে একবছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

৩। নিম্নের (৫) উপধারায় ব্যবস্থাবলির মাধ্যম ব্যতীত প্রকাশ্য অথবা অন্যভাবে প্রদত্ত কোনো তালাক, আগে বাতিল না হলে, (১) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৯০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হবে না।

৪। উল্লিখিত (১) উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের আপোস বা সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সালিশ পরিষদ গঠন করবেন এবং উক্ত সালিশ পরিষদ এই জাতীয় সমঝোতার (পুনর্মিলনের) জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করবেন।

৫। তালাক ঘোষণাকালে স্ত্রী গর্ভবতী বা অন্তঃসত্ত্বা থাকলে উপরের (২) উপধারায় উল্লিখিত সময় অথবা গর্ভাবস্থা এই দুটির মধ্যে কোনটি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না।

৬। এই ধারা অনুযায়ী কার্যকর তালাক দ্বারা যার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে সেই স্ত্রী, এই জাতীয় তালাক তিনবার কার্যকর না হলে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিয়ে না করে পুনরায় একই স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক

স্বামী কাবিননামায় ১৮ নম্বর ঘরে সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে তালাক প্রদানের যে ক্ষমতা দান করবে তাকে তালাক-ই-তৌফিজ বলে। কাবিননামায় ১৮ নম্বর ঘরে লেখা থাকে 'স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে কি না? করে থাকলে কী শর্তে? যদি এই ঘরের উত্তর হ্যা লেখা থাকে তবে স্ত্রী তালাক-ই তৌফিজের ক্ষমতা পায়।

তালাকের কুফল

- তালাকের ফলে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়;
- নারী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- নারী আইনগত সুবিধা যথাযথ ভাবে পায় না;
- নারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- সমাজের কাছে নারী হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়;
- নারীকে অনেক রকম অপমান ও ঘৃণা সহ্য করতে হয়;

- সন্তান মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে;
- অনেক সময় সন্তান হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ালেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং বিপথে যায়।[১২]

তালাক

- ✓ তালাক দিতে হলে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে তালাকের নোটিশ পাঠাতে হবে। নোটিশের ১ টি কপি স্ত্রীকে দিতে হবে। তালাকের নোটিশ পাওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের সালিশি পরিষদ ৯০ দিনের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করবে। মীমাংসা না হলে ৯০ দিন পর সেই তালাক কার্যকর হবে।
- ✓ বিনা নোটিশে তালাক দিলে স্বামীর ১ বছরের জেল বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা এক সঙ্গে জেল ও জরিমানা দুটিই হতে পারে।
- ✓ গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রী গর্ভবতী থাকা অবস্থায় সেই তালাক কার্যকর হয় না। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর তালাক কার্যকর হয়।

পুনরায় বিয়ে

- ✓ আইনে হিল্লা বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ✓ তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে হিল্লা বিয়ের দরকার হবে না।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪

বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রি নিশ্চিত করার জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের বিয়ে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক।
- স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তা অবশ্যই রেজিস্ট্রি করতে হবে।
- বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রি অবশ্যই নিকাহ নিবন্ধক বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হতে হবে।
- বিয়ে রেজিস্ট্রি না করলে ২ বছর পর্যন্ত জেল এবং সঙ্গে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।[১৩]

সম্পত্তিতে নারীর আইনি অধিকার

মুসলিম আইন

- পিতার সম্পত্তিতে পুত্র যতটুক সম্পত্তি পাবে, কন্যা তার অর্ধেক পাবেন;
- একমাত্র সন্তান মেয়ে হলে (পুত্র না থাকলে) সেই মেয়ে সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন;
- মৃত স্বামীর কোনো সন্তান না থাকলে বিধবা সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ এবং সন্তান থাকলে তবে আট ভাগের একভাগ পাবেন;
- মৃতের মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন।

হিন্দু আইন

- হিন্দু নারীরও সম্পত্তিতে অধিকার আছে। কিন্তু তারা (স্ত্রী, মাতা, কন্যা) জীবন সত্ত্বে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। জীবন সত্ত্বে মানে হচ্ছে যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন ঐ সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারবেন। তারা এ সম্পত্তি কেনা-বেচা, দান, উইল করতে পারবেন না। তবে মৃত ব্যক্তির যদি নাবালক সন্তান এবং ঋণ থাকে, কিন্তু উক্ত নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ এবং স্বামীর ফেলে যাওয়া ঋণ পরিশোধের আর কোনো উপায় না থাকে সে ক্ষেত্রে তিনি দলিলে কারণ উল্লেখপূর্বক সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন।

খ্রিস্টান আইন

- পিতার সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ের অধিকার সমান।
- স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হন। সন্তান থাকলে স্ত্রী সম্পত্তিতে তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।[১৪]

হিন্দু পারিবারিক আইন

হিন্দু পরিবারের বিয়ে, ভরণপোষণ, পৃথক বসবাস ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- ❖ হিন্দু বিয়ের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ (একুশ) বছর এবং মেয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ (আঠার) বছর হতে হবে।
- ❖ বিয়ের জন্য ছেলে ও মেয়ে দুই জনেরই মত থাকা বাধ্যতামূলক। কোন ছেলে বা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে করা বা জোর করে বিয়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- ❖ হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক হয় না। তবে প্রয়োজনে আদালতের নির্দেশনা সাপেক্ষে স্বামী ও স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করতে পারে।
- ❖ পৃথকভাবে বাস করা অবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২

- ➢ বিয়ের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু বিয়ে রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করা যাবে।
- ➢ ২১ (একুশ) বছরের কম বয়সী কোন হিন্দু ছেলে বা ১৮ (আঠার) বছরের কম বয়সী কোন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলে তা রেজিস্ট্রি যোগ্য হবে না।
- ➢ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এবং সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত প্রতিটি উপজেলায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিকে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)

নারী ও শিশুর প্রতি বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনমূলক অপরাধ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

আত্মহত্যায় প্ররোচনা

- ✓ কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি তার সম্ভ্রমহানি করার ফলে সেই নারী আত্মহত্যা করলে নির্যাতনকারী আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার দোষে দোষী হবে এবং তার কমপক্ষে ৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল হবে। সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

যৌন পীড়ন

- ✓ কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে যৌন উদ্দেশ্য নিয়ে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা যদি কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে বা নারীর শ্লীলতাহানি করে তাহলে তার এই আচরণ যৌন পীড়ন হিসেবে গণ্য হবে। এর শাস্তি হিসাবে তার কমপক্ষে ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল হবে। সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

মুক্তিপণ আদায়

- ✓ কোন ব্যক্তি যদি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটকে রাখে তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) বা যাবজ্জীবন জেলসহ জরিমানা হবে।

ধর্ষণ

- ✓ যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে তাহলে তার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন জেল এবং সেই সঙ্গে জরিমানা। একাধিক ব্যক্তি ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকলে তাদের সবার একই শাস্তি হবে।

- ✓ ধর্ষণের ফলে কোন নারী বা শিশু যদি মারা যায় তাহলে ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) হবে অথবা যাবজ্জীবন জেল হবে এবং সঙ্গে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হবে।
- ✓ ধর্ষণের পর ভূক্তভোগীকে হত্যা করার চেষ্টা করলে ধর্ষণকারীর যাবজ্জীবন জেল হবে সঙ্গে জরিমানাও হবে।
- ✓ কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তির কমপক্ষে ৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত জেল হবে এবং সঙ্গে জরিমানা ও হবে।

যৌতুক

- ✓ যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ফলে কোন নারীর মৃত্যু হলে নির্যাতনকারীর বা নির্যাতনকারীদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি)।
- ✓ যৌতুকের জন্য নির্যাতন করে কোন নারীকে মারাত্মক জখম বা আহত করলে নির্যানতকারীর বা নির্যাতনকারীদের যাবজ্জীবন জেল অথবা কমপক্ষে ৫ বছর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত জেল হবে এবং সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।
- ✓ যৌতুকের জন্য নির্যাতন করে কোন নারীকে সাধারণ জখম বা আহত করলে নির্যাতনকারীর বা নির্যাতনকারীদের কমপক্ষে ১ বছর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩ বছর জেল হবে এবং সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ কঠোর ভাবে দমনের উদ্দেশ্যে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- কোন ব্যক্তি এসিড ব্যবহার করে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) বা যাবজ্জীবন জেল হবে এবং সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
- যদি কোন ব্যক্তি এসিড ব্যবহার করে অন্য কোন ব্যক্তিকে আহত করার ফলে আহত ব্যক্তির-
  (ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হলে বা মূখ, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হলে নির্যাতনকারীর মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) অথবা যাবজ্জীবন জেল হবে এবং সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
  (খ) শরীরের অন্য কোন অঙ্গ, গ্রন্থি, বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হলে বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পেলে নির্যাতনকারীর কমপক্ষে ৭ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১৪ বছর জেল হবে এবং সেই সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে।
- কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির উপর এসিড নিক্ষেপ করে বা করার চেষ্টা করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোন ক্ষতি না হলেও নির্যাতনকারীর কমপক্ষে ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল হবে এবং সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে।

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২

এসিড উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ছাড়া এসিড উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় বা ব্যবহার করলে ঐ ব্যক্তির কমপক্ষে ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত জরিমানা হবে এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। কেউ লাইসেন্স ছাড়া নিজের কাছে এসিড রাখলেও একই শাস্তি হবে।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও জোরদার করার লক্ষ্যে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- কোন ব্যক্তি কোন নারী বা মেয়েকে উত্ত্যক্ত করলে বা যৌন হয়রানি করলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের (মোবাইল কোর্ট) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলেই ঐ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করতে পারেন।
- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের জেল দিতে পারেন এবং জরিমানাও করতে পারেন।
- অভিযুক্ত ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা পরিশোধ করতে না পারলে তার সর্বোচ্চ ৩ মাসের জেল হতে পারে।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০

পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারী বা শিশু নিজে অথবা তার পক্ষে কোন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা (যেমন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা), সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা অন্য কোন ব্যক্তি উকিলের মাধ্যমে প্রতিকার চেয়ে আদালতে আবেদন করতে পারবেন।
- অভিযোগ গ্রহণের পর আদালত বা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নির্যাতনের শিকার নারী বা শিশুকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, আইন সহায়তা ও নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন।
- পারিবারিক নির্যাতনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারী বা শিশু আদালতে আবেদন করে সুরক্ষা আদেশ, বসবাস আদেশ, ক্ষতিপূরণ আদেশ ও নিরাপদ হেফাজত আদেশ পেতে পারেন।
- পারিবারিক নির্যাতনকারী সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গ করলে তার সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল অথবা ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা কিংবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।
- কোন ব্যক্তি পূণরায় একই অপরাধ করলে তার সর্বোচ্চ ২ বছরের জেল অথবা সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা কিংবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানবপাচার অপরাধের শিকার ভূক্তভোগীদের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী-

- কোন ব্যক্তি মানবপাচার (অর্থাৎ যে কোন নারী, পুরুষ বা শিশু পাচার) করলে তার কমপক্ষে ৫ বছরের জেল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন জেল এবং কমপক্ষে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা হবে।
- কোন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী বা দল মানবপাচার করলে ঐ গোষ্ঠী বা দলের প্রত্যেক সদস্যের কমপক্ষে ৭ বছর জেল ও সাথে কমপক্ষে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা অথবা যাবজ্জীবন জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড (অর্থাৎ ফাঁসি) পর্যন্ত হতে পারে।
- কোন ব্যক্তি মানবপাচারের চেষ্টা করলে তার কমপক্ষে ৩ বছরের জেল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল এবং কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা হবে।
- কোন ব্যক্তি মানবপাচারের উদ্দেশ্যে বা যৌন নির্যাতনের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে (যেমন, অশ্লীল ছবি তৈরি, জোর করে কাজ করানো, ঋণদাসত্ব, প্রতারণামূলক বিয়ে, ভিক্ষা করানো, ইত্যাদি) অন্য কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করলে বা আটকে রাখলে তার কমপক্ষে ৫ বছর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল এবং কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা হবে।

সালিশ অযোগ্য অপরাধসমূহ

নিচের অপরাধগুলো সালিশযোগ্য নয় অর্থাৎ এই ধরণের অপরাধ ঘটলে তা সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা বা মিটমাট করা যাবে না।

- ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা;
- এসিড নিক্ষেপ বা এসিড নিক্ষেপের চেষ্টা;
- পারিবারিক নির্যাতন;
- যৌন হয়রানি;
- নারী ও শিশুপাচার বা পাচারের চেষ্টা;
- হত্যা বা হত্যার চেষ্টা;
- যৌতুকের জন্য নির্যাতন;
- গুরুতর শারীরিক নির্যাতন;
- জোর করে উচ্ছেদ করা বা জায়গা জমি দখল করা।[১৫]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন

কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন ইত্যাদি প্রচলনের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অভাবনীয় গতি। বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার দ্রুত বাড়তে থাকায় তার সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, এর অপব্যবহার রোধ এবং মাধ্যমসমূহে ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীদের শাস্তিবিধানের জন্য এ-সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি ছিল। শেষ পর্যন্ত দেরিতে হলেও ২০০৬ সালে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬' প্রণয়ন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬' -এ আলাদাভাবে বা সরাসরি বা বিস্তারিত কোনো বিধান নেই। কিন্তু আইনটির ৫৭ ধারায় অন্য কিছু অপরাধের শাস্তিবিধানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত কিছু অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। ৫৭ ধারার ভাষ্য হলো, কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা যেটা কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরণের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তাহলে তার এই কাজ হবে একটি অপরাধ। কোনো ব্যক্তি এই অপরাধ করলে সে সর্বোচ্চ ১৪ বছর এবং সর্বনিম্ন সাত বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

আলোচিত ধারাটিতে 'যা মিথ্যা ও অশ্লীল' এবং 'যার দ্বারা মানহানি ঘটে' বিষয় দুটি থাকায় এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে নারী নিগ্রহ করা হয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে তা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং এর যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই ধারার অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে হলে 'মিথ্যা ও অশ্লীল' বা 'মানহানিকর' বিষয়গুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে প্রকাশ বা সম্প্রচার হতে হবে বলা আছে। কিন্তু সেগুলি ধারণ করা, সংরক্ষণ করা অথবা সেগুলো প্রচারের হুমকি দেয়া বা ব্ল্যাকমেইল করা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তা ছাড়া এই আইনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলো সংজ্ঞায়িত হয়নি। স্পষ্টতই এখানে নারী নিগ্রহের বিষয়টি ততটা গুরুত্ব পায়নি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে মাত্রায় নারীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, তা বিবেচনায় নিয়ে সরাসরি এবং বিস্তারিতভাবে সেসব অপরাধ সংজ্ঞায়িত করে বিশেষভাবে তার শাস্তির নিধান করা আবশ্যক।

এই ধারটিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার চর্চার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাদের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের এরূপ একটি ধারাকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত বাকস্বাধীনতার পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে বাতিল ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসেবে সুরক্ষিত। সুতরাং বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইনে এই বিপজ্জনক ধারাটির অবস্থান অবশ্যই পুনর্বিবেচনার যোগ্য। একদিকে যেমন নারীর সুরক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে নারী নিগ্রহকারীদের শাস্তিবিধানের জন্য এই আইনের ৫৭ ধারাটির প্রয়োজন আছে, তেমনি অপরদিকে এই ধারার ব্যবহার মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করায় এর পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।[১৬]

বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আইন

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশে দীর্ঘদিন সুনির্দিষ্ট কোন আইন ছিলো না। ২ মে ২০১১ সালে 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১' নামে একটি নতুন আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করে। ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারী আইনটি জাতীয় সংসদে বিল আকারে উত্থাপিত হয় এবং তা ২০১২ সালের ৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১' এর খসড়ার শিরোনাম পরিবর্তন করে 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' করা হয়। আইনটি বাংলাদেশে ২০১২ সালের ৮ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। এটি ২০১২ সালের ৯ নম্বর আইন। আইনটি দ্বারা পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বহন, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, বা প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইনটির অধীন সংঘঠিত অপরাধ আমলযোগ্য এবং জামিন অযোগ্য। এছাড়া আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রধান্য পাবে।

এ আইনে পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা

'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' এর ২(গ) ধারায় নিম্নরূপে পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

১। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য বা চলচিত্র, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত বা প্রদর্শনকৃত এবং যার কোনো শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মুল্য নেই ;

২। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অশ্লীল বই, সাময়িকী, ভাস্কর্য, কল্পমূর্তি, মূর্তি, কার্টুন বা লিফলেট;

৩। উপ-দফা (১) বা (২) এ বর্ণিত বিষয়াদির নেগেটিভ ও সফট ভার্সন।

এ আইনে 'পর্নোগ্রাফি সরঞ্জাম' বলতে পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, ধারণ, বা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ক্যামেরা, কম্পিউটার বা যন্ত্রাংশ, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, অপটিক্যাল ডিজাইন, ম্যাগনেটিক ডিভাইস, মোবাইল ফোন, বা উহার যন্ত্রাংশ এবং যে কোন ইলেকট্রিক, ডিজিটাল বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিভাইসকে বোঝানো হয়েছে।

তবে আইনটির ৯ ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা ব্যবহৃত কোনো পুস্তক, লেখা, অঙ্কন বা চিত্র অথবা যে কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে বা তার অভ্যন্তরে বা প্রতিমাসমূহ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত অথবা যে কোন যানবাহনের ওপর খোদাইকৃত, মিনাকৃত, চিত্রিত বা প্রকারান্তরে প্রতিচিত্রিত অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত কল্পমূর্তি বা স্বাভাবিক শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে না।

তদন্ত প্রক্রিয়া

'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' এর ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর বা তার সমপদমর্যাদার নিচে নয়, এমন কোন কর্মকর্তা তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলি অনুযায়ী তদন্ত করবেন। তদন্তের সময়সীমা

হবে ত্রিশ কার্যদিবস এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময় সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হলে, পুলিশ সুপার বা সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত পনেরো কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাবে। এর পরও যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যুক্তিসংগত কারণে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে আদালতের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত আরো ত্রিশ কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাবে।

তল্লাশি ও জব্দ প্রক্রিয়া

এই আইনের অধীন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যাক্তিকে গ্রেফতার এবং পর্নোগ্রাফি সরঞ্জাম উদ্ধার বা জব্দের ক্ষেত্রে আইনটির ৬ ধারায় ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের নিচে নয়, এমন কর্মকর্তা অথবা সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বা পর্নোগ্রাফি সরঞ্জাম উদ্ধার বা জব্দের ক্ষেত্রে তল্লাশি মকাজ পরিচালনা করতে পারেন।

আদালতে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য

আইনটির ৬ ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, তল্লাশির সময় জব্দকৃত সফট কপি, রুপান্তরিত হার্ডকপি, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, কম্পিউটার বা অন্য কোন ডিভাইস বা এক্সেসরিজ, মোবাইল ফোন, বা এর যন্ত্রাংশ বা সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক উপায়ে ধারণকৃত কোন তথ্য বা মেমোরি ইত্যাদি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

এ ছাড়া আইনটির অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ তদন্তকালে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন বা অন্য কোনো সরকারি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, মোবাইল অপারেটর, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, বৈধ ভিআইপি সার্ভিস প্রোভাইডারসহ সরকারী বা সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স বা অনুমোদনপ্রাপ্ত অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট স্বাভাবিক কার্যপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সংরক্ষিত তথ্য অথবা তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত কোন বিশেষ তথ্য আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

বিশেষজ্ঞ মতামতের সাক্ষ্যমূল্য

আমাদের দেশে প্রচলিত সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৪৬ ধারায় সাক্ষ্য হিসেবে বিশেষজ্ঞদের মতামতের গ্রহণযোগ্যতার বিধান আছে। 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণযোগ্য হবে এবং আদালতে তা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কাদের মতামতকে বিশেষজ্ঞদের মতামত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, সে বিষয়ে 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' এর ধারায় বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যাঁদের মতামত বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে বিবেচিত হবে তাঁরা হলেন,

ক) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞ অথবা

খ) যে সকল প্রক্রিয়ায় উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই সকল বিষয়ে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কারিগরি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা

গ) সরকারের নিকট হতে লাইসেন্স বা অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি দায়িত্বে নিয়োজিত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

বিচার পদ্ধতি

আইনটির ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচার ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী হবে। তবে শর্ত আছে যে, সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচার করবার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে। অর্থাৎ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার করবেন। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ৩১ ধারায় উল্লেখ আছে যে, হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ আইনে অনুমোদিত যে-কোন দন্ড দিতে পারেন। তবে দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করলে তা হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে। যুগ্ম দায়রা জজ মৃতুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১০ বছরের অধিক কারাদণ্ড ব্যতীত আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড দিতে পারেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২ ধারায় উল্লেখ আছে যে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ১০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড দিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ৫ হাজার টাকার অর্ধদন্ড দিতে পারেন। আবার তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ২ হাজার টাকার অর্থদণ্ড দিতে পারেন। সুতরাং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর অধীনে সংঘটিত অপরাধের শাস্তির বিধান অনুসারে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে অপরাধের বিচার হবে। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য হওয়ায় থানায় মামলা দায়ের করতে হবে।

আপিল

এই আইনের অধীন কোনো আদালত বা ক্ষেত্রমতো ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কেনো রায় বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আপিল করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আদালতের আপিলের এখতিয়ার বিষয়ে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪০৭ ধারায় উল্লেখ আছে যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপিল করা যাবে। একই আইনের ৪০৮ ধারা অনুসারে যুগ্ম দায়রা জজ বা কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা অপর কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ আদালতে আপিল করা যাবে। তবে যুগ্ম দায়রা জজ পাঁচ বছরের অধিক সময়ের কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলে সে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করতে হবে। এ ছাড়া ৪১০ ধারা অনুসারে দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধেও হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করতে হবে।

শাস্তি আইনটির অধীনে সংঘটিত অপরাধের শাস্তির বিষয়ে ৮ ও ১৩ ধারায় বর্ণনা আছে। অত্র আইনের ৮ ধারায় নিম্নরূপ শাস্তির বিধান আছে:

১। যখন কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি উৎপাদন করেন বা উৎপাদন করার জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করে চুক্তিপত্র করেন অথবা কোনো নারী, পুরুষ বা শিশুকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেন অথবা কোনো নারী, পুরুষ বা শিশুকে কোনো প্রলোভনে অংশগ্রহণ করিয়ে তার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করেন তখন তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন। এরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২। যখন কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তিমর্যাদা হানি করেন বা ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায় বা অন্য কোন সুবিধা আদায় বা কোনো ব্যক্তির জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধারণকৃত কোনো পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে মানসিক নির্যাতন করেন তখন তিনি অপরাধ

করেছেন বলে গণ্য হবেন। এরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৩। যদি কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন। এরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪। যদি কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি প্রদর্শনের মাধ্যমে গণ-উপদ্রব সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন। এরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৫। ব্যক্তি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে যদি তিনি-

ক) পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, সরবরাহ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা যেকোনো প্রকারে প্রচার করেন অথবা উক্ত সকল বা যে-কোনো উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, উৎপাদন, পরিবহণ বা সংরক্ষণ করেন, অথবা

খ) কোনো পর্নোগ্রাফি প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে কোনো প্রকারের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন; অথবা

গ) এই উপধারার অধীনে অপরাধ বলে চিহ্নিত কোনো সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন;

উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৬। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, বিতরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অথবা শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, সরবরাহ বা প্রদর্শন অথবা কোনো শিশু পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তখন তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন। এরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৭। এই আইনের অধীন সংগঠিত কোনো অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা সহায়তাকারী ব্যক্তি প্রত্যেকেই একই দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

এই আইনে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করাও অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং এই বিষয়ে ১৩ ধারায় নিম্নরূপ বিধান আছে:

১। এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে এই আইনের কোনো ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়েরের কোন ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নেই জেনেও মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা অভিযোগ দায়ের করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন। এরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২। এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলায় আদালত বা ক্ষেত্রমতো ট্রাইব্যুনাল শুনানি ও বিচারান্তে যদি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করেন এবং আদালত যদি এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক, তাহলে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে। এই ধরণের অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৭]

ডিএনএ আইন, ২০১৪

কোনো ব্যক্তির ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ধারণ, ডিএনএ নমুনা ও প্রোফাইলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি স্থাপন, জাতীয় ডিএনএ ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের লক্ষে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে পাস হয় ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪। উল্লেখ্য যে, গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে

বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি মাহমুদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চ ধর্ষণের মামলাগুলোতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পুলিশের প্রতি আদেশ প্রদান করেছিলেন এবং ধর্ষণের মামলাগুলোর চার্জশিটে বাধ্যতামূলক ডিএনএ পরীক্ষার ফল অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ কেন দেয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে অপরাধী শনাক্তের জন্য উচ্চ আদালতের এই নির্দেশ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এতে কোনো ব্যক্তির ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও এর বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলা ছিল না। এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ২৩ ধারার রাসায়নিক পরীক্ষার সাক্ষ্যমূল্যের কথা বলা থাকলেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু বলা নেই। ফলে এক ধরণের আইন শূন্যতা বিরাজ করছিল। এই আইনি শূন্যতা নিরসনের জন্য পাস করা হয়েছে এই আইন।

এই আইনের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, ডিএনএ প্রোফাইল সংবলিত রিপোর্ট আদালতের কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য হবে। শুধু তা-ই নয়, কোনো মামলার বর্ণিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে তলব না করে ডিএনএ রিপোর্টে বর্ণিত মতামত ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে আদালতের কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এবং এই আইনের বিধানগুলোকে অন্যান্য আইনের সমরূপ বিধান ও প্রক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

আইনটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া, ডিএনএ নমুনা ও ডিএনএ প্রোফাইলের ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে। আইনটির ধারা ৪-এ বলা আছে যে, কোনো সংঘটিত অপরাধের তদন্তের প্রয়োজনে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা সেই অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত অথবা অপরাধ সংঘটনের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাঁর ডিএনএ নমুনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। অনুরোধ করার তিন ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ সম্মতি না দেন, তাহলে সেই ব্যক্তি ডিএনএ নমুনা দিতে অসম্মত বলে ধরে নেয়া হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত আদালতে আবেদন করতে পারবেন। তারপর আদালত উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিতে পারেন। উল্লেখ্য, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি এবং লিখিত সম্মতি ছাড়া এই আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না। ডিএনএ নমুনা প্রদানকারী ব্যক্তি যদি শিশু বা মানসিক ভারসাম্যহীন বা শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে তার পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা তাদের দ্বারা নিয়োজিত আইনজীবী উক্ত ব্যক্তির পক্ষে ডিএনএ নমুনা প্রদানের সম্মতি দিতে পারবেন।

আইনটির ১২ ধারায় ডিএনএ নমুনা এবং প্রোফাইলের ব্যবহার সম্পর্কে বলা আছে যে:

- কোনো ব্যক্তি শনাক্তকরণ;
- কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি শনাক্তকরণ;
- নিখোঁজ বা অজ্ঞাত ব্যক্তি শনাক্তকরণ;
- দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত ব্যক্তি শনাক্তকরণ;
- বিরোধ নিষ্পত্তি এবং
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয় ছাড়া ডিএনএ নমুনা ও প্রোফাইল ব্যবহার করা যাবে না।

আইনটির ১৫(২) (ঙ) ধারায় এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ডিএনএ ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষিত তথ্যাদির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে যা কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় অপরাধ ও দন্ডবিষয়ক। যদি কোনো ব্যক্তি অননুমোদিতভাবে ফরেনসিক ডিএনএ কার্যক্রম আইনটির পরিচালনা করেন, তাহলে তিনি তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড

বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১২] যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে ডিএনএ-সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেন বা তথ্য সংগ্রহ করেন বা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেন, তাহলে বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [১৩] যদি কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে ডিএনএ নমুনা ধ্বংস, পরিবর্তন, দূষিত বা জাল করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি তিন থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড দণ্ডিত হবেন।[১৪] যদি কোনো ব্যক্তি অননুমোদিতভাবে জাতীয় ডিএনএ ডাটাবেইজে প্রবেশ করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি এক থেকে দুই বছরের কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [১৫]

আইনটির বিভিন্ন ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এর কিছু নেতিবাচক দিক আছে। যেমন, আইনটির ৩৮ ধারায় বলা আছে যে ডিএনএ রিপোর্টটি আদালতের কার্যধারায় সরাসরি গৃহীত হবে এবং ডিএনএ রিপোর্ট প্রদানকারী ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষী হিসেবে তলব করা হবে না। এ ক্ষেত্রে আদালতে কার্যধারার প্রয়োজনে মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদানকারী ব্যক্তিকে জেরা করা বা কোনো পক্ষের আইনজীবী দ্বারা তাকে প্রশ্ন করার সরাসরি সুযোগ থাকছে না। যার ফলে দালিলিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোনো ভুলভ্রান্তি রয়ে গেলে কিংবা কোনো বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন হলে আদালত কী করবে সেই সম্পর্কে আইনটিতে কিছু বলা নেই। আইনটির এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অনেকে এর অপপ্রয়োগ করতে পারে এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হতে পারে। এছাড়াও আইনটির ৮ ধারায় উল্লেখিত আদালতের আদেশে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের যে বিধান আছে, তাতে কোনো সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি, যার ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত হতে পারে, যা ন্যায়বিচার লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আইনটি কোনো ব্যক্তি শনাক্তকরণ, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-নিরূপণ, কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে শনাক্তকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।[১৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নারী সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ

নারী সহিংসতা সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এটি একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সমতা আনার ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নারী সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী সহিংসতা দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ রয়েছে সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

(ক) সংবিধান ও নারী সহিংসতা প্রতিরোধ

১৯৭২ সনে নবগঠিত বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারী সহিংসতা প্রতিরোধ সম্ভব। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"
২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"
২৮(৩) অনুচ্ছেদে আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।"
২৯(১) অনুচ্ছেদে আছে, "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"
২৯(২) অনুচ্ছেদে আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।"
৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫ টি (বর্তমান ৫০টি) আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

(খ) নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সনদ-বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬ (ক), ও (চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারী ২০১১ সালে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রির্পোটটি উপস্থাপন করে। ১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সকল কর্মপরিকল্পনায় নারী সহিংসতা রোধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(গ) বেইজিং ফলোআপ

বাংলাদেশ চতুর্থ নারী সম্মেলন বেইজিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলো। সেখানে নারী সহিংসতা দূর করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছিলো তা বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের ৮-ই মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে। বর্তমান জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

* বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
* নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
* নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
* নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ রূপে গড়ে তোলা।
* নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
* নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
* সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।
* নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।
* নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
* রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
* গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
* নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

(ঘ) নারী অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত আইনসমূহঃ

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-১৯৬১, যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০, নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩।

(ঙ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৬ সালে নির্যাতিত নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ জন আইন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪টি পদ নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নারী প্রতিরোধ সেলের শুনানি গ্রহণ ও পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন, সন্তানের ভরণপোষণ, দেনমোহর ও খোরপোষ আদায়সহ সব ধরণের আইনগত পরামর্শ দান করা হয়। সেলের নিযুক্ত উপ-পরিচালক, আইনজীবী ও সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাগণ এ সকল শুনানি ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহ সেলের আইনজীবির মাধ্যমে পারিবারিক ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করা হয়। ১৯৮৬ সালেই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

(চ) ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০ এর ৮ম তলায় এ সেন্টারটি অবস্থিত। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এ প্রকল্পের অনুকূলে ১০৯২১ নম্বরটি হেল্প লাইন হিসেবে প্রদান করে। সকল মোবাইল

এবং অন্যান্য টেলিফোন হতে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা এই নম্বরে ফোন করা হয়। এই সেন্টারের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার মহিলা ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ সহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন।

(ছ) ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)

বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে অবস্থিত ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) বাংলাদেশ সরকারের একটি মূখ্য কর্মসূচি। নির্যাতিত নারীদের সকল প্রয়োজনীয় সেবা একস্থান থেকে প্রদান করার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ওসিসি। এই কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি ওসিসিতে ৪জন মেডিকেল অফিসার, ৬ জন নার্স, ২ জন পুলিশ কনস্টেবল, ১ জন সমাজসেবা কর্মকর্তা, ১ জন আইনজীবী, ১ জন কাউন্সেলর, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ৪ জন ম্যাসেঞ্জার কাম ক্লিনার নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাদানে নিয়োজিত রয়েছেন। অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত মোট ১৬,০০০ জন নারী ও শিশুকে ওসিসিসমূহ হতে সেবা প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত ওসিসিতে আগত মোট ৭৪৫ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী এককালীন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই সেবা অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশি সহায়তা, ডিএনএপরীক্ষা, সামাজিক সেবা, আইন সহায়তা, মানসিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয় সেবাসমূহ ওসিসির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এসকল সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারী-সহিংসতা প্রতিরোধে ওসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে বিভাগীয় পর্যায়ে আটটি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এর আওতায় ষাটটি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৩ সাল হতে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত এ সকল সেল কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের সারণি তুলে ধরা হলো:

সারণি-৬ ওয়ান স্টপ সেল কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ

সহিংসতার ধরণ	বছর			মোট
	২০১৩	২০১৪	২০১৫ (জানু-জুন)	
শারীরিক নিপীড়ন	৩২৮২	৬২৯০	২১৮১	১১৭৫৩
যৌন নিপীড়ন	৭০৬	৫৫৫	৩০৭	১৫৬৮
দগ্ধ	২৭	৩১	৯	৬৭
এসিড	৬	১৬	০	২২
মানসিক নিপীড়ন	৩৪৭	৫১১	২৮৭	১১৪৫
অন্যান্য	২৩	৩৭	৩৫	৯৫
মোট	৪৩৯১	৭৪৪০	২৮৩৪	১৪৬৬৫

(জ) ডিএনএ ল্যাবরেটরী

নির্যাতিত নারীদের দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে জানুয়ারি ২০০৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশব্যাপী নির্যাতিতদের সহায়তা করার লক্ষ্যে রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ডিএনএ স্ক্রিনি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ঘৃণ্যতম অপরাধ, যেমন-ধর্ষণ ইত্যাদি দমনে এই ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন, পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্বের প্রমাণ, দেশের অধিবাসী হতে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা

অথবা বংশের ধারা প্রদান এবং দূর্যোগে ও দুর্ঘটনায় নিখোঁজ মৃত মানুষের পরিচিতি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।[১৯]

বাংলাদেশের নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, এসবের মধ্যে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন [বিশেষ বিধান] আইন ১৯৯৫, নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ [সংশোধন ২০০৩], আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ [সংশোধন ২০০৬], এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, নির্বাচনে নারীর সংরক্ষিত আসন আইন [সংশোধিত] ২০০৫, বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন বিল ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, পারিবারিক নির্যাতন আইন ২০০৮, মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ডিএনএ আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা [প্রতিরোধ ও সুরক্ষা] আইন ২০১০, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারী মানবাধিকার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে-

- ১৯৯৫ সালে জাতীয় নারী পরিষদ গঠন। প্রধানমন্ত্রীকে এর প্রধান করে ৪৪ সদস্যের কমিটি।
- মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে একজন করে উইড ফোকাল পয়েন্টস নির্বাচন। যাদের কাজ হচ্ছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নকে মূল ধারায় নিয়ে আসা।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় [১৯৯৭-২০০২] দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে নারীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগের পক্ষে বাধা বিঘ্ন দূর করা।
- নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ।
- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সব ছাত্রীদের জন্য বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি প্রদান সম্প্রসারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত।
- নারী নির্যাতন ও পাচারের কঠিন শাস্তির বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ [সংশোধনী ২০০৩] পাস করা হয়।
- জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল এসিড অপরাধ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ।
- এসিড সন্ত্রাস বন্ধে অপরাধীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন প্রণয়ন।
- নারী ও শিশুপাচার রোধে মাল্টি-সেক্টারাল প্রকল্প গ্রহণ।
- সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন ৪৫ টি তে উন্নীত।
- জাতীয় বাজেটে জেন্ড,ার বরাদ্দ।
- ২০০০ সালে সন্তানের পরিচয়ে পিতার পাশাপাশি মায়ের নাম সংযোগ।
- মহিলা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ চালু।

- কর্মজীবি নারীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা এবং ৩২ টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয় দরিদ্র নারীদের দেশের বাইরে নারী শ্রমিক হিসেবে প্রেরণ ও কর্মসংস্থানের সহায়ক ভূমিকা রাখতে নীতিমালা প্রণয়ন।
- ২০১০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা আইন অনুমোদন।
- ২০১১ সালে নারী নীতিমালা তৈরি।[২০]

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত জাতিসংঘ সনদ বা চুক্তি হচ্ছে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)। ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই সনদ গৃহীত হয়। সিডও সনদ সমতা ও বৈষম্যহীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুসারে সকল সুযোগ, আচরণ ও সম্পদে নারী-পুরুষের সম অধিকার রয়েছে। বৈষম্য সৃষ্টি করে সমাজ বৈষম্যের কারণে নারী তার অধিকার ও বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বৈষম্য পরিবারে ও পরিবারের বাইরে যেখানেই হোক না কেন তা দূর করতে হবে। রাষ্ট্র নারীর কল্যাণের জন্য কাজ করবে। তাই নারীর অধিকার রক্ষা ও অসমতা দূর করার জন্য কাজ করতে হবে।

সিডও সনদের মূলনীতি

তিনটি মৌলিক মূলনীতির উপর সিডও সনদ প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো:

ক) সমতার নীতি;

খ) বৈষম্যহীনতার নীতি;

গ) শরীক রাষ্ট্রের দায়দায়িত্বের নীতি।

সিডও সনদ এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডও সনদ অনুমোদন করে। আর এর অর্থ হলো বাংলাদেশ সরকার সিডও বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের ধারা-২, এবং ১৬-১(গ)-এ আপত্তি জানিয়ে তা অনুমোদন করেনি। এ দুটি বৈষম্য বিলোপের দাবি ও বিবাহ বিচ্ছেদকালে নারী-পুরুষের একই অধিকার সংক্রান্ত ধারা রয়েছে।

সিডও সনদের ধারাসমূহ

সিডও সনদ ৩০ টি ধারা সম্বলিত। এই ৩০ টি ধারা তিনভাগে বিভক্ত। (ক) ১ থেকে ১৬ ধারা-নারীপুরুষের সমতা সম্পর্কিত (খ) ১৭ থেকে ২২ সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ব (গ) ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত। তাই ১ থেকে ১৬ ধারা সিডও সনদের মূলধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। নিচে ১-১৬ ধারার বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো:

ধারা ১ নারীর প্রতি বৈষম্যের ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা প্রদান।

ধারা ২ বৈষম্য বিলোপ করে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ।

ধারা ৩ নারীর মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

ধারা ৪ নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা আনয়নের সাময়িক ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

ধারা ৫ নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড ভিত্তিক নেতিবাচক সংস্কৃতি পরিবর্তন।

ধারা ৬ পতিতাবৃত্তি দূরীকরণ।

ধারা ৭ রাজনীতি ও জনজীবনের সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণের সম অধিকার নিশ্চিতকরণ।

ধারা ৮ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিরূপে নারীর অংশগ্রহণ।
ধারা ৯ নারীর জাতীয়তা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।
ধারা ১০ সকল ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ।
ধারা ১১ চাকরি, কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা
ধারা ১২ নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান।
ধারা ১৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীর সমান অধিকার।
ধারা ১৪ পল্লী নারীর উন্নয়নে তাদের সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
ধারা ১৫ নারীর আইনগত ও নাগরিক সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
ধারা ১৬ বিয়ে সহ সকল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের সম অধিকার।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষ সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সকল ক্ষেত্রে নারীর সম সুযোগ ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত। আমাদের সংবিধানে নারীর স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। কিন্তু আমাদের সমাজে নারী যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। বঞ্চনার কারণে শিক্ষা -স্বাস্থ্য-আয় মূলক কাজ সহ সকল ক্ষেত্রে নারী পিছিয়ে আছে।

নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা চিত্র

- খাবার ও পুষ্টি কম পাবার কারণে বাংলাদেশের নারী ও মেয়ে শিশুরা পুরুষ ও ছেলে শিশুদের তুলনায় বেশি অপুষ্টিতে ভোগে।
- নারীদের অসুখ হলে পরিবারে কমই গ্রাহ্য করা হয়-এমনকি পরিবার ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান গুলোতে তারা কমই সেবা পেয়ে থাকে।
- বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমান। কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। এছাড়া ঘরের কাজ করা, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা, বাল্য-বিবাহ ইত্যাদি কারণে ছাত্রীরা অনেক সময় স্কুলে যেতে পারে না ও লেখাপড়ায় সময় দিতে পারে না। ফলে তারা ভাল ফল করতে পারে না।
- নারী গৃহকাজের স্বীকৃতি পায় না।
- মজুরির ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়।
- নারীদের পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ খুবই সীমিত। কাজের সুযোগ না থাকায় দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের বোঝা মনে করা হয় এবং অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। আর যেসব নারী অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারাও শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। তারা পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পায়।
- পারিবারিক ও সামাজিক সম্পদে নারীর অধিকার কম।

নারী-পুরুষ অসমতার ধারণা তৈরি করেছে সমাজ

পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান ভাবা হয় না। ভাবা হয় নারী পুরুষের তুলনায় দূর্বল আর পুরুষ শক্তিশালী। এই শারীরিক পার্থক্যের যুক্তি দিয়ে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয় না। কিন্তু নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী, নারী-পুরুষ উন্নয়ন কর্মী ও বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান শারীরিক পার্থক্যের সঙ্গে বৈষম্যের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সমাজ ও পরিবার এই পার্থক্য তৈরি করেছে।

সৃষ্টিকর্তা নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্য তৈরি করেছে। এ সকল পার্থক্য বা নারী-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় না। যেমন-সন্তান ধারণ করা, সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করানো ইত্যাদি। অন্যদিকে নারী-পুরুষের অধিকার, ভূমিকা, ও মর্যাদার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা তৈরি করেছে সমাজ বা মানুষ; যেমন নারীরা ঘরের কাজ করবে, রান্না করবে, পুরুষরা বাইরের কাজ করবে, নারীরা পুরুষের তুলনায় মজুরি কম পাবে ইত্যাদি। নারী-পুরুষের ভূমিকা, মর্যাদা, ও কাজ একই রকম হওয়া সম্ভব। সমাজ ও পরিবার পার্থক্য না করলে নারী-পুরুষ উভয়েই সমভাবে বিকশিত হতে পারে।

নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে আমাদের করণীয়

- সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক-উভয়কেই সৃষ্টিকর্তার দান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং উন্নয়নের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

- আমাদের ভাবতে হবে যে পরিবারে ছেলেমেয়েরা সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বড় হয়, সে পরিবারের উন্নতি বেশি হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য-সম্পদে তারা এগিয়ে থাকে অনেক বেশি।
- সকল কাজে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই অন্নের সংস্থান করুক'।
- নারীর প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে অর্থাৎ সন্তান কখন, কত বিরতিতে, কয়টি নেওয়া হবে সে ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- নারী নির্যাতন দূর করতে হবে। নির্যাতনকারী যত কাছের মানুষ-ই হোক না কেন, তার নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে হবে এবং শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- যৌতুক, বাল্যবিবাহ, যৌন নির্যাতনসহ সকল নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
- মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধে গর্ভবতী মায়ের যত্ন নিতে হবে। গর্ভবতী মাকে বেশি বেশি খাবার দিতে হবে।
- সম্পদের উপর নারী অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে।
- নারীর চলাফেরার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে।
- নারীর অধিকার সংরক্ষিত না হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা ভাবতে হবে।
- অর্থনৈতিক ও গৃহকাজে নারী-পুরুষ পরস্পরকে সহায়তা ও অংশগ্রহণ করার মনোভাব তৈরি করতে হবে।
- নারীর বিপক্ষে যেসব আইন-কানুন ও রীতি-নীতি রয়েছে, তার পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।
- শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নারীকে বিশেষ সহায়তা দিতে হবে; যেমন, নারীশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার উপবৃত্তি প্রদান করে থাকে।[২২]

নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ

সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ নারী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত ক্ষেত্রে (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক) তাদের ক্ষমতায়ন কম প্রতীয়মান হয়। নিচে নারীর ক্ষমতায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হলো:

১। নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা

শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই পারে সমস্ত অন্ধকারকে দূরীভূত করতে। যে সমাজ যত বেশি শিক্ষিত সে সমাজ ততো বেশি উন্নত। আমাদের সমাজে যে নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ভালো তার ক্ষমতায়নের জন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না, সে নিজেই তার ক্ষমতা পেয়ে থাকে। তাই শিক্ষার হার বিশেষ করে নারী-শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সরকারিভাবে মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে, যার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার একটু কম, আর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার খুবই কম। নারীদের যদি আরো বেশি শিক্ষিত করা যায় তাহলে তাদের ক্ষমতায়ন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

২। নারী ক্ষমতায়নে স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই সম্পদ, ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ও রোগমুক্ত শরীর না হলে কেউ কর্মে মনোযোগ দিতে পারে না। আর কর্মে মনোযোগ না দিলে আয় কমে যায়। আয় না থাকলে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, যেটা পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে ও ক্ষমতায়নকে হ্রাস করে। আমাদের দেশে নারীদের স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে ভালো না, এর অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ। বর্তমানে প্রায় ৬৪% মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের পূর্বে এবং তাদের মাঝে শিক্ষার হার শহরে ২৬% মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত, আর গ্রামে ৮৬ % এর কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতাই নেই. এসব নারীরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফলে তাদের স্বাস্থ্যের চরম অবনতি দেখা দেয়, যেটা ক্ষমতায়নে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আজকের দিনে নারীরা স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক সচেতন। নারীরা যতো বেশি তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে ততো তাদের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩। নারীর ক্ষমতায়নে কর্মসংস্থান

কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায়িত করতে হলে তার পূর্বশর্ত হলো তাকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করা। নারীদের প্রতি দয়া নয় বরং তাদের অধিকার ও যোগ্যতা বলে কর্মসংস্থান করা। এই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে সম্ভব। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে যেটা তাদের ক্ষমতায়নের পথকে আরো প্রশস্ত করে। সরকারি বিভিন্ন চাকুরিতে তাদের জন্য কোটা পদ্ধতিও চালু রয়েছে তার পরেও কর্মসংস্থানে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। আমাদের দেশে প্রায় ৬৫.৫৫% মহিলা অর্থ ছাড়াই কাজ করে থাকে অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজ এবং দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা কাজ করে এতে এ কাজের অর্থ হয় ৬ হাজার ৯৮১ কোটি থেকে ৯ হাজার ১০৩ কোটি ডলার কিন্তু সেখান থেকে তারা কোনো অর্থ পায় না (দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২০১৪)। ১৯৭৬ সালের পর থেকে আমাদের দেশে গার্মেন্টস ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে প্রায় ৮৫% মহিলারা গার্মেন্টসে কাজ করে কিন্তু তাদের বেতন খুবই কম-যেটা দিয়ে কোনো রকমে দিনটা চলে যায় অথচ ভালো চাকুরিতে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম, প্রায় সময় তাদেরকে বাড়ির মধ্যে কাজে ব্যস্ত রাখা হয়। এরূপ অবস্থায় তাদের হাতে কোনো অর্থ থাকে না, অর্থের জন্য পুরুষের কাছে হাত পাততে হয়, যেটা ক্ষমতায়নের একটা বড় বাধাস্বরূপ। তাই বেশি বেশি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন সম্ভব।

৪। নারী ক্ষমতায়নে রাজনীতি

নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনীতি। যত বেশি নারীরা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবে ততো বেশি নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হবে। আমাদের দেশে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আছে তবে সেটা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে সরকারি ও বিরোধী দলের দুই নেতা এবং মহান জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী; তার পরেও নারীরা রাজনীতিতে সন্তোষজনকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তাদের চারপাশে পুরুষরা কতৃত্বস্থাপন করে থাকে; তবে পূর্বের তুলনায় নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অনেক বেশি হয়েছে। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকারের ২য় অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নারীদের জন্য সিট বরাদ্ধ করা হয়। প্রতি তিনটি ওয়ার্ডে একজন করে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে এবং প্রতিটি উপজেলায় একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংসদে নারীদের জন্য ৫০ টি সিট বরাদ্দ করা হয়েছে ২০১১ সাল থেকে দশম জাতীয় সংসদের পূর্ণ মন্ত্রী রয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী মাত্র দুই জন, যেটা আগের তুলনায়ও (নবম জাতীয় সংসদ) কম।

৫। সামাজিক ক্ষমতায়ন

সামাজিক ক্ষমতায়নের মধ্যে মূলত সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক বিভিন্ন পদক্ষেপ আছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন হয়ে থাকে। যেমন-১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে "গ্রামীন মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচি" এর কাজও শুরু হয়। বর্তমানে নারীদের জন্য শিক্ষা, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ-সুবিধা সম্প্রসারণ, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ, যথা-শিশু কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান, নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী সহায়তা কর্মসূচি, কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল স্থাপন, দুঃস্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা মাতৃত্বকালীন ভাতা। এছাড়াও বয়স্ক-ভাতা, প্রতিবন্ধী-ভাতা কার্যক্রম চলমান আছে যা থেকে নারীরা উপকৃত হয়। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি)-এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। এই সাথে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Home Based Micro Enterprise গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রম-বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Rural Non Farm Activities-এর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করা হয়েছে।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

* বাংলাদেশে সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
* নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
* নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
* নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।
* নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
* নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
* সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।
* নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।
* নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
* রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
* নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থবিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
* নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
* প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
* প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
* বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
* গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা সহ জেন্ডার-প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
* মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।
* নারী-উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।
* নারী-উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

নারী-উন্নয়ন নীতির কৌশলসমূহ

নারী-উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী-উন্নয়ন প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেওয়া। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

* নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা যেমন: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশাসনিক কাঠামো। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা।
* নারী -উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
* নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা জোরদার করা।

* নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করা।
* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়ের (২০১৫) মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।
* তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা।
* সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও
* নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

নারী ও আইন

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু-নিযার্তন দমন আইন, ২০০০ প্রভৃতি এবং নারী ও শিশু-নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনজীবির ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা সেশন জজ-এর অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী-উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও (২০১১-২০১৫) নারীদের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে।[২৪]

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বাংলাদেশের নারীর অবস্থান

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণার [৮ মার্চ, ১৯১০] শত বছর পেরিয়ে গেলেও বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী আজও বৈষম্যের দায় বহন করে চলেছে।

এই ভাবনা থেকেই সত্যিকারের নারী মুক্তির লক্ষ্যে নানা বৈশ্বিক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। [১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৬-১৯৮৫ সালে নারী দশক, ১৯৮৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ দলিল (সিডও) অনুমোদন ও ১৯৮১ সালে কার্যকর, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯৫ চারটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন ও বেইজিং কর্ম পরিকল্পনার ঘোষণা, ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সম্মেলনে নারীর প্রতি বিরাজমান নিষ্ঠুর আচরণ ও সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন স্বীকৃত হয়, ২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ঘোষণা হয়]। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল নারী ও কন্যাদের প্রতি বিরাজমান সকল নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূল করা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে নারীর মানবাধিকার রক্ষায় গৃহীত হয়েছে নানা পদক্ষেপ। আমাদের শাসনতন্ত্রে সম-অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে। [অনুচ্ছেদ-১০, ধারা-২৮(১) নারীর জন্য প্রণীত আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ রয়েছে, মহান সংবিধানে সাংবিধানিক অধিকার ও বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল প্রকার আইন ও বিধিকে বাতিল বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। সিডও সনদে সরকার স্বাক্ষর করেছে, নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে অর্থাৎ নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর অনুকূলে আইন প্রণয়ন হয়েছে। যেমন-পারিবারিক অধ্যাদেশ আইন [১৯৮৫], যৌতুক নিরোধ আইন [১৯৮০], নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন [২০০০, ২০০৩], মহামান্য হাইকোর্টের রায়-যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে [২০০৯], ফতোয়া বন্ধের নির্দেশনামূলক রায় [২০১১], পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন [২০১০], মানব পাচার আইন [২০১২], হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন [২০১২], উত্যক্তকরণ রোধে ভ্রাম্যমান আদালত আইন [২০০৯], সাথে সাথে প্রতিটি বিভাগ ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ওসিসি স্থাপনসহ সারা দেশে ৪৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। কন্যা শিশুদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, বার্ধক্য ভাতা চালুসহ গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ।[২৫]

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

* বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন বা রূপায়ণ খুব একটা ইতিবাচক নয়। গণমাধ্যমে নারীর ভুল, গৎবাঁধা বা অপমানজনক উপস্থাপনা নারীর ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত নারী বিষয়ক সংবাদ, নাটক, গান, বিজ্ঞাপন, ছায়াছবি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই জেন্ডার-সংবেদনশীল নয়। এতে নারীকে নির্যাতনের শিকার, অসহায়, পরনির্ভরশীল, যৌনবস্তু, সেবাপরায়ণ/আত্মত্যাগী মা এবং কোমলমতি স্ত্রী, গৃহকর্মী ইত্যাদি ভূমিকায় দেখা যায়। নারীরা সেজেগুজে কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, রঙ ফর্সা করার জন্য ক্রিম মাখছে কিংবা রান্না বা কাপড় ধোয়ার কাজ করছে-গণমাধ্যম এখনো এসব সনাতনী ভূমিকাতেই নারীকে দেখাচ্ছে। অসংখ্য নারী যে শিক্ষক, চিকিৎসক, উন্নয়ন বা সামাজিক কর্মী, আইনজীবি কিংবা প্রশিক্ষকরূপে সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখছেন তা সেভাবে গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয় না। বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কাজ করলেও এসব প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা গভর্নিং বডিতে স্থান পেয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা হাতে গোনা। তাই এই নারী পেশাজীবিরা গণমাধ্যমের নীতিমালাকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারে।[২৬]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ নারী অধিকার রক্ষায় সরকারী উদ্যোগ

ভিজিডি কর্মসূচি

ভিজিডি কর্মসূচির মোট দুইটি উপ-প্রকল্প রয়েছে, যা থেকে ভিজিডির জন্য নির্বাচিত নারীরা বিভিন্ন ধরণের সহায়তা পেয়ে থাকে।

১। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি ভিজিডি) ভিজিডি উপ-প্রকল্প: সমগ্র ভিজিডি কর্মসূচির ৯০% মহিলা এই উপ-প্রকল্পের আওতাধীন। মহিলারা ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হয়। তারা প্রশিক্ষণ প্যাকেজ (প্রশিক্ষণ, ঋণ ইত্যাদি) সেবা গ্রহণের পাশাপাশি ২৪ মাস ধরে মাসিক ৩০ কিলোগ্রাম করে খাদ্য সাহায্য পেয়ে থাকে। এই ২৪ মাস সময়কে একটি ভিজিডি চক্র হিসেবে গণ্য করা হয়। খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) মাসকাল, ভিজিডি মহিলারা অনুমোদিত এনজিওদের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। মহিলা প্রশিক্ষণকেন্দ্র (ডব্লিউটিসি): মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিচালিত হয়। এই কেন্দ্রে প্রতিজন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী মাসিক ৩০ কিলোগ্রাম করে এক বছর মেয়াদে খাদ্য সাহায্য পায়। উক্ত সময়ে মহিলারা বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় সচেতনতাবোধ অর্জনসহ আয়বর্ধক বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর প্রাপ্ত সম্পদ ও গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিজিডি মহিলা প্রশিক্ষণ এবং খাদ্য সাহায্য পায়।

ভিজিডি মহিলা হওয়ার শর্তাবলী

যে সকল পরিবারের মহিলা সদস্য নিম্নোক্ত সবগুলি শর্ত (৫টি) পূরণ করবেন তারা বাছাইয়ে অগ্রাধিকার পাবেন। ভিজিডি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কমপক্ষে ৪ টি শর্ত পূরণ করতে হবে।

১। অতিমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তাহীন অর্থাৎ যে পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন কোনো না কোনো বেলার খাবার খেতে পারেন না।

২। প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের কোনো জমি নেই অথবা ০.১৫ একরের কম জমির মালিক। এক্ষেত্রে, ভূমিহীন পরিবার অগ্রাধিকার পাবে।

৩। বসতবাড়ির অবস্থা (ঘরের ছাউনি, বেড়া, দরজা, খুঁটি ও পয়ঃনিষ্কাশন) খুবই নিম্নমানের।

৪। যেসব পরিবার দৈনিক অথবা অনিয়মিত দিনমজুর হিসাবে অতি সামান্য আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সুনির্দিষ্ট কোনো আয়ের উৎস নেই।

৫। পরিবার প্রধান মহিলা এবং কোনো উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য অথবা অন্য কোনো আয়ের উৎস নেই।

অন্তর্ভুক্ত না করার শর্তাবলি

উল্লিখিত যে কোনো চারটি শর্তপূরণ করলেও নিচের যে কোনো একটি শর্ত বর্তমান থাকলে ভিজিডি কার্ড পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন:

১। মহিলা যিনি নির্ধারিত বয়সের অন্তর্ভুক্ত নন (১৮ থেকে ৪৯)।

২। মহিলা যিনি অন্য কোনো খাদ্য বা অর্থ সাহায্য প্রদানকারী কর্মসূচী/প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সদস্য।

৩। মহিলা যিনি আগের সনের মধ্যে যেকোনো চক্রে ভিজিডি কার্ডধারী ছিলেন।

ভিজিডি কার্ডের জন্য কার কাছে যাবেন?.

- ইউনিয়ন পরিষদ;
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মমর্তা;
- অনুমোদিত এনজিও।

ভিজিএফ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাময়িকভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে ভিজিএফ কার্ড দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবের সময় অতি দরিদ্রদের ভিজিএফ কার্ড দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন ভিজিএফ কমিটি

- চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ-সভাপতি
- ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা-সদস্য
- উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক সুপারভাইজার)-সদস্য
- বিআরডিবি মাঠ সহকারী-সদস্য
- ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ড হতে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি-সদস্য (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব-সদস্য সচিব।

বয়স্কভাতা কর্মসূচি

বয়স্কভাতা কর্মসূচির মাধ্যমে কমপক্ষে ৬৫ বছর বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে মাসিক ৩০০ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের মনোবল জোরদার, পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনা হয়।

প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড

ক) বয়স: সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে সর্বনিম্ন ৫৬ বছর বয়স্ক না হলে কোনো ব্যক্তি ভাতা প্রাপ্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। যারা পূর্ব থেকে ভাতা ভোগ করে আসছেন তারাও ভাতা পেতে থাকবেন।

খ) প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয়: অনূর্ধ্ব ৩,০০০ টাকা।

গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা:

১। যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতা হীন তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২। শারীরিকভাবে অসুস্থ, মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও আংশিক কর্মক্ষমতাহীন ব্যক্তিগণকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ঘ। আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

১। মুক্তিযোদ্ধা: বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২। আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনদের ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩। সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে: বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ঙ) বিভিন্ন খাতে খরচ: প্রার্থীর খাদ্য, স্বাস্থ্য/চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যান্য খাতে তার বার্ষিক আয় কি অনুপাতে খরচ করবে তা বিবেচনা করতে হবে। খাদ্য বাবদ যার সমুদয় আয়ের অর্থ ব্যয় হয়ে যায়, স্বাস্থ্য/চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করার জন্য কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে না তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

চ) ভূমির মালিকানা: ভূমিহীন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ি ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্তির অযোগ্যতা

ক) সরকারী কর্মচারী/পরিবারের সদস্য পেনশন ভোগী হলে;
খ) দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী হলে;
গ) অন্য কোনোভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হলে;
ঘ) কোনো বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত হলে;
ঙ) সিটি করপোরেশন এলাকায় বসবাসকারী হলে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাপ্রদান কার্যক্রম

বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও উন্নয়ন সার্কেলে এবং সকল শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে অতিদরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী এ কর্মসূচি থেকে ৩০০ টাকা ভাতা পায়।

ভাতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও প্রদানের নিয়ামাবলি

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড

- 'বিধবা' বলতে তাদেরকেই বুঝানো হবে যাদের স্বামী মৃত;
- 'স্বামী-পরিত্যক্তা' বলতে তাদেরকেই বুঝানো হবে যারা স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত বা অন্য যেকোনো কারণে অন্তত দুবছর যাবৎ স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বা একত্রে বসবাস করেন না।

ভাতা পাওয়ার জন্যে প্রার্থীর যোগ্যতা

- বয়োবৃদ্ধা, অসহায় ও দুঃস্থ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- যিনি দুঃস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা এবং যার ১৬ বছর বয়সের নীচে ২টি সন্তান রয়েছে, তিনি ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। দুঃস্থ, দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ তারা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রাপ্তি অযোগ্যতা

- যিনি সরকারি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবি;
- যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেনশনের সুবিধা পেয়ে থাকেন;
- যিনি দুঃস্থ মহিলা হিসাবে ভিজিডি কার্ডধারী;
- যিনি অন্য কোনোভাবে নিয়মিত সরকারী অনুদান পেয়ে থাকেন;
- যিনি কোনো বেসরকারী সংস্থা বা সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন;
- যিনি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ভাতা পাওয়া পদ্ধতি

- বিধবা বা স্বামীপরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ছকে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি/সদস্যসচিব বরাবর আবেদন পেশ করবেন।

মহিলাদের ভাতা, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কী?

গ্রামীন এলাকায় দরিদ্র মায়েদের জন্য বাংলাদেশ সরকার মাতৃত্বকালীন ভাতা চালু করেছে। গর্ভবতী মায়ের প্রত্যেককে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা প্রদান করা হবে।

ভাতা পাবার শর্ত/ভাতা দেবার কারণ

- প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকাল (যেকোনো একবার);
- বয়স কমপক্ষে ২০ বছর বা তার ঊর্ধ্বে;
- মোট মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার নিচে;
- দরিদ্র পরিবারের প্রধান রোজগারি মহিলা;
- দরিদ্র প্রতিবন্ধী মা;
- শুধু বসতবাড়ি রয়েছে বা অন্যের জায়গায় বাস করে;
- নিজের বা পরিবারের কোনো কৃষি জমি, মৎস্যচাষের জন্য পুকুর বা কোনো পশু সম্পদ নাই।

ভাতা মেয়াদ, পরিমাণ ও বিতরণ

- গর্ভধারণের তিনমাস পর থেকে সন্তান প্রসব সহ সর্বমোট দুই বছর একজন মাকে প্রতি মাসে নগদ ৩০০ টাকা প্রদান করা হয়।
- উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা এবং এনজিও মনিটরিং কর্মকর্তা যৌথভাবে ভাতার অর্থ বিতরণ করেন।
- গর্ভধারণ অবস্থায় গর্ভপাত ঘটলে গর্ভপাত পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত ভাতা অব্যাহত থাকবে। সন্তান জন্ম গ্রহণের পর দুই বছরের মধ্যে মারা গেলে সংশ্লিষ্ট মা তিনমাস পর্যন্ত ভাতা পাবে।

ভাতা বিতরণ পদ্ধতি

- ভাতা বিতরণের জন্য কার্ড দেওয়া হয়। এ কার্ডে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক ভাতাপ্রাপকের সত্যায়িত ছবি (সত্যায়নকারীর সীলসহ) থাকে।
- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রতি ৩ মাসে একবার উপকারভোগীকে প্রদান করা হয়। কেউ ইচ্ছা করলে বছরে একবার বা দুই বার ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূণর্বাসন কর্মসূচি

এসিডদগ্ধ মহিলা বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগসুবিধা সৃষ্টি এবং তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজে পুঁজি সরবরাহের জন্য সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করার জন্য এ কর্মসূচি রয়েছে।

এসিডদগ্ধ মহিলার সংজ্ঞা

প্রতিহিংসা পরায়ণতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ, কোনো দাবি আদায় বা স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কোনো মহিলার শরীরে এসিড বা অন্য কোনো প্রকার দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ অথবা এসিড বা অন্য কোনো প্রকার দাহ্য পদার্থ অসতর্ক ব্যবহার ও অপব্যবহার ইত্যাদি কারণে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকেই বুঝাবে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা

এ কার্যক্রমে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলতে জন্মগত ভাবে, পুষ্টিজনিত কারণে, রোগব্যাধি, ভুল চিকিৎসা, আত্মঘাতী কার্যকলাপ, অগ্নিসংযোগ, ককটেল, বোমা, গোলাবারুদ ইত্যাদি সন্ত্রাসী আক্রমণ বা যে কোনো দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ

- কোনো ব্যক্তির হাত না থাকলে, হাতের কোনো অংশ না থাকলে, হাত পূর্ণ বা আংশিক অবশ থাকলে, হাত দূর্বল বা শক্তিহীন থাকলে;
- কোনো ব্যক্তির দুই পা না থাকলে, এক পা না থাকলে, পায়ের কোনো অংশ না থাকলে, তা পূর্ণ বা আংশিক অবশ থাকলে, পা শক্তিহীন থাকলে;
- কোনো ব্যক্তির শারীরিক গঠন বিকৃত থাকলে;
- কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে শারীরিক স্বাভাবিক ভারসাম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে;
- কোনো ব্যক্তির দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে বাধাগ্রস্ত হলে তাকেই বুঝাবে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা ও সেবা প্রদান

- সমাজ সেবা অফিসারগণ এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ভিকটিমের চিকিৎসার বিষয়ে পরামর্শ, রোগীকে সাহস যোগান ও সুস্থ হওয়ার আশ্বাস দিয়ে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা ও দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- সমাজসেবা অফিসার ও সমাজকর্মীগণ এসিডদগ্ধ ব্যক্তিকে জরুরি ভিত্তিতে স্থানীয় কোনো হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন।
- এসিডে দগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারের কোনো ব্যক্তি এ কার্যক্রমের ঋণ সহায়তা তহবিল থেকে ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ পেতে পারেন।
- এ কার্যক্রমের ঋণগ্রহীতা প্রথমবার ঋণের সাকুল্য অর্থ পরিশোধের পর প্রয়োজনে একাধিকবার ঋণের আবেদন করতে পারবেন। এ ঋণের টাকার উপর ৫% সার্ভিস চার্জ ধার্য করে মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে সমান ১০ কিস্তিতে (কিস্তি ও সার্ভিস চার্জ) পরিশোধের শর্তে ঋণের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। স্কিমের প্রকৃতি অনুসারে এক থেকে সর্বোচ্চ দুই বছর মেয়াদে ঋণ প্রদান করা যাবে এবং ঋণের টাকা প্রদানের ৬ মাস পর হতে কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

ঋণ প্রাপ্তি যোগ্যতা ও শর্তাবলী

- যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু গড় আয় ২০,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে নয় এরূপ পরিবারের এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই এ প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী;
- ঋণের আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/পৌর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে;
- তার নাম অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত হতে হবে;
- স্কিমসহ ঋণের জন্য আবেদন করতে হবে;
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর হতে হবে;
- ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের শর্তাবলী সম্বলিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে;
- ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দরিদ্রতম ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

ঋণগ্রহীতার প্রতি সতর্কতা

- ঋণগ্রহীতার হাতে নগদ টাকা দিয়ে সঠিক আছে কিনা তা দেখে নিতে বলতে হবে;
- বিতরণ শেষে নিরাপদে টাকা নিয়ে বাড়ি যাওয়ার বিষয়ে সর্তক করে দিতে হবে;
- ঋণের টাকা নির্ধারিত স্কিমে সঠিকভাবে ব্যবহার, হিসাব সংরক্ষণ এবং যথা সময়ে কিস্তি পরিশোধের পরামর্শ দিতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

ভাতা প্রাপকদের যোগ্যতা ও শর্তাবলি

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৪,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ;
- ভাতাপ্রাপককে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট এলকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
- বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বাছাইয়ের মানদণ্ড

- ভাতাপ্রাপকের অবশ্যই বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে;
- বাছাইকালে ভাতাপ্রাপকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে;
- ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীগণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে;
- নারী প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- নতুন ভাতাভোগী মনোনয়নে অধিকতর দারিদ্রসংকুল ও অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ বা দূরবর্তী এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- চিকিৎসার লক্ষ্যে গরিব মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু (বয়স শিথিলযোগ্য) এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা

- যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বয়স্কভাতা বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ভাতা পেয়ে থাকেন;
- অবসর প্রাপ্ত কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি পেনশন পান।

ভাতা বিতরণ পদ্ধতি

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতার অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার্থে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকটতম শাখায় পাস বইয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

- অক্ষমতা জনিত কারণে অথবা অন্য কোনো সঙ্গত কারণে কেউ ভাতা গ্রহণে অসমর্থ হলে স্থানীয় ওয়ার্ড সদস্য/কমিশনার/প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা/সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ছবিসহ ভাতাভোগী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন। ভাতাভোগী জীবিত আছেন মর্মে ভাতা গ্রহণের সময় বর্ণিত কর্মকর্তাদের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

এ ভাতা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। তবে কেউ এককালীন ভাতা উত্তোলন করতে চাইলে তিনি নির্ধারিত সময়ের শেষে তা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো অর্থ বছরের জন্য ভাতা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ পরবর্তী অর্থবছরের **৩১** ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তোলন করা যাবে।[২৭]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, নারীগণ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তারা সমাজে বিভিন্ন নির্যাতন ও সহিংসতার স্বীকার। সমাজের এ নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ কল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যারা নারী-পুরুষের সমতা অনয়ন সহ নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধিকার বঞ্চিত নারীদের উন্নয়নে তারা কিছু উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে করে নারীগণ সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশে সরকারী ভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নারীদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা হচ্ছে। যাতে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে।

তথ্যসূত্র

১। *অপরাজিতা*, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার সহায়িকা, প্রকাশক: সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৩ খ্রি. পৃ. ১০-১২
২। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৮
৩। অপরাজিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪০
৪। ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া, পাঠ্য-আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বাংলাদেশের নারীর অবস্থান, *মহিলা সমাচার*, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র ১৪২০, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪ খ্রি. পৃ. ১২
৫। *নারী বার্তা*, একাদশ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রকাশ কাল: কার্তিক-পৌষ: ১৪২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৯-১০
৬। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৭। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২
৮। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫
৯। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রকাশক: ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১২ খ্রি. পৃ. ৪১-৪২
১০। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬
১১। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১
১২। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬
১৩। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭
১৪। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৫। *অপরাজিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৬৪
১৬। *বাংলাদেশের আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ*, প্রকাশক: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১১০-১১১
১৭। *বাংলাদেশের আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০৪
১৮। *বাংলাদেশের আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৯
১৯। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মোঃ তৌহিদুল হক, পত্রিকা: *উইমেন ফর উইমেন, গবেষণা ও পাঠক্রম*, সংখ্যা: ১৫, প্রকাশকাল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১৮-২৩
২০। খলিল মজিদ, প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সম্পাদক, আয়েশা খানম, *মহিলা সমাচার*, বেইজিং +২০ বিশেষ সংখ্যা-২০১৫ খ্রি. পৃ. ১৫২
২১। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২২। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭
২৩। সাইদুর রহমান, সাদিয়া নাসরীন যুথি, *উইমেন ফর উইমেন: গবেষণা ও পাঠচক্র*, সংখ্যা-১৫, প্রকাশকাল: ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৩২-৩৫
২৪। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মোঃ তৌহিদুল হক, পত্রিকা: *উইমেন ফর উইমেন, গবেষণা ও পাঠক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩২
২৫। ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া, পত্রিকা: *মহিলা সমাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
২৬। শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, *সাক্ষরতা বুলেটিন*, সংখ্যা ২১৫, প্রকাশকাল: মাঘ ১৪১৮, জানুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৫
২৭। *পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়: আদর্শ নারীর সন্ধানে; কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

আদর্শ নারীর সন্ধানে; কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

আদর্শ নারী আমাদের ঘরের মধ্যেই আছে। এদেরকে পেতে আমাদের যেখানে সেখানে খুঁজে দেখতে হবে না। যদি মা আদর্শবতী হয় তবে সন্তান আদর্শ শিখবে এটা আশা করা যায়। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে বাবার সম্পদ কিংবা মেয়ের সৌন্দর্যের দিকে না তাকিয়ে কন্যার আদর্শ বা নীতি-নৈতিকতার দিকে আমাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তা হলেই আমরা সর্বত্র পাব উত্তম আদর্শবতী নারী।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সন্তান প্রতিপালন ও পরবর্তী করণীয়

বিবাহিত জীবনে সন্তান সকলেই প্রত্যাশা করে থাকেন। সন্তান জন্মের পর পিতা-মাতার উপর অনেকগুলো দায়িত্ব-কর্তব্য এসে পড়ে যা আল্লাহ প্রদত্ত। সেগুলো যথাযথ ভাবে মেনে সন্তান ভালোভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

রাসূল (স.) বলেছেন,

"যার কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তার উচিত তার জন্য ভাল নাম রাখা এবং তাকে ভাল আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া। আর যখন সে বালেগ বা পূর্ণ বয়স্ক ও বিয়ের যোগ্য হবে, তখন তাকে বিয়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা বালেগ হওয়ার পরও যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, আর এ কারণে সে কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।" [১]

সামর্থবান ব্যক্তির আওতায় থাকা অসচ্ছল ও দাস-দাসীদেরও বিয়ের ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তির করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآىِٕكُمْ١ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۝۳۲

"আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।"[২]

যে ব্যক্তি নিজে স্বচ্ছল ও সামর্থবান তারও উচিত বিয়ে করা। কারণ এটি আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর নির্দেশ। রাসূল (স.) বলেছেন,

"চারটি কাজ নবি গণের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য তা হচ্ছে সুগন্ধি ব্যবহার, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা এবং খাতনা করানো।"[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

"হে যুবক যুবতীগণ! তোমাদের মধ্যে যারাই বিয়ের সামর্থ্যবান হবে। তাদেরই বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে তাদের চোখ বিনত রাখবে। তাদের যৌন অঙ্গ পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখবে। আর যাদের সে সামর্থ্য নেই। তাদের রোযা রাখা কর্তব্য। তাহলে এই রোযা তাদের যৌন উত্তেজনা দূর করবে।"[৪]

কথা বার্তা ও চলাফেরার ক্ষেত্রে নারীদের করণীয়

আমাদের ব্যক্তি জীবনে সঠিকভাবে চলাফেরা করার জন্য আল্লাহ পাক কুরআনে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। যা অনুস্বরণ করলে কেউ বিপথে যাবে না।আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ١ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۝۳۰

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ١ۖ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ

يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ١ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ١ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ٣١

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫]

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স.)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে কুরআন পাকে কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন যা আমাদেরকে অনুস্বরণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا٣٢

"হে নবি–পত্নিগণ! তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।"[৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মেয়ে সন্তানের শিক্ষা

সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে বড় করতে হবে। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করলে ভবিষ্যত প্রজন্ম ভালোভাবে গড়ে উঠবে। সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী ও পুরুষ প্রকৃত ইমানদার হয় ও আল্লাহর হুকুম আহকামকে ভালোভাবে মেনে চলে।

হাদিসের ভাষায় "জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ।" [৭]

আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ۝

"তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"[৮]

কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قِیۡلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُوۡا فِی الۡمَجٰلِسِ فَافۡسَحُوۡا یَفۡسَحِ اللّٰهُ لَكُمۡ ۚ وَ اِذَا قِیۡلَ انۡشُزُوۡا فَانۡشُزُوۡا یَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ۝

"হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, 'মজলিসে স্থান করে দাও', তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"[৯]

পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গে-

দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের আগ্রহ প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। কেননা আগ্রহ ছাড়া মানুষ কোনো শিক্ষাই অর্জন করতে পারে না। নর-নারী প্রত্যেককেই সঠিক ইসলামি জ্ঞান অর্জন করে নিজে ঠিক পথে চলতে হবে ও অন্যকে সঠিক রাস্তা বা উপায় বাতলিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে লজ্জা করলে সঠিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের মধ্যে জন্মাবে না। ফলে পরিপূর্ণ ইসলামি জীবন যাপনে আমাদের ঘাটতি থেকে যাবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলা সাহাবিগণ শরীয়াতের সঠিক শিক্ষা লাভ করতে লজ্জা পেতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে শাকাল (রা.) ঋতুবতী মহিলার গোসল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এজন্য তোমরা প্রয়োজনীয় পানি ও এক টুকরা কাপড় কিংবা তুলা দিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা (রা.) বললেন, এ কাপড় বা তুলা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মনে হচ্ছিল যেন আসমা ব্যাপারটা গোপন করছে। রাসূলুল্লাাহ (স.) বললেন, সুবহানাল্লাহ, তুমি এ কাপড় দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। তুমি রক্তের দাগ গুলি মুছে নেবে।

আসমা (রা.) রাসূলুলল্লাহ (স.)-কে সহবাস পরবর্তী গোসলের ব্যাপারে ও জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পানি নিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে উত্তমরূপে ডলবে যাতে মাথায় সর্বত্র প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছায়। তারপরে আবার পানি ঢালবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আনসারী মহিলাগণ কতইনা ভাল, লজ্জাশীলতা তাদের দীনি ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।"[১০]

জ্ঞান চর্চায় মুসলিম নারী

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও মহিলা সাহাবিগণ জ্ঞান চর্চা ও বিতরণ করে গেছেন। তাদের কাছ থেকে বড় বড় আলেমগণ জ্ঞান অর্জনও করেছেন।

উম্মে আতিয়া (রা.) একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবি ছিলেন। ইলম ও ফযিলতের দিক থেকে তিনি অধিক জ্ঞানী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ হাদিস রিওয়াতের দিক থেকে তাঁকে পুরুষ ও মহিলা সাহাবিদের মধ্যে চতুর্থ তবকার মানুষ বলে গণ্য করেছেন। মাইয়্যিতের (মৃত ব্যক্তি) গোসল দেয়া, মহিলাদের জানাযায় যাওয়া এবং ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদিস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১১]

হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা (রা.)-এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ুব সুখতিয়ানী এবং হাকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[১২]

ইমাম শাফেয়ী (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর নাতনী সাই'য়িদী নাফিসা (রা.)-এর কাছে গিয়ে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[১৩]

আব্দুর রহমান ইবনে শম্মোস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন, ...আমি আমার এই ঘরে বসে রাসূল (স.)-কে যা বলতে শুনেছি তাই তোমাকে বলছি, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো, কিন্তু সে তাদের কষ্টের কারণ সৃষ্টি করলো, তুমিও তাকে কষ্ট দিও। আর যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সে তাদের সাথে কোমল আচরণ করলো, তুমিও তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করো।[১৪]

তাই বলা যায় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নর-নারী ভেদাভেদ নাই। সকলকেই সঠিক দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চলতে হবে। ও অপরকে সঠিকভাবে চলার উপদেশ দিতে হবে। না হলে পরকালে আমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার সম্মুখীন হতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বিয়ের ক্ষেত্রে করণীয়

বৈধ পন্থায় সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের জন্য বিয়ে করা প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ। বিয়ের ক্ষেত্রে মতামত নেয়া ইসলামি শরীয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এ বিষয়ে রাসূল (স.)ও আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর নিম্নোক্ত হাদিস অনুসরণ যোগ্য

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, বিধবা নারী ও কুমারীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না।[১৫]

রাসূল (স.) বলেন, "বিধবার বিবাহ তার সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত হতে পারে না এবং কুমারীর বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। সাহাবিগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি কিরূপে জানা যাবে? তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।"[১৬]

আরো বলেছেন "পূর্বে বিবাহিত, এমন জুড়িহীন মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত মেয়ের বিয়ে হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! তার অনুমতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তখন তিনি বললেন; জিজ্ঞাসা করার পর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।[১৭]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে

বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হবে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা মোতাবেক। শুধু সৌন্দর্য দেখে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন না করে দ্বীনদারী, ইমানদারী ও পরহেজগারীর প্রতি আমাদের গুরুত্ব বেশি দিয়ে নির্বাচন দিতে হবে তাহলে জীবন শান্তিময় ও পূণ্যময় হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ١ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ١ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا١ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ١ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ١ۖۚ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ١ۚ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۝۲۲۱

"আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[১৮]

রাসূল (স.) বলেন, "কেবল সৌন্দর্য দেখেই নারীকে বিয়ে করোনা। কেননা সৌন্দর্য তাদেরকে বিপথগামীও করে দিতে পারে। আর তাদের ধনসম্পদের প্রাচূর্যের জন্যও তাদেরকে বিয়ে করো না। কারণ ধনসম্পদ তাদেরকে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। বরং দ্বীনদারী দেখে নারীদেরকে বিয়ে কর। জেনে রাখ দ্বীনদার হলে একজন অসুন্দর দাসীও ধর্মহীনদের তুলনায় উৎকৃষ্ট।"[১৯]

আল্লাহর কাছে মানুষের ধনসম্পদ ও সৌন্দর্যের কোন মূল্য নেই। মূল্য আছে তার নেক আমলের বা ভাল কর্মের। যার বদৌলতে একজন মানুষ পরকালে সম্মানিত বা অপমানিত হবেন। একজন দ্বীনদার মহিলা তার সন্তানকে উত্তম পন্থায় জন্মদান করেন। ও উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়ে বড় করেন। ফলে সন্তানও ইসলামি জীবন ব্যবস্থা সম্মন্ধে অবহিত হয়ে বেড়ে ওঠে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সাংসারিক জীবনে অধিকার ও কর্তব্য

মানুষ একা চলতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই পুরুষের সঙ্গী হিসেবে নারী সৃষ্টি হয়েছে ও সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে। আর এর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে সাংসারিক জীবন শুরু করা ও পরিচালনা করা। আর এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সেইগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[২০]

ইসলামি জ্ঞান সম্পন্ন পূণ্যবতী স্ত্রী একটি সংসারে শান্তি আনয়নের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাসূল (স.) বলেছেন, "দুনিয়ার সবকিছুই উপকারী এবং তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল পূণ্যবতী স্ত্রী।" [২১]

আর বিয়ের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান আল্লাহর নির্ধারিত পন্থা। যার মাধ্যমে স্ত্রীর সবকিছু স্বামীর জন্য বৈধ হয়। এটি স্ত্রীর ইজ্জতের মূল্য হিসেবেও ধরা হয়। যা স্বামী সারা জীবনের জন্য বৈধপন্থায় ব্যবহার করার অধিকার লাভ করে থাকেন। মোহর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝

"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে খাও।"[২২]

স্ত্রীদের ভরণপোষণ প্রসঙ্গে

স্ত্রীর ভরণপোষণ এর ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। যার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে ও সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন করতে পারে। আর সংসারে খরচ করলে তার বিনিময়েও আল্লাহ সওয়াব দান করেন।

রাসূল (স) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন, "যথাযথভাবে তাদের (নারীদের) পানাহার ও পোষাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর অপরিহার্য।[২৩]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَ لَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَیِّقُوْا عَلَیْهِنَّ ؕ وَ اِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَ اْتَمِرُوْا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰی ۘ ۝

"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর; আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সংগতভাবে তোমাদের মাঝে পরস্পর পরামর্শ কর। আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোন নারী দুধপান করাবে।"[২৪]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لِیُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهٗ فَلْیُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُّسْرًا ۝

"সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিয্ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে। আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশি। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন।"[২৫]

স্ত্রী সহবাস প্রসঙ্গে

বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস করা আল্লাহ বৈধ করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারে ও পূণ্যময় জীবন যাপন করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ١ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ١ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ١ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ١ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۲۲۳

"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন কর, যেভাবে চাও। আর তোমরা নিজদের কল্যাণে উত্তম কাজ সামনে পাঠাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২৬]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ١ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ١ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ١ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ١ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ١ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ١ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ١ۙ فِي الْمَسٰجِدِ١ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا١ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۱۸۷

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"[২৭]

যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে সে আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর নিকট প্রিয় হয়। স্তীদের প্রতি দয়াপরবশ হতে রাসূল (স.) উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন,

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম।"[২৮]

অন্য একটি হাদিসে আছে, "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। [২৯]

স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোন একটা ব্যাপারে আমি চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি কাজটি এভাবে করলে ভাল হতো। আমি তাকে বললাম তুমি এখানে কি চাও? যে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করছি, তাতে তোমার নাক গলাবার দরকার কি? সে বলল হে ইবনে খাত্তাব! তোমার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। তুমি চাওনা তোমার সাথে কেউ বাদানুবাদ করুক। অথচ তোমার মেয়ে স্বয়ং রাসূল (স.)-এর সাথে তর্কবিতর্ক করে। অন্য এক বর্ননায় এসেছে। [৩০] তিনি বললেন, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করব, এতে তোমার অপছন্দের কি আছে? আল্লাহর শপথ, রাসূল (স.)-এর স্ত্রীরাও তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।"৩২

ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে বিয়ের আগে পাত্রী দেখে বুঝে শুনে বিয়ে করা যাতে করে বিয়ের পর অহেতুক বিড়ম্বনায় না পড়তে হয়। বিয়ের পর স্ত্রীর আচার আচরনিক বৈশিষ্ট্যের কিছু বিষয় প্রথমে পছন্দ না হলেও তার সাথে মানিয়ে নিয়ে সংসার করার প্রতি ইসলাম তাগিদ প্রদান করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "কোন মুমিন স্বামী তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন অভ্যাস তার পছন্দ নাও হয়, তবে তার মধ্যে এমন আরো অভ্যাস আছে যা তার কাছে অবশ্যই ভাল লাগবে।"৩৩

হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ রাসূল, একজন স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, তুমি যখন খাবে, তখন তাকে খাওয়াবে, আর তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তখন তাকেও কাপড় পরিধান করাবে। আর স্ত্রীর মুখমন্ডলে কখনও আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে কখনও ঘর থেকে বের করে দিবে না।"৩৪

নবি (স.) আরো বলেছেন, "একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ নারীদের সম্মান করে না। আর কেবলমাত্র নীচাশয় হীনমনা লোক ছাড়া আর কেউ তাদের অবমাননা করে না।"৩৫

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾

"যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তোমরা সৎকর্ম কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।"৩৬

ইনসাফ প্রসঙ্গে

ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিস্থিতির কারণে সামর্থবান লোকদের চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি বলা হয়েছে সকল স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ করতে যেন কেউ মনে কষ্ট না পায়। এমন ইনসাফ করা কষ্টকর হলেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে স্ত্রীগণ পরকালে আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করতে না পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِی الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿۳﴾

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয়

কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।"[৩৭]
আল্লাহ পরবর্তীতে বলেন,

وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

"আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৮]

তৃতীয় হিজরীর সময় ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে পিতৃহারা এতিম সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করে। উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল সেই সময়েই। তাছাড়া ঘরে অসুস্থ অথবা বন্ধ্যা স্ত্রী থাকলে যুক্তিসঙ্গত কারণে মানুষ দ্বিতীয় বিয়ে করে পাপের হাত থেকে ও শারিরীক কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

সাময়িক জৈবিক বাসনা পূরণ কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মুতআ বিবাহ করে নারীকে উপভোগ করে নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারীকে সমাজে অপমানিত, অবহেলিত, অপদস্ত করা ইসলাম পরে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মুতআ বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সংঘঠিত হলেও মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (স.) এ ধরণের বিবাহকে হারাম করেছেন।[৩৯]

স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও কষ্ট না দেওয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ পাক স্ত্রী জাতির সাথে সব সময় ভাল আচরণ করতে বলেছেন, সেটা আমরা হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি। এমনকি তালাক প্রদান ও উদ্দত চলাকালীনও স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۟ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে। তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ নিআমত এবং তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।"[৪০]

রাসূল (স.) বললেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করে তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।"[৪১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূল (স.) বলেছেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে সদুপদেশ দাও।"[৪২]

রাসূল (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রী পরিজনদের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম।"[৪৩]

রাসূল (স.) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া তার উচিত নয়। আর আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, পুরুষের বুকের পাশের বক্র হাড় দ্বারা নারী সৃষ্টি হয়েছে এবং ইহার উপরের অংশই সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি একে একেবারে সোজা করার চেষ্টা কর, তবে ইহা ভেঙ্গে যাবে। আর একে সোজা করতে চেষ্টা না করলে ইহা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব, আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছি।"[৪৪]

তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে আরো বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নারীদের প্রতি সম্মানের সাথে আচরণ করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। কারণ, তারা আমাদের মাতা, কন্যা, ফুফু, খালা ও মামী ইত্যাদি। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মুল্য আছে। কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মুল্যবান ধার্মিক নারী।"[৪৫]

স্ত্রীর সাথে পরামর্শের ক্ষেত্রে

মানুষ একা কোন সিদ্ধান্ত নিলে তার ফল সব সময় ভাল হয় না। আর স্ত্রী স্বামীর সংসার ও সন্তানদের কল্যাণের কথা ভেবে স্বামীকে সব সময় ভাল পরামর্শ দিতে আগ্রহী থাকে। যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে ও সংসার সুখের হয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ١ؕ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا١ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ١ۗ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ١ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا١ؕ وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۝۲۳۳

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মা দেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদেরসন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।[৪৬]

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমণ ও বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূল (স.)-এর সঙ্গে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবি নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় রাসূল (স.) তাদেরকে ঐখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবিদের মধ্যে তার এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নি। এ অবস্থা দেখে রাসূল (স.) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সবকথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবিগণ কাজ করতে লেগে যাবেন। রাসূল (স.) তাই করলেন এবং সাহাবিরাও রাসূল (স.)-কে অনুসরণ করল।"[৪৭]

এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পরামর্শ কাজে লেগেছিল। তাই বলা যায়, স্ত্রীকে নারী হওয়ার কারণে দুর্বল ভেবে অবহেলা না করে সকল কাজ স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে করলে অনেক কল্যাণ সাধিত হয়।

দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে

রাসূল (স.) দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে সাথে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক পারসিক প্রতিবেশী, সে ভাল গোশত রান্না করতে পারত, রাসূল (স.)-এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দিতে এলো। রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহাকে দেখিয়ে বললেন, এ আমার সাথে যাবে না? সে বলল, জী না। রাসূল (স.) বললেন, তাহলে আমার যাওয়া হবে না। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে পুণরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল (স.) বলেন, আয়েশা আমার সাথে যাবে না? সে বলল জী-না। রাসূল (স.) বললেন, তবে আমি যেতে পারছি না। লোকটি পূণরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল (স.) বললেন, আয়েশা কি যাবে? এবার তৃতীয়বারে লোকটি বলল, জী হ্যাঁ। এরপর তাঁরা উভয়েই উঠলেন এবং একে অপরের পেছনে পেছনে সে লোকটির গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন।[৪৮]

নিজের হাটুর উপর স্ত্রীকে আরোহণ

রাসূল (স.) স্ত্রীকে এত ভালবাসতেন ও মর্যাদা দিতেন যে, তাঁর তুলনা হয় না। তিনি স্ত্রীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সম্মানসহ তাঁর সাথে নিয়ে সফরে যেতেন ও ফিরে আসতেন।

হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...তারপর আমরা খায়বর থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে রাসূল (স.)-কে তার স্ত্রী সাফিয়া (রা.)-এর জন্য বাহনের পিছনে পর্দা টানাতে দেখলাম। এরপর তিনি উটের কাছে বসে নিজ হাঁটুদ্বয় স্থাপন করলে সাফিয়াহ (রা.) তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে অরোহণ করলেন।[৪৯]

তিনি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে খেলা দেখতেন

স্ত্রীর সাথে আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন রাসূলের (স.) পছন্দ ছিল। এমনকি তিনি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে খেলাও দেখতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন ছিল ঈদের দিন। কতিপয় হাবশী চামড়ার ঢালও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। সে সম্পর্কে হয়তোবা আমি রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি বা তিনি নিজেই বলেছেন, তুমি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ, এরপর তিনি আমাকে তার পিছনে দাড় করিয়ে দিলেন। তখন আমার গাল তাঁর গালের সাথে মিলানো ছিল। এ সময় তিনি বলে চলছিলেন, হে বনী আরফেদা খেলা চালিয়ে যাও। এরপর যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এখন যাও।[৫০]

অসুস্থ স্ত্রীর ক্ষেত্রে করনীয় প্রসঙ্গে

মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসূল মুহাম্মদ (স.) যিনি স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। অসুস্থ স্ত্রীর সেবার প্রতি তিনি উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এ সংক্রান্ত একটি হাদিস নিম্নরূপ:

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, বদর যুদ্ধে উসমান রাযী আল্লাহু আনহু এর অনুপস্থিতির কারণ হচ্ছে তাঁর স্ত্রী (রাসূল (স.)-এর কন্যা) রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাই রাসূল (স.) তাকে বললেন, বদর অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান, তোমার ও সেই প্রতিদান।[৫১]

ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে আমাদের সকলের উচিত সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। তাহলেই আমাদের পারিবারিক জীবন শান্তি ও সুখময় হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মা হিসেবে কর্তব্য পালন ও প্রাপ্য অধিকার প্রসঙ্গে

মানব জাতির জন্মলাভ মায়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে ও মায়ের কাছেই সন্তানের সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশ লাভ হয়। যা অন্যদের দ্বারা সেভাবে সম্ভব হয় না, যা আমাদের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا ﴿۲۴﴾

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।"[৫২]

মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ وَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।"[৫৩]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মাতাপিতার জন্য কিভাবে দোয়া করতে হবে সে প্রসঙ্গে বলেন,

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।[৫৪]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ وَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۵﴾

"আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা–পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।"[৫৫]

একদা জাহেমী নামক এক সাহাবি রাসূল (স.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি যিহাদে যোগদান করতে চাই। এই বিষয়ে আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি। তখন নবি (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? সে বলল হ্যাঁ। তখন নবি (স.) বললেন, তুমি মায়ের নিকট থাক, কেননা মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত।[৫৬]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতার সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম আহকাম এবং হেদায়েত মানা অবস্থায় সকাল করল সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করল। যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়েত অমান্য করল, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতাপিতার মধ্যে কোন একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স.) যদি মাতাপিতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে থাকেন, তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।” [৫৭]

দুনিয়ার জীবনে মানুষের সাথে কিভাবে আচার ব্যবহার করতে হবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন যার পথে আছে মাতা পিতার স্থান।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اعْبُدُوا اللهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ
وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿٣٦﴾

“তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতাপিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।”[৫৮]

রাসূল (স.) বলেছেন, “মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।”[৫৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা, তিনি বললেন, অতপর কে? তিনি বললেন তোমার মা? লোকটি আবার বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি আবার বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন তোমার বাবা।[৬০]

পিতামাতার প্রতি করণীয় প্রসঙ্গে

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রা.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বসা ছিলাম এমন সময় এক মহিলা এসে তাকে বলল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম, এখন তিনি মারা গেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমার দানের প্রতিদান অবধারিত। আর উত্তরাধিকার হিসেবে তুমি তা ফেরত পাবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তার এক মাসের রোযা বাকী আছে, আমি কি তা আদায় করব? তিনি বললেন, তা আদায় কর। সে বলল, তিনি কখনও হজ্জ করেননি, তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? তিনি বললেন তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।[৬১]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি, বলেন একবার জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মানতের রোযা রাখার আগেই ইন্তিকাল করেছেন, এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা কারো কাছে ঋণী থাকত, তাহলে তুমি তা পরিশোধ করে দিলে তা কি পরিশোধ হতো? সে বলল হ্যা তাতো হত। তিনি বললেন, তাহলে তার পক্ষ থেকে রোযাও রাখ।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

হাদিসে মাতার প্রাধান্য বিষয়ে

জনৈক সাহাবি যিনি তার স্ত্রীকে নিজ জননীর উপর কিছুটা প্রাধান্য দিয়ে থাকতেন এবং মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠ করতে অপারগ হচ্ছিলেন, এ সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে অবস্থান করছিলাম, এমন সময় জনৈক আগন্তুক এসে বললেন, মৃত্যু পথযাত্রী এক যুবক খুবই কষ্ট করে, শ্বাস গ্রহণ করছে, সে মুহূর্তে তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে বলা হলে সে কালিমা পড়তে পারেনি। রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, সে সালাত আদায় করতো কি? লোকটি উত্তর দিলো সে সালাত আদায় করতো। এরপর রাসূল (স.) উঠে রওয়ানা করলেন আমরা তার সাথে গেলাম। রাসূল (স.) যুবকের কাছে প্রবেশ করে, তাকে কালিমা পাঠ করতে বললেন। যুবকটি বললেন, আমি উচ্চারণ করতে অপারগ। রাসূল (স.) উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম হবার উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে কি? জনৈক ব্যক্তি বলল, সে তার মায়ের অবাধ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তাকে ডেকো আনো। এরপর মহিলা উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ যুবকটি আপনার ছেলে? মহিলা বললেন হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স.) মহিলাকে বললেন, যদি এখানে আগুনের কুণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়, আর আপনাকে বলা হয়, আপনি তার জন্য সুপারিশ করলে আমরা তাকে মুক্তি দেবো নতুবা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো-তাহলে কি আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন? মহিলা বললেন অবস্থা এমন হলে আমি তার জন্য অবশ্যই সুপারিশ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন। তাহলে আপনি আল্লাহ এবং আমাকে স্বাক্ষী রেখে বলুন। আমি তার প্রতি সন্তু।" তখন মহিলা বললেন, হে আল্লাহ আমি আপনাকে এবং আপনার রাসূল (স.)-কে স্বাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট।" তখন রাসূল (স.) বললেন এই ছেলে বল, 'লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়ায়েদ লা-শারীকা লাহ-ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তখন সে যুবক তা বলতে সমর্থ হলো। সে সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বললেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন। অতএব উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, মাতার উপর অন্য কোন সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া সন্তানের জন্য সঠিক হবে না। এবং মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মুক্তির পথ সন্তানের জন্য সুগম হবে।[৬৩]

রাসূল (স.) বৃদ্ধাবস্থায় মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক), ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি কে? প্রতি উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতা বা পিতা অথবা উভয়কে বৃদ্ধা অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করল না। অর্থাৎ মাতাপিতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করল না তাদের ধ্বংস হোক।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ অন্যান্য সম্পর্কগত দিক দিয়ে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য

নারী সর্বত্রই সম্মানের অধিকারী। মাতা এবং স্ত্রী ছাড়াও কন্যা ও বোন হিসেবে নারীদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। এমনকি নারী দাসীদের প্রতিও উত্তম আচরণ এর প্রতি রাসূল (স.) বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বাদী দাসীদের সম্মান প্রসঙ্গে

মহানবি (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তির অধীনে কোন বাদী-দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করবে তাহযীব তামাদ্দুন, শিল্প-সাহিত্য দ্বারা সুসজ্জিত করবে এবং তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ সূত্রে বরণ করে নিবে, সে দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করবে।"[৬৫]

কন্যাদের সাথে উত্তম অচরণ প্রসঙ্গে

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মানুষ লজ্জায়, ঘৃণায় অপমানে মুখ লুকাতে চাইত। যার কারণে নারী জাতির সম্মানে কুরআনে ও হাদিসে বহু দিক নির্দেশনা ও ফজিলতের কথা এসেছে। যাতে করে মানুষ মেয়ে শিশুর জন্মকে খারাপ চোখে না দেখে।

নবি করীম (স.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে সবচেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সাদকার কথা বলব না? তাহলো তোমার ঐ কন্যা যে বিধবা হওয়ার কারণে অথবা তালাক দেওয়ার কারণে তোমার কাছে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার জন্য উপার্জনকারী বা দায়িত্ব গ্রহণকারী আর কেউ নেই।[৬৬]

বোন হিসেবে মর্যাদা

অনেক পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাসন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। তখন ভাইয়েরা তাদের বোনদেরকে বোঝা মনে করে থাকে। ভাইয়েরা যেন খুশি মনে আল্লাহর প্রতিদানের আশায় বোনদেরকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করে সে প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি দুই বা তিন বোন প্রতিপালন করলো, আমি এবং সে অত্যন্ত কাছাকাছি থাকবো এবং মধ্যমা এবং তর্জনা আঙ্গুলদ্বয় ইঙ্গিত করে দেখালেন।[৬৭]

ইসলাম বোন হিসেবে নারীকে অধিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা দান করেছে। এ সম্পর্কে উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, হযরত জাবির (রা.)-এর পিতা তাকে বললেন, বৎস! হয়তো এ যুদ্ধেই আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণ কামিতার অসিয়ত করছি। এরপর হযরত জাবির (রা.) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও তার বোনদের দেখাশুনার জন্য একজন বয়স্ক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলেন। নবি করীম (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন অর্থাৎ আমার নয়টি বোন আছে। তাদের দেখাশোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি তাদের মত একজন অনভিজ্ঞ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। তাই এমন একজন নারীকে বিয়ে করেছি, যে তাদের চুল চিরুণী করে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। নবি করিম (স.) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ।[৬৮]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সম্মান জনক অবস্থানে রয়েছে। এমনকি কোথাও কোথাও পুরুষের চেয়ে বেশি মর্যাদা তারা লাভ করেছেন যা আল-কুরআন ও আল-হাদিস এর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। নারী মাতা, নারী কন্যা, নারী ভগ্নি, নারী স্ত্রী প্রভৃতি স্পর্শকাতর জায়গায় স্থান গুলো নারী সমাজ সম্মান জনক ভাবে অধিকার করে রয়েছে। সন্তান জন্মদান, প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে সাংসরিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে আল-কুরআনে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যার যার অনুকরণ ও অনুস্মরণ এর মাধ্যমে সমাজ ও সংসারকে একজন নারী উপহার দিতে পারে যোগ্য ও আদর্শবান সন্তান ও যোগ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। প্রত্যেক শিশুই তার মায়ের কাছ থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে থাকে ও পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়। তাই পুরুষের তত্তাবধানে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত নারীই যোগ্য সমাজ গঠনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যসূত্র

১। আবু বক্কর আহমাদ ইবন হুসাইন, আল-বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা*, "মক্কা" মাকতাবাতু দারিল বায, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৪ খ্রি.
২। আল-কুরআন, ২৪: ৩২
৩। তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৬
৪। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮০
৫। আল-কুরআন, ২৪: ৩০-৩১
৬। আল-কুরআন, ৩৩: ৩২
৭। মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৮। আল-কুরআন, ৩:৭
৯। আল-কুরআন, ৫৮:১১
১০। মুসলিম, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ১৭৯
১১। তালিবুল হাশেমী, *প্রাগুক্ত*, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৩২৬
১২। ইবনে হাজার আল আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬
১৩। ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল আইয়ান*, খ. ২, মিশর: আল মাতবা আতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হি. পৃ. ১২৯
১৪। মুসলিম, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ৭
১৫। আল মুসনাদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৪৬৯
১৬। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭১
১৭। বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৫১৩৬
১৮। আল-কুরআন, ২: ২২১
১৯। ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৫৯
২০। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০
২১। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০২
২২। আল-কুরআন, ১৬: ৯৭
২৩। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০১
২৪। আল-কুরআন, ৬৫:৬
২৫। আল-কুরআন, ৬৫:৭
২৬। আল-কুরআন, ২:২৩৩
২৭। আল-কুরআন, ২:১৮৭
২৮। সুনানে ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৯৭৭ এবং সহীহ জামে আস সগীর, হাদিস নং ৩৩০৯।
২৯। আইশা লেমু ও ফাতিমা হিরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী*, বাংলাদেশ ইনষ্টি: অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা-২০০২ খ্রি. পৃ: ২৫।
৩০। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৯১; মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৪
৩১। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৮৩; মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯০
৩২। আল-কুরআন, ৪:১৯
৩৩। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৯১
৩৪। আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪
৩৫। আব্দুর রউফ আল মানাভী, *ফায়যুল কাদীর*, ৩য় খণ্ড, মিশর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হি.পৃ. ৪৯৬
৩৬। আল-কুরআন, ৪:১২৮

৩৭। আল-কুরআন, ৪:৩
৩৮। আল-কুরআন, ৪:১২৯
৩৯। হাফেজ মাসউদ আহমাদ (মাসুম), নারীর প্রকৃত মর্যাদা একটি প্রামাণ্য আলোচনা, *মাসিক মদীনা*, জুন ২০০২ খ্রি. সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা, পৃ. ৪৯-৫০
৪০। আল-কুরআন, ২:২৩১
৪১। আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৪২। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৭৭৯
৪৩। সুনানে ইবনে মাযাহ, বিবাহ অধ্যায়, দেওবন্দঃ রশিদিয়া কুতুবখানা, পৃ. ১৪৩
৪৪। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭৯
৪৫। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮১
৪৬। আল-কুরআন, ২: ২৩৩
৪৭। বুখারী, ফি সিরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন, পৃ. ১৯১ এর বরাত দিয়ে মাওলানা আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৪৮। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১৬
৪৯। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০
৫০। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৯৫, মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২
৫১। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬০
৫২। আল-কুরআন, ১৭: ২৩-২৪
৫৩। আল-কুরআন, ২৯: ৮
৫৪। আল-কুরআন, ৩১: ১৪
৫৫। আল-কুরআন, ৪৬:১৫
৫৬। নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২১
৫৭। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮৮
৫৮। আল-কুরআন, ৪:৩৬
৫৯। ডঃ মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী, "নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.) পর্যালোচনা।" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ, ২০০১ খ্রি. পৃ. ৪৫
৬০। বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৫৯৭১
৬১। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৬
৬২। বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৮। মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৬
৬৩। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.
পৃ. ৭৬-৭৭
৬৪। মিশকাতুল মাসাবিহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯ খ্রি. .পৃ. ১৩৭৬
৬৫। তিরমীযি, অনু.ই.ফা.বা, *কিতাব আল নিকাহ্*, পৃ. ৪০০, হাদিস নং ১১২৭
৬৬। ইব্ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০৯-১০
৬৭। আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৪৭-১৪৮
৬৮। হাকিম নিশাপুরী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২০৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানব জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে রাসূল (স.) আমাদেরকে যে দিকনির্দেশনা প্রদান করে গিয়েছেন, তার যথাযথ অনুকরণ ও অনুস্বরণ এর মাঝেই রয়েছে মানব জাতির যথার্থ কল্যাণ ও মঙ্গল। এর অনুস্বরণের মাধ্যমে জাতি পাবে সঠিক দিশা। ফলে তাদের দুনিয়াবী জীবন হবে সম্মানজনক ও পরকালীন জীবনে তারা লাভ করতে পারবে চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা জান্নাত। একটু শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপনের মাধ্যমে তার অনন্তজীবন হবে সম্মানজনক ও শান্তিময়। হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন মানব জাতির শিক্ষক ও আমরা হলাম তার সম্মানিত উম্মত যাদের সম্মান ও মর্যাদা সব জাতির উপরে। আর আল-কুরআন হচ্ছে আমাদের জীবন পরিচালনার পথ-নির্দেশনা যা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত। যা আমাদেরকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সঠিকভাবে জীবনকে পরিচালনার সঠিক তথ্য প্রদান করে। যার নিয়মিত তেলাওয়াত ও অনুশীলন আমাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে ও আমাদের ইমানকে মজবুত করে। বারবার পাঠ করলেও যা আমাদের কাছে মধুর থেকে মধুরতর হয় ও আমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। ফলে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের প্রলোভনও আমাদের ইমানকে নষ্ট করতে পারে না। আল-কুরআন নির্দেশিত উত্তম আচরণ নীতি অনুস্বরণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি সমস্ত বিশ্বের প্রিয় ও অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হতে পারে। সে উদ্দেশ্যেই আমি আমার গবেষণা কর্ম আল-কুরআনের আলোচনা দিয়েই শুরু করেছি। যার ধারাবাহিক আলোচনায় আল-কুরআনের পরিচয়, অবতরণ, সংরক্ষণ, মুদ্রণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যার ফলে আল-কুরআনের প্রতি মানুষের জানার আগ্রহের কিছুটা হলেও পরিতৃপ্তি আসবে। বাকিটা তারা নিজেরা জেনে নিতে পারবে।

নারী অর্ধাঙ্গী ও পুরুষের উত্তম সঙ্গী। একজন নারীর মাধ্যমেই মানব শিশু প্রথমে পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। যে কোন শিশু মাতৃগর্ভে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে যেভাবে নিরাপদে পরিপূষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করে। টেষ্টটিউব বেবি বা অন্য পদ্ধতিতে জন্ম নেয়া শিশুর সেই নিরাপত্তা থাকে না। আর যতই টেষ্টটিউবের মাধ্যমে মানব শিশু জন্ম দেয়া যাক না কেন তার জন্য প্রয়োজন একজন নারীর ডিম্বাণু অর্থাৎ টেষ্টটিউব বেবির আদি ইতিহাস জানলেও একজন মায়ের দেয়া ডিম্বাণু তথ্য বের হয়ে আসবে। তারপর দেখা যায় মাতৃগর্ভে বড় হওয়া শিশু ও টেষ্টটিউব বেবির মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠা ও জন্ম নেয়া শিশু পরিপুষ্ট, নিরোগ, মেধাবী, বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও আল্লাহ প্রদত্ত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে ওঠে যা টেষ্টটিউব বেবির মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত থাকে। তারা খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বেড়ে ওঠে ও সারাটি জীবন অতিবাহিত করে। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার করলেও আমরা ডি.এন.এ তথ্য সম্পর্কে এগুলো জানতে পারি। একটি শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের আচরণিক বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধারণ করে বড় হতে থাকে। জন্মের পর সে প্রাথমিকভাবে মায়ের দেয়া শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকে যা তার মধ্যে চিরস্থায়ী আচরণিক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সমাজ বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তার প্রাথমিক শিক্ষিকা মায়ের দেয়া আচরণিক বৈশিষ্ট্যের ততো পরিবর্তন করতে পারে না। সে হয়তো কিছুটা সময় অভিনয় করতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যে আমি আছে, সেই আমিকে সে পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারে না। তাই মাকে হতে হবে পরিপূর্ণ ইসলামি জ্ঞান সম্পন্ন। তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। তাই আমি আল-কুরআনে নারীদের করণীয় ও বর্জণীয় দিক নির্দেশনা, নারীদের সম্মান বিষয়ে আল-কুরআনের আলোচনা এবং আল-কুরআনে আলোচিত নারীদের সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যাতে করে এ বিষয়ে জেনে পালন করতে নারীগণ উৎসাহী হন।

যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী অবজ্ঞা, অবহেলা ও লাঞ্চনার পাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। যা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। নারী সর্বকালেই ছিল মানুষের প্রয়োজন পূরণের হাতিয়ার, সম্মান বা স্বাধীনতা বলে তাদের জন্য কিছু ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষগণ তাদেরকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে প্রয়োজন ফুরালে ছুড়ে ফেলে দিত অথবা তাদের উপর চালাত অকথ্য নির্যাতন। কন্যা শিশু জন্মাবে এ বিষয়টি বুঝতে পারলে তারা ভ্রুণ নষ্ট করে ফেলত ও জন্মের পর তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। এমনকি নিজের স্ত্রীকে মানুষ জুয়া খেলায় বাজী রাখত ও মাঝে মধ্যে স্ত্রী বিক্রির ও ঘটনা ঘটত। নারীর নিজস্বতা ও নিজস্ব সম্পদ বলে কিছু আছে একথা কোন কোন ধর্ম ও সভ্যতা স্বীকার করত না। নারী জন্মের পর পিতার, তার মৃত্যুর পর ভাইয়ের এরপর স্বামীর এবং পরবর্তীতে ছেলের দাসী বাদী হিসেবে পরিগণিত হত। শান্তি ও সম্মান বলে তাদের ভাগ্যে তেমন কিছু জুটত না। মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের পূর্বেও নারীদের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর মাধ্যমে নারীকে দিলেন পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা। নারী পিতার প্রিয় কন্যা, ভাইয়ের আদরের বোন, স্বামীর প্রিয় স্ত্রী, সন্তানের সম্মানিতা মাতা এবং পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সম্মানজনক অবস্থান লাভ করলেন। সমাজের পুরুষের উপরে নারীদের ভরণ-পোষণ, সম্মান ও নিরপত্তার দায়িত্ব বর্তাল। ফলে নারী পেল আত্মমর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মান। এভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে নারী যে আস্থা, ভালবাসা ও মর্যাদা লাভ করল পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম কোন কালে নারীকে সেই নিরাপত্তা ও নির্ভরতা দান করতে পারে নি। ইসলাম মাতাকে পিতার চেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে যা অন্য কোন ধর্মে দেয়া হয়নি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী বর্তমানে সম্মানজনক অবস্থায় আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী নেতৃত্ব ও অন্যান্য পেশায় নারীদের অবস্থা অবলোকন করে আমরা সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারি। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্যে নারীগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, নিউইয়র্ক, জার্মানী, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নারীগণ নিজেদের সম্মান ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিভিন্ন মিটিং, মিছিল ও অন্যান্য কর্মসূচীতে যোগদান করতে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ নারীদেরকে বিভিন্ন অধিকার প্রদানসহ ৮ই মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। Srimavo Bandaranaike, Benazir Bhutto, Indira Gandhi, Aung sun suukyi, peron Isabelita, Margaret Hilda Thatcher এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সবার কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

নারী জাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও আইনী ঝামেলায় জর্জরিত ছিল। বর্তমানেও এ সমস্যা থেকে তারা পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। তাই আমি নারীদের সম্বন্ধীয় কিছু আইন সম্পর্কেও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যার ফলে নারীরা অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে নিজেদের অধিকার সম্মন্ধে সচেতন হতে পারবে ও প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারবে। আমি বিশ্বের বরেণ্য কয়েকজন নারীদের বর্ণনাও তুলে ধরেছি যার ফলে নারীরা নিজেদের যোগ্যতা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজেরা পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা রক্ষায় সচেতন হবে। তারা জানতে পারবে কিভাবে নারীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় ও সম্মানিত করতে পেরেছে। ফলে তারা নিজেরা সচেতন হয়ে নিজেদেরকে ও তাদের কন্যা সন্তানদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় বড় করে তুলবে।

বাংলাদেশের নারীগণ বর্তমানে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে শহর পর্যায় পর্যন্ত নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ে নারী। নারীগণ শিক্ষিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার প্রামাণ দিয়ে চলেছেন। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এদেশের নারীরা এখন আর পিঁছিয়ে নেই। তারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করছে ও নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে।

তবে নারীদের এই অর্জন একদিনের নয়। যুগ যুগ ধরে নারীদের প্রচেষ্টা তাদেরকে এ অবস্থানে আসতে সহযোগিতা করেছে। নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, অবিভক্ত বাংলায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নারী সমাজের অবদান, পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কেও কিছু বিষয় এখানে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের জন্য বিশেষ অধিকার আছে এবং নারী অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলোও আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও বাংলাদেশের বরেণ্য কিছু নারীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যাতে করে বর্তমান সমাজের লোকেরা কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে।

যুগ যুগ ধরে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানব সম্প্রদায় নারী জাতিকে কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। যা থেকে আজও তারা পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। অতীতে নারী নিয়ে কিছু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যা জানার সুবিধার্থে আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমানেও আমাদের দেশে, সমাজে ও পরিবারে নারীগণ কুসংস্কারের ছত্রছায়ায় নিজেদেরকে পরিচালিত করে আসছে। এটাকে রীতি বা প্রথা হিসেবেও অনেকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু ইসলাম কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। তাই কুরআনের ও হাদিসের কিছু তথ্য আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে করে মানুষ কিছুটা হলেও সচেতন হতে পারে এবং নিজেদেরকে শুধরানোর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। তাহলে তারা নিজেদের প্রতি যত্নবান হবে ও আল্লাহর উপর ভরসা করে চলবে। বর্তমানেও কুসংস্কারের প্রভাবে নারীগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানে না। আবার জানলেও পরিবার ও সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের ভয়ে তারা সে সম্পর্কে বলতে বা নিজেদের অধিকার আদায় করতে ভয় পায়। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে যে সম্মান ও অধিকার দান করেছে এটা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান রাখা দরকার। তাই আমি এ অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে কিছু সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে তুলে ধরেছি। যাতে করে তারা সচেতন হতে পারে ও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের যুক্তির আলোকে অন্যদেরকে বোঝাতে পারে। ফলে তারা আরো সম্মানজনক অবস্থায় নিজেদেরকে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

আমি বর্তমানে দৃশ্যমান নারী সহিংসতার ধরণ সম্পর্কেও কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নারীদের পক্ষে প্রচলিত আইন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়ে নারীদেরকে সচেতন করার চেষ্টাও করেছি। নারী সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যে সম্পর্কে অধিকাংশ নারীই অবগত নয়। তাই আমি কিছুটা হলেও এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের সমতা আনয়নে বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নও এখন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নারীগণ নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও নারী উন্নয়নে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারীদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে, যে সম্পর্কে মানুষের অবহিত হওয়া দরকার। আমি সে বিষয়ে কিছুটা তথ্য এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে করে অন্যেরা এগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।
আল-কুরআন ও আল-হাদিসে বহু পূর্বেই নারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সন্তান জন্মদান, প্রতিপালন, ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা কিভাবে দিতে হবে। সংসারিক জীবনে নারীর অধিকার ও কর্তব্য এবং মা হিসেবে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রাপ্য অধিকার, অন্যান্য সম্পর্কগত দিক দিয়ে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আমি আমার অভিসন্দর্ভে কিছু আলোচনা করেছি। যাতে মানুষ এ বিষয়ে জেনে বুঝে চলতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও সংসারকে শান্তির আধার হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুরআন

১.	আল-কুরআনুল করীম	সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইফা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ খ্রি. ।
২.	আল-কুরআনুল কারীম (সরল অর্থানুবাদ)	সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: আল বায়ান ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ আগস্ট-২০০৮ খ্রি. ।
৩.	কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ	হাফেজ মুনিরউদ্দীন আহমদ, লন্ডন: আল কোরআন একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রি. ।

তাফসির ও উসূলে তাফসির গ্রন্থসমূহ

১.	আত-তাবারী,	মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আবূ জা'ফর আল-ফারিসী (২২৪-৩১০ হি.); *জামিউল বায়ান;* বৈরূত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম প্রকাশ ২০০০ খ্রি. মোতাবেক ১৪২০ হিজরী।
২.	আত-তাবারী,	মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আবূ জা'ফর আল-ফারিসী (২২৪-৩১০ হি.); *তাফসীরে তাবারী শরীফ* (বঙ্গানুবাদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩ খ্রি. ।
৩.	আবুল ফিদা,	ইসমাঈল হাক্কী বিন মুস্তাফা আল-ইস্তানবূলী (মৃ. ১১২৭ হি.); *রুহুল বায়ান,* বৈরূত, দারুল ফিকর, ১৩৩০ হি.।
৪.	আল-যারকাশী,	ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৯৪ হি.), *আল-বুরহান ফী উলুমুল কুরআন,* বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াউল কুতুবুল আরাবিয়্যা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭ খ্রি. ।
৫.	আলুসী,	শিহাবুদ্দীন মাহমূদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-হুসাইনী (মৃ. ১২৭০ হি.); *রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআন;* বৈরূত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ হিজরী।
৬.	আশরাফ আলী থানভী;	*তাফসীরে আশরাফী;* ঢাকা, এমদাদীয়া লাইব্রেরী প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ খ্রি. ।
৭.	আশশি'রাবী,	মুহামআদ মুতাওয়াল্লি (মৃ. ১৪১৮ হি.), *মু'জিজাতুল কুরআন,* কায়রো: আল-মুখতারুল ইসলামি, ১ম সংস্করণ ১৩৯৮/১৯৭৮ খ্রি. ।
৮.	ইবনু কাছীর,	আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার আদ-দামেশকী (৭০১-৭৭৪ হি); *তাফসিরুল কুরআনিল 'আযীম;* বৈরূত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশ ২০০৭ খ্রি. ।
৯.	ইবনু কাছীর,	আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার আদ-দামেশকী (৭০১-৭৭৪ হি); *তাফসীরে ইবনে কাসীর,* ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (অনুদিত), ঢাকা: তাফসির পাবলিকেশন কমিটি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ খ্রি. ।
১০.	কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন,	*কানযুল ইরফান ও মোখারুত তাফসির*, চট্টগ্রাম: আঞ্জুমান প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ খ্রি. ।
১১.	কুরতুবী,	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আবূ আব্দুল্লাহ আন্দালুসী (৬১০-৬৭১ হি.), *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন,* কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৪/১৯৬৪ খ্রি. ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ড. আব্দুর রহমান আনোয়ারী, তাফসিরুল কুরআন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ২০০২ খ্রি. ।

১৩. ড. মাজহার উদ্দীন আহমদ, শাহনুর কুরআন শরীফ; ঢাকা: তাজ কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩ খ্রি. ।

১৪. তাকী উসমানী, আল্লামা মুহাম্মদ, *উলুমূল কুরআন ও উসুলে তাফসির*, অনুবাদ: মাওলানা উসমান আবদুল খালেক, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ২০০৫ খ্রি. ।

১৫. তাকী উসমানী, আল্লামা মুহাম্মদ, *উলুমুল কুরআন*, দেওবন্দ: কুতুবখানা নাযিমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ খ্রি. ।

১৬. দরিয়াবাদী, আবদুল মাজেদ; *তাফসীরে মাজেদী শরীফ* (ওবাইদুর রহমান মল্লিক কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি. ।

১৭. পানিপথী, কাজী ছানাউল্লাহ, *তাফসীরে মাজহারী*, অনুবাদ: মাওলানা তালেব আলী, নারায়ণগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ খ্রি. ।

১৮. ফখরুদ্দীন রাযী, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আল-হাসান (মৃ. ৬০৬ হি.) *তাফসিরুল কাবীর*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ ১৪২০ হি. ।

১৯. ফখরুদ্দীন রাযী, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আল-হাসান (মৃ. ৬০৬ হি.) *তাফসীরে কাবীর (বঙ্গানুবাদিত)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২০০৭ খ্রি. ।

২০. ফাযলুল করীম আনওয়ারী, *উম্মুল কুরআন*, ঢাকা: ১৯৬৮ খ্রি. ।

২১. বালাযুরী, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল হাসান আল-বাগদাদী (মৃ. ২৭৯ হি.); *ফুতূহুল বুলদান*, বৈরূত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩ খ্রি. ।

২২. মান্না আল-কাত্তান, ফী উলুম আল-কুরআন, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, সংস্করণ-২৬, ৯১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. ।

২৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী; *তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন (মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি. ।

২৪. মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬ খ্রি. ।

২৫. মোহাম্মদ তাহের, *আল কোরআন তরজমা ও তাফসির*, মদনী মিশন: কলকাতা: প্রথম প্রকাশ ১৯৭১ খ্রি. ।

২৬. মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম, *তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ*, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮ খ্রি. ।

২৭. মোহাম্মদ হাদিসুর রহমান, *আনওয়ারুত তানযীল*, ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯ খ্রি. ।

২৮. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন *দরসে কুরআন করীম*, চট্টগ্রাম: তৈয়্যবিয়া একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ খ্রি. ।

২৯. শামসুল হক *তাফসির আহকামুল কুরআন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, প্রথম

দৌলতপুরী, প্রকাশ ১৯৯৩ খ্রি. ।

৩০. শামছুল হক ফরিদপুরী, *হাক্কানী তফছীর*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২ খ্রি. ।

৩১. শিববির আহমাদ উসমানী; *তাফসীরে ওসমানী*, ঢাকা: আল কোরআন একাডেমি লন্ডন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ খ্রি. ।

৩২. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *তাফসির ফী যিলালিল কুরআন*, বৈরুত: দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২ খ্রি. ।

৩৩. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *তাফসির ফী যিলালীল কুরআন*, লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমি, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, খ.২, ১৯৯৮ খ্রি. ।

৩৪. সুফিয়ান সাওরী, আবূ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন মাসরূক (মৃ. ১৬১ হি.) *তাফসিরুস সাওরী*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩ খ্রি. ।

৩৫. সুবহি সালিহ ডক্টর, মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াত তুরাছিল আরাবী, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ খ্রি. ।

৩৬. সুয়ূতী, আব্দুর রহমান আবূ বাকর জালালুদ্দীন (মৃ. ৯১১ হি.); *ফাতহুল কাবীর*, বৈরূত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হিজরী মোতাবেক ২০০৩ খ্রি. ।

আল-হাদিস, শরাহ্ ও উসূলে হাদিসের গ্রন্থসমূহ

১. আনোয়ার শাহ, ইবন মু'আয্যাম শাহ্ কাশ্মীরি, (মৃ. ১৩৫৩ হি.); *ফয়জুল বারী*, পাকিস্তান: আল-মাতবুয়াতে ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ খ্রি. ।

২. আবূ দাঊদ, সুলাইমান বিন আস'আস বিন ইসহাক (মৃ. ২৮৫ হি.); *আস-সুনান;* দামেশ্ক, দারুর রিসালাতুল 'আলামিয়্যাহ; প্রথম প্রকাশ ২০০৯ খ্রি. ।

৩. আল-খতীব, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-উমারী আবূ আব্দুল্লাহ্ ওয়ালিউদ্দীন আত-তিবরিযী (মৃ. ৭৪১ হি.); *মিশকাত;* বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি. , তাহকীক: নাসীরুদ্দীন আলবানী।

৪. আলবানী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর বিন হায়্যান আল-আনসারী (মৃ. ১৪২০ হি.); *সিলিসিলাতুল আহাদিসুস সহীহাহ*, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'রিফাহ লিন্নাশর ওয়াত তাওযী', প্রথম প্রকাশ, ১-৪র্থ খণ্ড ১৯৯৫ খ্রি. , ৫ম খণ্ড ১৯৯৬ খ্রি. , ৬ষ্ঠ খণ্ড ২০০২ খ্রি. ।

৫. আলবানী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর বিন হায়্যান আল-আনসারী (মৃ. ১৪২০ হি.); *ইরওয়াউল গালীল;* বৈরূত: মাকতাবাতুল ইসলামি, অষ্টম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি. ।

৬. আলবানী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর বিন হায়্যান আল-আনসারী (মৃ. ১৪২০ হি.); *যিলালুল জান্নাহ্*, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ৩য় সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯৩ খ্রি. ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আল মানাভী, আব্দুর রউফ; *ফায়যুল কাদীর*, মিশর: আল মাকতাবাতুত্ তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হিজরী।

৮. আল-মুনযিরি, ইমামুল হাফেয আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাবী (৫৮১-৬৫৬ হি.); *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাহকীক: নাসীরুদ্দীন আলবানী অষ্টম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি. ।

৯. আল-আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার হাফেয (৭৭৩-৮৫২ হি.); *রওযাতুল মুহাদ্দিছীন*, শামেলা ভার্সন।

১০. আল-আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার হাফেয (১৩২-১৪৪৮ খ্রি.); *ফাতহুল বারী*, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৭৯ হিজরী।

১১. আল-আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার হাফেয (৭৭৩-৮৫২ হি.); *আল-ইসাবাহ*, বৈরূত: দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২ খ্রি. ।

১২. আল-আসবাহানী, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আবূ নু'আইম (৩৩৬-৪৩০ হি.); *আখলাকুন্নাবী*, বৈরূত: দারুল মুসলিম লিন্নাশর ওয়াত তাওযী', ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি. ।

১৩. আল-আসবাহানী, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আবূ নু'আইম (৩৩৬-৪৩০ হি.); *দালায়িলুন নাবুওয়াত*, বৈরূত: দারুন নাফাইস, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬ খ্রি. ।

১৪. আল-আসবাহানী, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আবূ নু'আইম (৩৩৬-৪৩০ হি.); *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, মিসর: দার সা'আদাহ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪/১৯৭৪ খ্রি. ।

১৫. আল-কাদিরী, আলাউদ্দীন আলী বিন হাসামুদ্দীন ইবনু কাযী খান আলবুরহান পুরী (মৃ. ৯৭৫ হি.); *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল*, বৈরুত, মুয়াস-সাসাতুর রিসালাহ, পঞ্চম সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১ খ্রি. ।

১৬. আহমাদ, আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল (মৃ. ২৪১ হি.); *মুসনাদ*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ; প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ খ্রি. ।

১৭. ইবনু আবি শাইবাহ্, আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (মৃ. ২৩৫ হি.), *মুসাননিফ*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদি লিন্নাশর ওয়াত তাওযী', ১৪০৯ হিজরী।

১৮. ইবনু খুযাইমাহ্, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ্ বিন মুগীরাহ্ (মৃ. ৩১১ হি.); *আস-সহীহ*, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ২০০৩ খ্রি. ।

১৯. ইবনু মাজাহ্, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল-কাযবীনী (মৃ. ২৮৩ হি.); *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুর রিসালাতুল 'আলামিয়্যাহ; তাহকীক: শু'আয়ীব আল-আরনাঊত ১ম সংস্করণ ২০০৯ খ্রি. ।

২০. ইবনু সা'দ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী (১৬৮-২৩০ হি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০ খ্রি. ।

২১. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মু'আয বিন মা'বাদ (মৃ. ৩৫৪ হি.); *আস-সহীহ*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৩ খ্রি. ।

২২. তাবারানী, সুলাইমান বিন আহমাদ বিন আয়্যুব বিন মাতির (মৃ. ৩৬০ হি.);

মু'জামুস সগীর, বৈরূত: আল মাকতাবাতুল ইসলামি, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি. ।

২৩. তাবারানী, সুলাইমান বিন আহমাদ বিন আয়্যুব বিন মাতির (মৃ. ৩৬০ হি.); *মু'জামুল আওসাত*, কায়রো, দারুল হারামাইন, ১ম সংস্করণ ১৯৯৫ খ্রি. ।

২৪. তাবারানী, সুলাইমান বিন আহমাদ বিন আয়্যুব বিন মাতির (মৃ. ৩৬০ হি.); *মু'জামুল কাবীর*, কায়রো, মাকতাবাহ ইবনু তাইয়্যিবাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৪ খ্রি. ।

২৫. তিরমিযী, মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ্ বিন মূসা বিন দাহহাক আবূ ঈসা (মৃ. ২৯ হি.); *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামি, তাহকীক: নাসীরুদ্দীন আলবানী, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি. ।

২৬. দারা কুতনী, আবুল হাসান আলী বিন 'উমার বিন আহমাদ বিন মাহদী (মৃ. ৩৮৫ হি.); *আস-সুনান*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ২০০৪ খ্রি. ।

২৭. দারিমী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান বিন ফাযল (মৃ. ২৫৫ হি.); *আস-সুনান*, রিয়াদ, দারুল মুগনী লিন্নাশর ওয়াত-তাওযী', ১ম সংস্করণ ২০০০ খ্রি. ।

২৮. নাজদী, আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী (১১৬৫-১২৪২ হি.); *মুখতাসার সীরাতুর রাসূল*, রিয়াদ: মাকতাবা দারুস সালাম, ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৪ খ্রি. ।

২৯. নাববী, আবূ যাকারিয়া মুহাম্মাদ (৬৩১-৬৭৬ হি.); *রিয়াদুস সালিহীন*, বৈরূত: দারু ইবনু কাছীর, ১ম সংস্করণ ২০০৭ খ্রি. মোতাবেক ১৪২৮ হিজরী; তাহকীক: মাহির ইয়াসীন আল-ফাহল।

৩০. নাসাঈ, আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব (মৃ. ৩০৩ হি.); *আস-সুনানুস সুগরা*, বৈরূত: মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬ খ্রি. ।

৩১. নাসাঈ, আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব (মৃ. ৩০৩ হি.); *আস-সুনানুল কুবরা*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ২০০১ খ্রি. ।

৩২ বদরুদ্দীন আইনী, *আল্লামা উমদাতুল-ক্বারী*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), ।

৩৩. বাইহাকী, আহমাদ বিন হুসাঈন বিন আলী বিন মূসা (মৃ. ৪৫৮ হি.); *আস-সুনান আস-সুগরা*, কারাসি: জামি'আতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৯ খ্রি. ।

৩৪. বাইহাকী, আহমাদ বিন হুসাঈন বিন আলী বিন মূসা (মৃ. ৪৫৮ হি.); *আস-সুনান আল-কুবরা*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩ খ্রি. ।

৩৫. বাইহাকী, আহমাদ বিন হুসাঈন বিন আলী বিন মূসা (মৃ. ৪৫৮ হি.); শু'*আবুল ঈমান*, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদি লিন্নাশর ওয়াত তাওযী', ১ম সংস্করণ ২০০৩ খ্রি. ।

৩৬. বাইহাকী, আহমাদ বিন হুসাঈন বিন আলী বিন মূসা (মৃ. ৪৫৮ হি.); *দালায়িলুন্নাবুওয়াত*, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১৯৮৮

খ্রি.

৩৭. বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (মৃ. ২৫৬ হি.); *আস-সহীহ*, বৈরূত: দারু ইবনু কাছীর, ২০০২ খ্রি. ।

৩৮. বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (মৃ. ২৫৬ হি.); *আদাবুল মুফরাদ*, বৈরূত: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৮৯ খ্রি. , তাহকীক: নাসীরুদ্দীন আলবানী।

৩৯. বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (মৃ. ২৫৬ হি.); *আত-তারীখুল কাবীর*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রশীদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ খ্রি. ।

৪০. মালিক, মালিক বিন আনাস আল-আসবাহী (মৃ. ১৭৯ হি.); *আল-মুওয়াত্তা*, বৈরূত: দারু ইহইয়াউল উলূম আল-আরাবিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৪ খ্রি. ।

৪১. মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল-কুশাইরী আন নিসাপুরী (মৃ. ২৬১ হি.); *আস-সহীহ*, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি. ।

৪২. সুয়ূতী, আব্দুর রহমান আবূ বাকর জালালুদ্দীন (মৃ. ৯১১ হি.); *সহীহুল জামি'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহ*, বৈরুত, মাকতুবাতুল ইসলামি, তৃতীয় প্রকাশ ১৪০৮/১৯৮৮ খ্রি. , তাহকীক: নাসীরুদ্দীন আলবানী।

৪৩. হাকিম, আবূ আব্দুল্লাহ্ আল-হাকিম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ (মৃ. ৪০৫ হি.); *মুসতাদরাক*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৯৯০ খ্রি. ।

৪৪. হাইছামী, আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী ইবনু আবূ বাক্র (মৃ. ৮০৭ হি.); *মাজমাউয যাওয়াইদ*, কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪ খ্রি. ।

৪৫. হাইছামী, আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী ইবনু আবূ বাক্র (মৃ. ৮০৭ হি.); *কাশফুল আসতার আয-যাওয়ায়িদুল বাযযার*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৭৯ খ্রি. ।

ইসলামি গ্রন্থসমূহ

১. অনুপমা আফরোজ, *ইসলাম ও সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০): প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, পি.এইচ.ডি থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত)।

২. আত-তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আবূ জা'ফর আল-ফারিসী (২২৪-৩১০ হি.); *তারীখুত তাবারী*, বৈরূত: দারুত তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৭/১৯৬৭ খ্রি. ।

৩. আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*; ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ খ্রি. ।

৪. আবদুল খালেক, *নারী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইফাবা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ খ্রি. ।

৫. আব্দুল হালিম আবু সুক্কা, *রাসূল (স.)-এর যুগে নারী স্বাধীনতা*, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি. ।

৬. আব্দুস সামাদ রাহমানী, নারী মুক্তি কোন পথে, অনুবাদ: মুফতী মুঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ২০০০ খ্রি. ।

৭. আল-জাওযিইয়াহ, মুহাম্মাদ বিন আবূ বাক্‌র শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম দামেশকী (৬৯১-৭৫১ হি.), *যাদুল মাআদ*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খ্রি. ।

৮. ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার আদ-দামেশকী (৭০১-৭৭৪ হি); *আল-ফুছূল ফী সীরাতির রাসূল*, শারজাহ: দারুল ফাত্‌হ ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খ্রি. ।

৯. ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার আদ-দামেশকী (৭০১-৭৭৪ হি); *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরূত: দারু ইহ্‌ইয়াউত তুরাছ আল'আরাবী, ১৯৮৮ খ্রি. ।

১০. ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার আদ-দামেশকী (৭০১-৭৭৪ হি); *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি. ।

১১. ইবনু হিশাম, আব্‌দুল মালিক বিন হিশাম বিন আয়্যুব আল-হুমাইরী (মৃ. ২১৩ হি.); *আস-সীরাতুন নাববিইয়াহ*, তানতা (মিশর): দারুস সাহাবাহ, ১৯৯৫ খ্রি. , তাহকীক: মুসতফা সাকা ও অন্যান্য বিশারদগণ।

১২. ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, প্রকাশক: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, নিয়াজ মন্‌জিল জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ খ্রি. ।

১৪. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, লন্ডন: খাদিজা আখতার রেজায়ী আল-কুরআন একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি. ।

১৫. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ খ্রি. ।

১৬. ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, অনুবাদ: আখতার উল আলম, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি. ।

১৭. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রকাশকাল: ২০০২ খ্রি. ।

১৮. তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবি*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি. ।

১৯. ফেরদৌস আরা খানম, *ইসলামে নারীর মর্যাদা*, বাংলাদেশে তার অবস্থান (১৮০০-১৯৯০), পি এইচ ডি থিসিস: অক্টোবর-২০০৩ খ্রি. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত)।

২০. বি. আয়েশা লেমু ও ফাতিমা হিরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী*, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক থট, ঢাকা, ২০০২ খ্রি. ।

২১. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *আহকামুন নিসা*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রথম প্রকাশ ২০১৭ খ্রি. ।

২২. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স ১৯৯৫ খ্রি. ।

২৩. মাওলানা হিফযুর রহমান, *কাসাসুল কুরআন, হযরত ঈসা (আ.)*, মিনা বুক হাউজ, ঢাকা, পৃ.-৫২৭,
২৪. মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩ খ্রি. ।
২৫. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ - ২০০০ খ্রি. ।
২৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *নারী*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ খ্রি. ।
২৭. মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী, *নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০১ খ্রি. ।
২৮. মোঃ ইউসুফ, *বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ইসলামি শরিআতের দৃষ্টিভঙ্গি-একটি পর্যালোচনা*, পি. এইচ. ডি. থিসিস, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত)।
২৯. শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী*, আযমগড়: মাতবা মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯ হিজরী।
৩০. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম; ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ ২০০৬ খ্রি. ।
৩১. সম্পদনা, *জান্নাতী পঁচিশ রমণী তাঁদের আদর্শ নারী জীবন*, ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ ২০১৬ খ্রি. ।
৩২. সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তফা, ইসলামে নারীর অধিকার, বাণী প্রকাশনী, কলকাতা: প্রথম প্রকাশ ২০০২ খ্রি. ।
৩৩. সৈয়দ আমির আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদ: অধ্যাপক দরবেশ আলী খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ খ্রি. ।

অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

১. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২ খ্রি. ।
২. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন-১৯৯৪ খ্রি. , জিলহজ্জ-১৪১৪
৩. আসলাম সানী, নন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা গর্বিত বাংলাদেশ (সম্পাদনা), ঢাকা: মিজান পাবলিকেন্স, প্রথম প্রকাশ ২০১১ খ্রি. ।
৪. উর্মি রহমান, পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি. ।
৫. ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা ও প্রাপ্তি, ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, প্রথম প্রকাশ ২০০২ খ্রি. ।
৬. ডুব্লু গালিচার, উইমেন আন্ডার পলিগেমি, উদ্ধৃতি; ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭ খ্রি. ।
৭. নাসরিন সুলতানা, উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, এম ফিল থিসিস ২০০১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত)।
৮. প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, কলকাতা: বুক ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬ খ্রি. ।
৯. বেবী মওদূদ, বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি. ।

১০. মমতাজ সুলতানা, ধর্ম ও নারীর অধিকার, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০২ খ্রি. ।

১১. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি. ।

১২. মালেকা বেগম,সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী তিনশ বছরের (১৮-২০ শতক) বাঙ্গালী নারীর ইতিহাস, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১ খ্রি. ।

১৩. মালেকা বেগম, নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক, ঢাকা: অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২০০২ খ্রি. ।

১৪. মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী, ঢাকা: সূচিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-২০০৩ খ্রি. ।

১৫. রওশন আরা বেগম, নবাব ফয়জুননেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ খ্রি. ।

১৬. রুহল আমিন, বেগম খালেদা জিয়া বি এন পি ও বাংলাদেশ, ঢাকা: হীরা বুক মার্ট, প্রথম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি. ।

১৭. সরকার সাহাবুদ্দিন আহমেদ, নারী নির্যাতনের রকমফের, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ ২০০১ খ্রি. ।

১৮. সোনিয়া নিশাত আমীন, বাঙ্গালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০২ খ্রি. ।

পত্র-পত্রিকা, স্মারক, সাময়িকী ও প্রতিবেদন

১. অপরাজিতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার সহায়িকা, প্রকাশক: সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৩ খ্রি. ।

২. আনিসুজ্জামান, মহিলা পরিষদ জার্নাল, বিষয়: উচচ শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন, প্রকাশকাল: দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১২ খ্রি. ।

৩. ইউ.এ.বি রাজিয়া আক্তার বানু, সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশের মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৪ খ্রি. ।

৪. উইমেন ফর উইমেন: গবেষণা ও পাঠচক্র, লেখক: সাইদুর রহমান, সাদিয়া নাসরীন যুথি, সংখ্যা-১৫, প্রকাশকাল: ২০১৫ খ্রি. ।

৫. 'উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' কতিপয় এনজিও নারী সংগঠনের প্রতিনিধি কর্তৃক গঠিত।

৬. খলিল মজিদ, প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সম্পাদক, আয়েশা খানম, মহিলা সমাচার, বেইজিং ২০ বিশেষ সংখ্যা-২০১৫ খ্রি. ।

৭. ছাইদুল হক মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ইসলামে নারী ও পুরুষের সম অধিকার, একটি সমীক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫ খ্রি. ।

৮. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, উদ্ধৃতি: এশিয়াটিক জার্নাল, ১৮২৭ খ্রি. ভলিয়্যুম ২৩

৯.	ড. নাজমা চৌধুরী,	"রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশিদারীত্ব: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা-১৯৯৪ খ্রি. ।
১০.	ড. ফওজিয়া মোসলেম,	মহিলা সমাচার, বিষয়: নারীর ক্ষমতায়ন চাই, সমতাপূর্ণ বিশ্ব চাই, প্রকাশকাল: বৈশাখ-শ্রাবণ: ১৪২৩, এপ্রিল-জুন: ২০১৬ খ্রি. ।
১১.	ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া,	আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বাংলাদেশের নারীর অবস্থান, পত্রিকা: মহিলা সমাচার, প্রকাশকাল: পৌষ-চৈত্র ১৪২০, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪ খ্রি. ।
১২.	তাহসিনা আখতার,	"মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৫ খ্রি. ।
১৩.	তাহমিনা কবির	"আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পূর্ব প্রেক্ষাপট: কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য" চিন্তা, ঢাকা, ৩০ মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি. ।
১৪.	নারীর প্রকৃত মর্যাদা,	একটি প্রামাণ্য আলোচনা, হাফেজ মাসউদ আহমাদ (মাসুম), মাসিক মদীনা, জুন-২০০২ খ্রি. , সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা।
১৫.	নারী বার্তা,	প্রকাশনী: *উইমেন ফর উইমেন এর নিজউলেটার*, প্রকাশ কাল: ২০১১-২০১৬ খ্রি. এর বিভিন্ন সংখ্যা।
১৬.	নারী ও শিক্ষা,	উইমেন ফর উইমেন রিসার্চ এন্ড স্টাডি গ্রুপ, ৮/৫, লালমাটিয়া, ঢাকা।
১৭.	নারীর আইনি অধিকার,	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন-২০০০ খ্রি. ।
১৮.	নির্মল সেনগুপ্ত,	রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭২ খ্রি. ।
১৯.	পল্লী সমাজ ক্ষমতায়ন সহায়িকা,	প্রকাশক: ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কমৃসূচি, ব্র্যাক প্রিন্টার্স, ৪১ টংগী শিল্প এলাকা, ব্লক-সি টংগী গাজীপুর-১৭১০, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১২ খ্রি. ।
২০.	ফরিদা আখতার,	"ইতিহাস যেন ভুলে না যাই", চিন্তা, ঢাকা, ৩০ মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি. ।
২১.	বাংলাদেশের আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ,	প্রকাশক: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), প্রকাশকাল;অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. ।
২২.	ব্যতিক্রমধর্মী মাসিক পত্রিকা,	সংস্কার, সংখ্যা ১৮১, এপ্রিল ২০১৩ খ্রি. , পৃ. ১০, মুদ্রণ বাকো অফসেট প্রেস, ১৮ ঋষিকেশ দাস রোড, একরামপুর, সুত্রাপুর, ঢাকা-১০০০
২৩.	মালেকা বেগম	"নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ" সমাজ নিরীক্ষণ/২২। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪.	মালেকা বেগম	চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা (অনুদিত)। রাজকীয় জেনমার্ক দূতাবাস ১৯৯৭ খ্রি. ।
২৫.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মোঃ তৌহিদুল হক,	পত্রিকা: উইমেন ফর উইমেন, গবেষণা ও পাঠক্রম, সংখ্যা: ১৫, প্রকাশকাল-২০১৫ খ্রি. ।

২৬. লুনা নূর, সদস্য, আন্তর্জাতিক উপ-পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া, Women in Politics 2012 (IPU), মহিলা সমাচার, প্রকাশকাল: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ খ্রি. ।

২৭. শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, সাক্ষরতা বুলেটিন, সংখ্যা ২১৫, প্রকাশকাল: মাঘ ১৪১৮, জানুয়ারি ২০১২ খ্রি. ।

২৮. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রি. ।

আরবী বাংলা অভিধানসমূহ

১. আল সুকরী, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-মিসবাহুল মুনীর, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, খ. ১, ১৯৯০ খ্রি. ।

২. ইব্ন মনযুর, লিসানুল আরব, কুম: নাশরুল আদাবিল হাওয়াহ, ১৪০৫ হি.।

৩. ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ.২

৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রধান সম্পাদক, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২ খ্রি. ।

৫. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধান, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ৮ম মুদ্রণ ১৯৯৫ খ্রি. ।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

1. Abdel Rahim Umrance: Family planning in the legacy of Islam, New yourk and London-1992.

2. Anis Ahmed, Muslim women and Higher Education, Institute of policy studies, Islamabad, Pakistan-1984.

3. Hasan S. karimi, Al-Mughni, Active study dictionary of English, Bairut, Librarie Duliban, 1st Edition, 1994.

4. Morison Doctor, The Religious History of Man, Tracing Religion and superstition.Brook Field: Te Mill Book Press, 2000.

5. Stuart A. Vyse, The Psychology of Superstition, New York: Oxford University Press.1997.

6. Oxford Reference Dictionary, Edited by Catherine Soanes, New York: Oxford University Press.

7. Oxford English Dctionary, 2nd Edition, Oxford: Oxford University, Press –1989.

8. Welliam Manning, The Wrongs of Man, London: Princeton University Press, 1838.